ওঁ তৎসৎ।

আলাপ।



কলিকাতা,

৬।১ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৭ সাল।

 [মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

৺দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, রাজা হরিশ্চন্দ্র, অভিব্যক্তিবাদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা,

কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী

শাণ্ডিল্যগোত্র,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ তত্ত্বনিধি

কর্ত্তৃক বিরচিত 'আলাপ' গ্রন্থ ১৮৩২ শক ৫০১১ কলিগতাব্দে ৮১ ব্রাহ্ম সম্বতে আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিস্থ ভাস্করে শুভ বিজয়া দশমী দিবসে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা, ২১০।৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত
যন্ত্রালয়ে, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত। ১৩১৭।

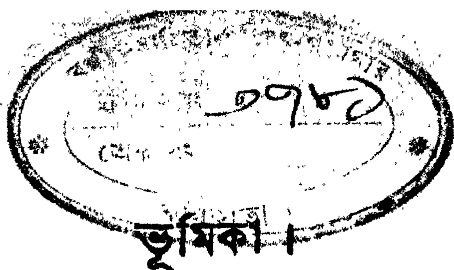
উৎসর্গ পত্র।



যে প্রাণের প্রাণ অনন্ত কালের জন্য আমার সঙ্গী,
তাঁহারই সমীপে আমার এই হৃদয়নিঃসৃত
আলাপগুলি সাদরে উপনীত করিলাম—
তিনি এইগুলি সাদরে শ্রবণ করিয়া
আমাকে ধন্য করুন।

বিজয়া দশমী, ১৩১৭ সাল।

কৃপাভিক্ষু
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।



ভূমিকা।

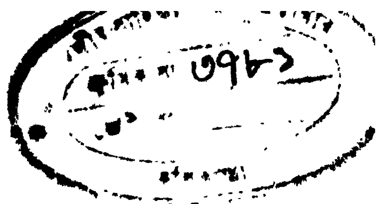
গ্রন্থের নাম আলাপ। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি সময় বিশেষে, অবস্থা বিশেষে মনের নব নব ভাবের উদয়ের সঙ্গে নূতন রাগিণী আলাপ করেন, তাহা সকলেই জানেন। আমিও বিভিন্ন সময়ে মনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিয়াছিলাম। সেই সকল প্রবন্ধাদির কতকগুলি মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কতকগুলি বা প্রকাশিত হয় নাই। আমি সেই সকল প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া "আলাপ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। স্বলিখিত প্রবন্ধাদিকে এরূপ স্থায়িত্ব দিবার আকাঙ্ক্ষার কারণ কেবল গ্রন্থকারের নিজের লেখার প্রতি আন্তরিক মায়া—ইহা প্রত্যেক গ্রন্থকারই বুঝিতে পারিবেন। এখন এই আলাপগুলির কোনটি কোন সময়ে যদি সংসারের তাপক্লিষ্ট কোন মানবের হৃদয়ে একটিবারও শান্তির মলয় বায়ু প্রবাহিত করিয়া শীতল করিতে পারে, তবেই গ্রন্থকার পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। অধিক বলা বাহুল্য। ইতি—

২৩ আশ্বিন, ১৩১৭ সাল।
১৩ অক্টোবর, ১৯১০ খৃঃ অঃ।
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অনুক্রমণিকা।

—: ওঁ :—



ॐ

আলাপ।

প্রথম আলাপ—অধীত-অধ্যয়ন।

বাল্যকালে শিক্ষকদিগের উপদেশে চরিত্রগঠন ও অধ্যয়নের প্রণালী সম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ সেই টড্ সাহেবের রচিত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকখানি * পড়িয়া বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহাতে ছাত্রদিগের প্রতি অধীত প্রত্যেক পুস্তকের একটী করিয়া বিষয়-নির্ঘণ্ট করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর আমিও কয়েক বৎসর প্রত্যেক অধীত বিষয়ের একটী করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। তাহার নাম দিয়াছিলাম "অধীত-অধ্যয়ন" অর্থাৎ যাহা একবার অধীত হইয়াছে তাহাই প্রয়োজন হইলে এই নির্ঘণ্ট গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরায় অধ্যয়ন করিতে পারা যাইবে।

সেই "অধীত-অধ্যয়ন" গ্রন্থের প্রারম্ভে আমার নিজেকে পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম লিখিয়াছিলাম। এক সময়ে সেই নিয়মানুসারে দৃঢ় ভাবে কার্য্য করিতাম এবং বলা বাহুল্য যে তাহাতে আমার উপকারই হইয়াছিল। সেই নিয়ম গুলি অপর কোন উদ্যমী বালকের হাতে পড়িলে

---

* Students' Manual by Rev. John Todd.

তাহার উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় সেই নিয়ম গুলির সহিত "অধীত-অধ্যয়ন" গ্রন্থের একটু নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ইহার আখ্যাপত্র অর্থাৎ title page (টাইটেল পেজ) সংক্ষিপ্ত অথচ অবিকৃত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁ

নমো ব্রহ্মণে

"অধীত-অধ্যয়ন"

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

কলিকাতা।

১৭ই আশ্বিন ১৮১২ শক

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

নিয়মাবলী প্রভৃতি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, সেই ভাবেই নিম্নে অবিকল প্রকাশিত হইল :—

ওঁ

নমো ব্রহ্মণে।

নিয়মাবলী।

১। প্রভাতে যত প্রত্যূষে পারিবে উঠিবে। উঠিয়াই সুন্দররূপে মুখধৌতি করিবেক ও অর্দ্ধ ঘণ্টার ন্যূন কোন দিন উপাসনার আসন পরিত্যাগ করিবে না।

২। উপাসনা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবেক।

৩। উপাসনার পর সম্পূর্ণরূপে পিত্তনিবারণ করিবেক।

৪। প্রত্যুষে গান ও পরিশ্রম রীতিমত করিবেক।

৫। প্রভাতে নিয়মিত স্নান অভ্যাস রাখিবে।

৬। প্রত্যুষে লেখার জন্য সম্পূর্ণ সময় দিবেক।

৭। যে বিষয় লিখিবে, সেই বিষয় পুস্তক না দেখিয়া লিখিবেক। অবশ্য উক্ত বিষয়ের পুস্তক অন্য সময়ে পড়িয়া রাখিবে।

৮। মধ্যাহ্ন-ভোজন এক প্রহরের মধ্যে সম্পন্ন করিবে।

৯। অতিরিক্ত ভোজন কদাপি করিবেক না।

১০। মধ্যাহ্নকাল বিদ্যালয়ের কার্য্যে সমর্পণ করিবেক।

১১। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা পরে (পূর্ব্বে হইলেই ভাল) বৈকাল বেলার ভোজন সম্পন্ন করিবেক। আহারের পূর্ব্বে পরিশ্রম করিবেক।

১২। সন্ধ্যার আরম্ভ হইতে অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা নিয়মিত নির্ব্বাহ করিবেক।

১৩। তদনন্তর অন্তরাত্মার উন্নতি-জনক পুস্তকাদি পড়িবে।

১৪। দ্বিতীয় প্রহরের আরম্ভে ঈশ্বরে আত্মা সমর্পণ করিয়া শয়ন করিবে।

কিরূপে পড়িতে হইবে :—

১। জানিবার উপযুক্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে জান; আপনার বুদ্ধিমত্তার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিও না।

২। শুধু পড়িলেই জ্ঞানী হয় না; তাহার উপর আপনার চিন্তা চাই।

৩। সহজে বিদ্যালাভের আশা বৃথা।

৪। শুধু উপরি উপরি পড়া নয়, একটা বিষয়ে ডোবা চাই।

৫। ধর্ম্ম বিষয়ে আমোদ এনে ফেলিও না ও তামাসা করিও না।

৬। Do not be dogmatical.

৭। অনেক বিষয় পড়িতে হয়।

৮। পড়ার বিষয় গুলি যাহাতে সঞ্চিত থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ন আবশ্যক।

৯। চিন্তাতে বেশী সময় দিও।

১০। নিজের কুসংস্কার দূর করিয়া পরে অন্যের কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিও।

১১। সমস্ত বিদ্যা (অবশ্য যত পারিবে) উপরি উপরি জানিয়া রাখিবে এবং বিশেষ বিদ্যা তন্ন করিয়া জানিবে।

১২। দুইটা ভাষা যথেষ্ট।

১৩। সপ্তাহে একদিন (যদি ইচ্ছা কর) লোকের সহিত মিশিলে ভালই হয়।

১৪। অতিরিক্ত কথা কদাপি কহিও না।

১৫। কোনও উপকার জগতে না করিয়া বিবাহ করা অন্যায়।

১৬। স্মরণীয় বিষয় প্রতিদিন আপনার ভাষায় লিখিয়া রাখিবে।

১৭। লিখিবার সময় পুস্তক দেখিও না।

১৮। একাগ্রতা অভ্যাস করিও।

১৯। এক বিষয় করিয়া গ্রহণ করিও; do one thing at a time.

২০। রাত্রিতে অধিক জাগরণ করিবে না।

২১। The best preventive, often the only cure, of nervous diseases is plenty of moderate exercises.

২২। যেগুলি আমোদের বই (অর্থাৎ যা' মনে রাখিবার বিশেষ আবশ্যক নাই) সেই গুলি দাঁড়িয়ে পড়িলেই ভাল।

২৩। Melancholy হয়ে থেকো না।

২৪। চৌকিতে ঝুঁকে বসে পড়া শারীরিক অনিষ্টকর।

২৫। যে বিষয়ে হউক Men of Genius পড়িবার চেষ্টা করিবে।

২৬। খবরের কাগজে কি বাজে গল্পে সময় প্রদান করিও না।

বিশেষ নিয়ম।

(এই বিশেষ নিয়মগুলি আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।
শ্রীকিঙ্কনা দেবশর্ম্মা)

৪-৪½	৪½-৫	৫-৫½	৫½-৭	৭-৭½	৭½-৯½	৯½-১০	১০-১০½
ধৌতি	উপাসনা ও গান	পরিশ্রম	লেখা	স্নান	পড়া	copy	আহার

১০½-১১	১১-৪	৪-৫	৫-৫½	৫½-৬	৬-৬½	৬½-৯½	৯½-১০
copy	M. A ছুটীর দিন B. L.	পড়া	পরিশ্রম	আহার	উপাসনা	লেখা	diary

১০-৪
ঘুম।

১। এখন রামমোহন রায়ের সম্বন্ধেই পড়িব।

২। অধীত-অধ্যয়নে স্মরণীয় বিষয় লিখিতে হইবে।

৩। Biography কিম্বা একবিষয় পড়ে tedious বোধ হলে অন্য বিষয় ধরিবে। *e. g.* রামমোহন রায়ের life যদি একটু tedious বোধ হয় তবে সেটা অবশ্য শেষ করে কোন travelএর বই ধরিবে।

৪। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিবে—ভাবিবে কি পাইলাম ও কি ছাড়িলাম।

প্রধান নিয়ম।

যাহা যাহা সাধুকর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, তাহা কদাপি আপনার বলে হইয়াছে ভাবিয়া গর্বিত হইও না, কিন্তু সমস্তই তাঁহাতেই সমর্পিত রাখিবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধ হইলেই আপনাকে ধন্য মনে করিবে। তিনি স্বয়ং আশীর্ব্বাদ করিলেই যথেষ্ট মনে করিবে।

এই বারে নমুনা স্বরূপে "অধীত-অধ্যয়নের" দু এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত"। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, সন ১২৯৮, ২য় সংস্করণ।

উপক্রমণিকা—ইহাতে নগেন্দ্র বাবু দুইটী প্রধান বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন-(১) রাঢ় দেশের গৌরব-যত কবি, দার্শনিক সকলেরই জন্ম এই রাঢ় দেশে। বারেন্দ্র ভূমিতে জন্ম,—তিন জনের মাত্র, তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেন একজন*।

(২) রামমোহন রায়ের স্বহস্ত-লিখিত জীবনী (ইংরাজী হইতে অনুবাদ)

জন্ম—১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে; ১৬৯৫ শকের শেষ ভাগে।

প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যো—প্রথম "রায় রায়"

রামমোহন রায়ের বাপ বৈষ্ণব, মাতামহকুল শাক্ত, পিতামহ ব্রজবিনোদ ভারী ভাল লোক ছিলেন; তাঁহার মরিবার কালে চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা লইবার ছলে আসিয়া ভিক্ষা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া স্বীয় কন্যার জন্য এক পুত্র প্রার্থনা করিলেন। পঞ্চম পুত্র রাধাকান্ত তারিণী দেবীকে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদেরই পুত্র রামমোহন রায়।

স্মৃতিশক্তি—রামমোহন রায়ের অদ্বিতীয়রূপ ছিল।

অধ্যবসায়—একদিন তিনি বাল্মীকি রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন; আহার-বেলা অতিক্রান্ত হইলেও কেহই ডাকিতে সাহস না করাতে তারিণী দেবীর অনাহার দেখিয়া একজন আত্মীয় ডাকিতে যাইলেন; রামমোহন তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া সপ্তকাণ্ড শেষ করিয়া আসিলেন।

নবম বৎসর— এই সময়ে আরবী ও পারসী শেখেন এবং আরবীতে Euclidএর ও Aristotleএর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তর্কশক্তি প্রখর হইল; এবং কোরাণ প্রভৃতি পড়াতে একেশ্বরবাদ বুঝিলেন। মাতামহের পরামর্শে কাশীতে গিয়া বেদ প্রভৃতি পড়িয়া আসিলেন, সোনায় সোহাগা পড়িল। একেশ্বরবাদ হৃদয়ে ছাপাইয়া উঠিল।

BIBLE—OLD & NEW.

GENESIS.

Ch I Of all the works of God but man.

Ch. II Sabbath; Garden of Eden; Man.

Ch. III Eating the forbidden fruit and its consequences.

Ch. IV Adam's generation; Cain slew Abel.

Ch. V Book of generations of Adam.

Ch. VI Noah and his generations.

Ch. VII The Flood.

Ch. VIII The Flood subsided.

Ch. IX Birth of Canaan and he is cursed by Noah for his father seeing his nakedness in drunkenness.

Ch. X Descendants of Noah.

Ch XI Abrahamএর পূর্ব্ব পুরুষ ও Babel tower.

Ch. XII Plague in Jerusalem and Abraham went to Egypt.

Ch. XIII Division of land between Abraham and Lot.

Ch. XIV Battle between Abraham and other kings

Ch. XV Jewsদের বিষয়।

Ch. XVI Abraham's son by Hagar, Sara's maid servant.

* * * * * * * *

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
"অধীত অধ্যয়ন" বিষয়ক প্রথম
আলাপ সমাপ্ত।



দ্বিতীয় আলাপ—অধ্যক্ষ-সভায় প্রবেশকালীন মনের ভাব।*

আজ যৌবনের প্রারম্ভে আমরা ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভায় প্রবেশ লাভ করিলাম; আমরা আমাদের নূতন উৎসাহের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করিলাম। অরণ্যের বিপদ-

---

* আমার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহ দেখিয়া পিতামহদেব ভ্রাতাগণের সহিত আমাকে ১৮১৩ শকে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। সেই নিয়োগের পর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনে (১৮১৩ শক, ১লা বৈশাখে) বিবৃত। ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা।

সঙ্কুল পথ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া আজ সহসা এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, যে স্থান হইতে আমাদের লক্ষ্যভূমিকে নয়নের সম্মুখে অবস্থিত দেখিতে পাই; এমন এক অটল পর্ব্বতের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি যে, সংসারের ঘোর ঝঞ্ঝা-ঝটিকার মধ্যেও শান্তির সুনিশ্চল আশা পোষণ করিতে পারি।

আমাদের লক্ষ্যভূমি কে? সেই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ পরমেশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি লক্ষ্যভূমি, কোটী কোটী সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের যিনি লক্ষ্যভূমি, সেই পরম করুণাময় পরমেশ্বর—ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য মানব যে আমরা, আমাদেরও লক্ষ্যভূমি তিনিই। সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার নাম সকলের হৃদয়ে যথাসাধ্য প্রবেশ করাইবার নিমিত্তই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। আমরাও এই কর্ম্মের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে দীক্ষিত হইলাম। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে এই শুভকার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। এস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত কার্য্যে ব্রতী হই; তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার এমন শুভ অবসর কখনো অবহেলা যেন না করি।

আমরা অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ করিলাম কেন? অধ্যক্ষসভার পূর্ব্বতন সভাগণ কি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন? না, সেরূপ কিছুই হয় নাই। আমাদের উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় যে কোন কর্ম্ম করা। পূর্ব্বতন সভ্যগণ এই কর্ম্মের নিতান্তই উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা আপনাদের উপযুক্ত কোন গুরুতর কর্ম্মের অবসর না পাওয়াতে সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে কতকটা হতাশ্বাস হইয়াছেন। আমাদের এমন কি ক্ষমতা যে সেই গুরুতর কর্ম্ম সকলের ভার স্বীয় স্কন্ধে ন্যস্ত করিব? পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লইতেছি যে আমাদের সেরূপ ক্ষমতা নাই। এখন প্রশ্ন

হইতে পারে যে তবে আমরা অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ করিলাম কেন? এই সম্বন্ধে আমাদের দুই চারিটী কথা আছে; তাহা এই:—

(১) আমাদের ক্ষমতাও যেমন অল্প, আমাদের আশাও তেমনি ক্ষুদ্র। আমরা এরূপ আশা করিয়া আসি নাই যে একটা বিপ্লব ঘটাইব অথবা কোন হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত করাইব। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আমাদের ক্ষমতাও অল্প, আর আমাদের আশাও অল্প। আমরা এই আশা করিয়া আসিয়াছি যে সমাজের যে কোন বিষয়ে, সামান্য হউক না কেন, আমরা সাধ্যমত পরিশ্রম করিব। আমাদের ফলেতে অধিকার নাই, কর্ম্মেতেই অধিকার "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ফল ফলদাতার হস্তে; তিনি যাহা মঙ্গল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। আমরা কেবল পরিশ্রম করিয়া যাইতে পারি, পরমেশ্বর এরূপ বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করুন।

(২) দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের তিনটী প্রধান বৃত্তি আছে—(১) জ্ঞান (২) ভাব এবং (৩) ইচ্ছা ও কার্য্য। এই তিনটী, ব্রাহ্মসমাজেরও তিন প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের জ্ঞানভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ও সমুদয় জীবন প্রদান করিয়াছিলেন; এই একটীমাত্র জীবন উৎসর্গের ফলে ব্রাহ্মসমাজ ছয় বৎসর মাত্র চলিয়াছিল (ইহার মধ্যেও আর একটি জীবন উৎসর্গ আবশ্যক হইয়াছিল—তাহা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের)। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে, কেবল জ্ঞানকেই একমাত্র ভিত্তি করিলে রামমোহন রায়ের মত লোক তিন বৎসর অন্তর আবশ্যক হইত; কিন্তু তাহা অসম্ভব। এই জন্য দ্বিতীয়

ভিত্তি স্থাপিত করিতে পূজ্যপাদ পিতামহদেব আপনার ধনপ্রাণ অর্পণ করিলেন। যদিও জ্ঞানভিত্তি প্রথম আবশ্যক, কিন্তু এই ভাবভিত্তি অধিকতর নির্ভর-শক্তি প্রদান করে। এই এক ভাব-ভিত্তির বলে ব্রাহ্মসমাজ আজ ৬১ বৎসর চলিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে।

এখন তৃতীয় ও শেষ ভিত্তি আবশ্যক। তাহা কার্য্যভিত্তি। এই কার্য্যের সীমা নাই; যতই কার্য্য করা যায়, ততই কার্য্য স্বয়ং আসিয়া ধরা দেয়। এই কার্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ। প্রথম আমাদের নিজের জীবনকে ধর্ম্ম-জীবনের পথে অগ্রসর করিতে হইবে, পশ্চাৎ অপরের জীবনেও ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতে হইবে। প্রথম স্বজাতি ও স্বদেশে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে যথাসাধ্য ব্রহ্মনাম ঘোষণা করা—কেবল নাম ঘোষণা করাই নহে, নাম ঘোষণা করিয়া অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান প্রচার করা আমাদের অধ্যক্ষসভায় প্রবেশের উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষসভার বাহিরে থাকিলে কি হইত না? জানি না হইত, কি না হইত; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যখন আমরা অধ্যক্ষ হইয়াছি, তখন পৌত্তলিকতা হইতে প্রাণপণে দূরে থাকিব এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এই ধর্ম্মজীবন গঠন করিবার কার্য্যের কি শেষ আছে—ইহজীবনে কি অনন্ত জীবনেও তাহা শেষ হয় না।

(৩) তৃতীয় কথা এই যে কে জানিত যে প্রধানাচার্য্য মহাশয় রামমোহন রায়ের পর নূতন এক ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন? কে জানিত যে ব্রাহ্মসমাজের ভাবভিত্তি আবশ্যক। কে বুঝিতে পারিয়াছিল সে রামমোহন রায়ের স্থাপিত ভিত্তি জ্ঞান, ভাব ও

কার্য্যের সমবায়ে স্থাপিত হয় নাই? কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু কার্য্যের গতিকে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই জন্য আশা করা যায় যে করুণাময়ের প্রসাদে আমরাও কার্য্যগতিকে শেষ ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিব। এই আশা কিছু অধিক উচ্চ আশা নহে; ইহা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

এতক্ষণ বলিয়া আসিলাম, আমাদের অধ্যক্ষসভায় প্রবেশের উদ্দেশ্য কি? এইবার আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম করিবার বিঘ্ন সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রথম বিঘ্ন এই (আমি ইহা কোন গুরুজনের নিকট শুনিয়াছি) আমাদের কার্য্য করিবার তেমন স্বাধীনতা নাই। ইহা আমার মতে তত অপকারী নহে। স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে গিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল মন্ত্রের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা আংশিক পরাধীন ভাবে আদি সমাজের মূল মন্ত্রের অনুযায়ী কর্ম্ম করা সহস্র গুণে ভাল। গুরুজনের বাক্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ অন্যায়, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মত ব্যক্ত করিলাম; বলিবার আরও একটি কারণ এই যে উক্ত গুরুজনই ইচ্ছা করেন যে, যাহাতে ভারতের এত বড় গৌরবের স্থল—একেশ্বরের নামে সমাজ স্থাপন ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান—এখানে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহারই উপযুক্ত উপায় বিধান করি।

দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, আদি সমাজের লোকবল নাই। স্বীকার করিলাম। জিজ্ঞাসা করি যে যখন রাজা রামমোহন রায় প্রথম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন কি বড় লোকবল ছিল? দুই তিন জন ব্যতীত কে তাঁহার বাস্তবিক সহায় ছিল? সহায়

হওয়া দূরে থাক্‌, অনেকেই তাঁহার মৌখিক বন্ধু ও গুপ্তশত্রু হইয়া যথাসাধ্য বিঘ্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তিনি ঘোর অন্ধকারে অন্বেষণ করিয়া প্রদীপের আলোক আনিয়াছিলেন; প্রধানাচার্য্য মহাশয় সেই প্রদীপের আলোকে কথা করিয়া গ্যাসের আলো আনিয়াছিলেন; এইবারে আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে গ্যাসের এতটা আলোকেও না সন্তুষ্ট হয়ে বৈদ্যুতিক আলোক আনয়নের চেষ্টা করি।

তৃতীয় বিঘ্ন এই যে, আদি সমাজের অর্থবল নাই। তাহার কারণ আপাততঃ দেখিতে পাই যে আদি সমাজের বহিরঙ্গের যত দোষ থাকুক আর না থাকুক, অন্তরঙ্গে এ বিষয়ে গুরুতর দোষ আছে। আদি সমাজের ভার যেরূপ মহৎ লোকদিগের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ অতি অল্প সমাজের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। অন্তরঙ্গ প্রত্যেকে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ কালে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সপ্তম প্রতিজ্ঞার প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন, তবে আজ কি আদি সমাজের এরূপ অবস্থা হইত? ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের ছয়টী প্রতিজ্ঞা বাহিরের বস্তু নহে, তাহা অন্তরের পরীক্ষার বস্তু; কিন্তু সপ্তম প্রতিজ্ঞা বর্ষে বর্ষে দান—বাহিরের জন্য। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এরূপ ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিতেছে, তাহার প্রতি আমাদের স্নেহ কিসে প্রকাশ পাইবে যদি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দানভাণ্ডারস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজকে না পোষণ করি? আমরা যদি সকলে সামান্য পরিমাণেও অর্থ প্রদান করি, তাহা হইলেও কি যথেষ্ট উপকার হয় না? আমাদের উচিত যে, আমরাও যখন সমাজের অন্তরঙ্গ হইলাম, তখন আমরাও সমাজকে যথাসাধ্য পোষণ করি। এখন বিঘ্ন বলিয়া আমাদের

সহায় সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। দুঃখের পর সুখ ভাগ, সুখের পর দুঃখ কিছুই নয়।

প্রথম সহায়—সমাজের অধিকারপত্র (trust deed); এই অধিকার পত্র এরূপ উদারভাবে রচিত, যে বলিতে গেলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রভৃতি স্বীকার করিয়া যে কোনরূপ সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক উন্নতি করনা কেন, সমস্তই এই সমাজের অন্তর্গত হইতে পারে।

দ্বিতীয় সহায়—আদি সমাজের বিশেষত্ব; তাহা বিপ্লবে নহে কিন্তু নবীকরণে; (বাঙ্গলা ঠিক হইয়াছে কি না জানি না, তাই ইংরাজীতে বলি—revolutionএ নয়, কিন্তু reformationএ)। বিপ্লব যেরূপই হউক না কেন, তাহা আপাততঃ খুব কার্য্য করে বটে, কিন্তু পরিশেষে আপনি আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। নবীকরণে আপাততঃ কোন উপকার মনে না হইতে পারে কিন্তু তাহাই বাস্তবিক পরোক্ষভাবে সুফল প্রসব করে। আমরা কোন বস্তু একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চাহিতেছি না; প্রতি বস্তুর মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভাল ভাগটুকু লইবার যত্ন করিতেছি। ইহাতেই সমস্ত জাতি এক হিসাবে আমাদের সহায়। ইহাতেও যাহারা বিপক্ষতাচরণ করে, তাহারা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই করে; একবার তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন করিলে হয়ত আর করিবে না। আমি জানি অনেকে আমাদের আদি সমাজের পক্ষপাতী আছেন কিন্তু তাঁহারা লোকভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক স্পষ্টাক্ষরে বলিতে সাহস করেন না; কিন্তু তাঁহাদিগকে কি অন্ততঃ অর্দ্ধসহায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না? বিপ্লবে কি

হয়—না আপাততঃ গুটিকতক লোক সহায় হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। অবশেষে সেই কয়টী লোক একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। ভারতের ইতিহাস এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য দুঃখের সহিত স্বীকার করি যে বিপ্লবেরও প্রয়োজন আছে ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিপ্লব আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তৃতীয় সহায়—আমাদের উৎসাহ ; কার্য্য করিতে সক্ষম হই বা না হই, চেষ্টার ত্রুটি করিব না—এইরূপ উৎসাহ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। আবার একবার সেই রামমোহন রায়ের কাল ভাবিতে হইবে। সেই ঘোর অন্ধকারে, যখন লোকবল ছিল না, অর্থবল ছিল না—কেবল একমাত্র ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮০৲ টাকা দিতেন—সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ কি জীবিত থাকিত—যদি না শ্রদ্ধেয় রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ থাকিত? তিনি কোন মহৎ কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যদি সমস্ত বিঘ্ন—জলঝড় ও সাংসারিক সুখ সকল--অতিক্রম করিয়া সমাজকে আপনার হৃদয়ের সহিত রক্ষা না করিতেন, তবে হয়ত আজ ব্রাহ্মধর্ম্মলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিত না। ইনি সমাজেই দশ টাকা মাসিক পাইয়া মৃত্যুকালে সমাজকে ৫০০৲ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন! ধন্য তাঁর উৎসাহ! আমরাও যদি তাঁহার মত ধনপ্রাণ সমাজের জন্য অর্পণ করিতে পারি, তাহলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব এরূপ উৎসাহের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না।

আমাদের চতুর্থ ও প্রধান অবলম্বন পরমেশ্বর। যাঁহার কার্য্য

করিতে যাইতেছি, তিনি কি কিছুমাত্র সহায়তা করিবেন না? কিছুমাত্র কেন—সম্পূর্ণই সহায়তা করিবেন। আমাদের লোকবল নাই, অর্থবল নাই; নাই বা থাকিল, যদি আমরা ঈশ্বরকে যথার্থ প্রাণের সহিত অবলম্বন করিয়া থাকি? বিপক্ষ যদি এক-গুণ বল পায়, আমরা চতুর্গুণ বলে তাহা অতিক্রম করিব। তাই আমার এখন কোনরূপ ভয় হইতেছে না; প্রাণপণে পরিশ্রম করিব, ফল ফলদাতার হস্তে অর্পণ করিব।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
অধ্যক্ষ সভায় প্রবেশ বিষয়ক দ্বিতীয়
আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

তৃতীয় আলাপ—অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ

গ্রন্থের মুখবন্ধ (অপ্রকাশিত)।*

সেই সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইহা দ্বারা যদি একটী লোকেরও কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

বর্ত্তমানকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিস্রোত যেমন খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতার পঙ্কস্রোতও নানা দিগ্দেশ হইতে ধৌত হইয়া আজি এই ভারতের অধ্যাত্মভাবের উৎস সমূহকে অজ্ঞাতভাবে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই সকল উৎস অতি গভীর নিহিত বলিয়া এখানে নাস্তিকতা তত প্রসর পাইতেছে না। এখানে অধ্যাত্মভাবের উৎস সকল হইতে রুদ্ধবেগ স্রোত নির্গত হইয়া দ্বিগুণ তেজে উৎসারিত হইয়া নাস্তিকতার পঙ্করাশি অনেক পরিমাণে বিধৌত করিয়া দেয়।

---

* মৎবিরচিত "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" গ্রন্থখানি আজ সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের উদ্দেশ্যে তৎকালেই লিখিত একটী মুখবন্ধ এত দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি এই "আলাপ" গ্রন্থে এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ মার্জ্জনীয়, কারণ ইহাতে যখন নানা বিষয়ের আলাপই থাকিবে, তখন "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" প্রকাশের কারণ সম্বন্ধীয় আলাপই বা না থাকিবে কেন? বাহুল্যেনালং।

আমাদের হৃদয় হইতে নাস্তিকতার পঙ্কিলতা যে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না, তাহার একটী প্রধান কারণ বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব। ধর্ম্মশিক্ষা বলিতে যেন কেহ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-শিক্ষা না বুঝেন। যে ধর্ম্মশিক্ষার ফলে শৈশবকাল হইতে পাপকর্ম্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণা এবং পুণ্যকর্ম্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতি জন্মে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা। কিরূপে সেই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, সে বিষয়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা এই ক্ষুদ্র মুখবন্ধে অসম্ভব। তবে সংক্ষেপত এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারতের মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রচারিত শিক্ষাপ্রণালী উপযুক্তমত পরিবর্ত্তন সহকারে গ্রহণ করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

যাই হউক, এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে নাস্তিক্যভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করে এবং তাহারা তাহার আনুসঙ্গিক কুফলরাশিও ভোগ করে। ঈশ্বরের ইহা করুণা যে, আমার অন্তরে নাস্তিক্যভাব সময়ে সময়ে দেখা দিলেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। গৃহে পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব এবং পূজনীয়া মাতৃদেবী এই উভয়ের প্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষার ফলে নাস্তিকতা ও তৎসঙ্গী পাপের পূতিগন্ধ পঙ্করাশি কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিবার অন্তত একটা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং এখনও প্রাপ্ত হইতেছি। সেই চেষ্টা করিবার কালে দেশীয় ও বিদেশীয় অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক নানা পুস্তক হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এই শুভ অবসরে সেই সকল পুস্তকের রচয়িতাদিগকে এবং পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা আমার হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করুন।

বাল্যকাল অবধিই আমার হৃদয়ে আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধীয় আলোচনা চলিয়াছিল। আমি যখন বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময়েও আমার দু একটী সহপাঠী অথচ বয়োবৃদ্ধ বন্ধু হকস্লি স্পেন্সর প্রভৃতির প্রচারিত অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধীয় কতক গুলি শ্রুত কথা লইয়া আস্তিক্যের বিরুদ্ধে আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। গৃহে গুরুজনদিগের নিকটে শুনিয়া শুনিয়া আস্তিক্যসমর্থক মোটামুটী কয়েকটী কথা আমার জানা ছিল এবং আমি আমার সেই পুঁজি মাত্র লইয়াই তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করিতে উদ্যত হইতাম; ক্রমে উন্নত শ্রেণীতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও অজ্ঞেয়বাদ-সমর্থক নানা গ্রন্থ পড়িয়া তাহার সপক্ষে নূতন নূতন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন এবং আমিও অধ্যাত্মধর্ম্মসমর্থক নানা গ্রন্থ পড়িয়া নূতন নূতন যুক্তি দ্বারা তাঁহাদের আপত্তিখণ্ডনে নিরত রহিলাম।

সময়ে সময়ে বন্ধুগণের যুক্তিবলে আমারও অধ্যাত্মবিষয়ে ক্ষণিক সংশয় উপস্থিত হইত। সেই পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাদের সংশয়বাদের প্রতি কিছু অতিমাত্র প্রবণতা দেখিয়া এবং তৎসঙ্গে আমারও আগন্তুক সংশয়বাদজনিত শূন্যহৃদয়ে ভীত হইয়া কতবার ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের নিকট আমার নিজের এবং বন্ধুদিগেরও জন্য জ্ঞানভিক্ষা করিয়াছিলাম। অবশেষে ভক্তবৎসল ঈশ্বর আশাতীত ফল প্রদান করিয়া সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সহসা একদিন এক বন্ধুর * নিকট হইতে একটী পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল—"আমার যে নাস্তিকতা তাহা অন্যান্য সকলের নাস্তিকতার ন্যায় নহে; আমার

* তিনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

নাস্তিকতারূপ সার মাটীতে আস্তিকতারূপ গোলাপ কুসুম ফুটিয়াছে। আমি এখন যে কি উচ্চ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।"

এদিকে আমারও ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধ্যাত্মরাজ্যে নাস্তিকতার সহিত যে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সংগ্রামসংঘর্ষে, সমুদ্রমন্থনে হলাহল ও অমৃতের ন্যায়, ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা প্রভৃতি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন, উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল। আমি এমত বলিতে সাহস করি না যে, আমার আপত্তিখণ্ডনের উপর আর কাহারও একটী কথা চলিতে পারে না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, যখন ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা আসিয়াছিল, তখন ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহার খণ্ডনযুক্তিও পাইয়াছিলাম। তাহাতে অন্তত আমার হৃদয়ের অশ্রদ্ধা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাতে অন্ততঃ আমি নিজে শান্তিলাভ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান গ্রন্থ (অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়-বাদ) সেই সকল আপত্তি ও তাহার খণ্ডনযুক্তিসমূহের, বলিতে গেলে, সংগ্রহ মাত্র। আমারই ন্যায় অজ্ঞ ও সংশয়সাগরে ভাসমান একটী মনুষ্যেরও উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানকণিকা সকল অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদরূপ নাম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিবার সাহস পাইয়াছি। ইহা অন্তত আমাকে সংশয় হইতে অনেক সময় রক্ষা করিতে পারিবে, ইহাই আমার পরম লাভ।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে নাস্তিকতার কুফল এবং আস্তিকতার সুফল বিস্তৃতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধ্যাত্মতত্ত্বের সন্ধানপ্রণালী এবং তাহার মূল অবলম্বন আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আত্মার অবিনশ্বরত্ব

এবং অন্যান্য নানাতত্ত্ব তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। আত্মাই হিরণ্ময় কোষ, পঞ্চম অধ্যায়ে তাহাই যথাসাধ্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব এবং সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মের সৃষ্টিনিয়ন্তৃত্ব যথান্বয়ে বলা হইয়াছে। সৃষ্টিনিয়ন্তৃত্ব অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ঈশ্বরের শুদ্ধমপাপবিদ্ধং স্বরূপ এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং উপাস্যসম্বন্ধ একাদশ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় অনন্তস্বরূপ সীমাবদ্ধ আমার হৃদয়ের কথা দ্বারা বর্ণনা করিতে চেষ্টা মাত্র করিয়া আমি নিজেই কৃতার্থ হইয়াছি। উপ-সংহারে ঋষিবাক্যে দেবদেবের আশীর্ব্বাদ পাঠকবর্গের এবং আমার নিজের মস্তকে বর্ষণের ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছি।

প্রবন্ধগুলিকে একেবারে নীরস দার্শনিক আকার প্রদান করিতে চেষ্টা করি নাই, কিন্তু দার্শনিকতার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারি নাই। মোটের উপর যে সকল যুক্তি যে ভাবে আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে পৌঁছিয়া আমার সংশয়রাশি দূর করিতে পারিয়াছে, আমি সেই সকল যুক্তিকে সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। গ্রন্থের প্রথমাংশে দুএক অধ্যায় ন্যূনাধিক নীরস হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ যতই অগ্রসর হইবেন, ততই এই গ্রন্থে রসস্বরূপ পরমেশ্বরের রসচ্ছায়া দেখিতে পাইবেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
"অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" গ্রন্থের মুখবন্ধ বিষয়ক
৬ষ্ঠ আলাপ সমাপ্ত।

—:০:—

আপনার গান ।*

আপনার গান গাহি
জগত জড়িত তায়।
আপনার গৃহে বসি
দেখি যে বিশ্বের কায় ॥

প্রভাতে তপন উঠে দেখি
জাগায়ে বিহগগণে।
বিহগে ধ্বনিত করে বন
মহান হরষ-মনে ॥
সন্ধ্যায় তপন ডুবে যায়
অকূল জলধি মাঝে।
আঁধারে জগত ঢেকে যায়—
পূরবী রাগিণী বাজে ॥
বিছায় চন্দ্রমা শুভ্র হাসি
বিমল কিরণ ছলে।
তারা ফুটে উঠে হেথা হোথা
সাজায়ে গগনতলে ॥

বাহিরে এসব দেখি যবে
কিছুরি পাই না ঠাঁই।
সুখশান্তি থাকে নাক—বহে
শুধু মরণের বায়।

---

* বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রচিত।

জড়তা-আচ্ছন্ন দেখি সব
প্রাণ নাহি কোথা পাই ॥
অন্তরে প্রবেশি' দেখি যবে,
তখনি জানিতে পাই।
তপনের গতি তোমারই নিয়মবলে।
তোমারই মহিমা-গান পক্ষীকলকলে ॥
নিশীথ আঁধারে শান্তির বিশ্রামশ্বাস।
চন্দ্রমাকিরণে স্নেহের চন্দনবাস ॥
অসীম সুন্দর তুমি তারকাগগনে।
তোমারি কোমল হাত প্রভাতপবনে ॥

অন্তরে প্রবেশি' তোমা পানে
দেখিলে জানিতে পাই।
গাহি যবে আপনার গান
জগত জড়িত তায় ॥

—:ও:—

পঞ্চম আলাপ — ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ।*

আজকাল সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া মিলনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। জগতে এক অভূতপূর্ব্ব মিলনের সুগন্ধ বায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় যিনি এই মিলনের সহায়তা করিবেন, বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার পক্ষে যিনি যতটুকু সাহায্য দান করিবেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে জগতের কৃতজ্ঞতার পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিগত মাঘোৎসবের সময়ে রেভারেণ্ড জেমস সাণ্ডর্লাণ্ড এই কলিকাতা নগরীতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা-সমূহের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মিলন সংসাধিত হয় এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাহাতে ইউনিটেরীয় সম্প্রদায়ের মিলন সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেকের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত (বর্ত্তমানে পরলোকগত) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক নগরের অন্যতম প্রধান ধর্ম্মবক্তা এবং তিনি চিকাগো নগরের মহাধর্ম্মমণ্ডলের বিশেষ অনুরাগী। তিনি সেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে সকল প্রস্তাব

---

* (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) ১৮১৮ শক ১লা বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

করিয়াছেন, পত্রোক্ত সেই সকল প্রস্তাব তাঁহারই হৃদয়ের যথার্থ উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সেই প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্য্যকর তাহা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ পাইবে। তবে, আমরা সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব একটী কমিটি গঠিত করিবার উপদেশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কমিটির বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। (১) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার সহিত মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য একজন ইংরাজ ইউনিটেরীয় প্রচারক প্রেরণ; (২) কলিকাতায় ইউনিটেরীয় এবং ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের সহযোগী একটী "পোষ্ট আফিস মিশন" স্থাপন; (৩) কলিকাতাতে ইউনিটেরীয় পুস্তকাদির বিক্রয় ব্যবস্থা করা; (৪) সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা অথবা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের) ও ভিক্টোরিয়া কলেজ (নববিধান সমাজের) মিলিত করা; (৫) ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরীয় এবং ব্রাহ্মসমাজ, ইহাদিগের সমবেত চেষ্টায় একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিদ্যালয় স্থাপন; (৬) উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর অক্সফোর্ড নগরের ম্যানচেষ্টার কলেজে অধ্যয়নার্থ দু একজন ছাত্র প্রেরণ; (৭) ইংরাজ ইউনিটেরীয়দিগের সাহায্যে কলিকাতায় সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের নূতন এক মুখপত্র সংস্থাপন; (৮) ব্রাহ্মদিগের প্রচার কার্য্য, শিক্ষাদান এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ; (৯) ইউনিটেরীয় সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের মধ্যে পুস্তক

পত্রিকাদি বিশেষ ভাবে বিনিময়; এবং (১০) উভয় সমাজের মুখপত্র সমূহে উভয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রবন্ধ লিখন।

এই কয়েকটী প্রস্তাবে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইউনিটেরীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম যাহাতে ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া প্রচারিত হয়, সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেবের সেইরূপ ইচ্ছা। তাঁহার পক্ষে তাহা যে অন্যায় তাহা আমরা বলি না; প্রত্যুত যত প্রকার উপায় হইতে পারে, ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্য, কারণ তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন তাহাই প্রচার করিবেন। প্রস্তাব কয়েকটীতে একদিকে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অপরদিকে উদারভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ইউনিটেরীয় ধর্ম্মপ্রচারকেই একদিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছেন, অপরদিকে সেই ধর্ম্মপ্রচারে ব্রাহ্মসমাজ-শাখা গুলির পরস্পর সম্মিলন এবং তৎসঙ্গে সম্মিলিত ব্রাহ্মসমাজের ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত সম্মিলন বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া তাহারও প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিব যে কিসে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ভাব চলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এবং দ্বিতীয়ত সমগ্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যেন কোন সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া না পড়ি। যে ধর্ম্মের ভিত্তি পরমাত্মা ও জীবাত্মা, সেই ধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক। যে ধর্ম্মের মধ্যে এই দুইটীর অতিরিক্ত অন্য ভিত্তি গ্রথিত হইবে, তাহাই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে। আমরা কিছু পরেই দেখাইব যে ব্রাহ্মধর্ম্মের

ন্যায় ইউনিটেরীয় ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক নহে। সুতরাং শেষোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অভিন্ন হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করা কখনই সম্ভব নহে। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টানদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর, এই কারণে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সহিত আমরা অভিন্ন হইয়া যাইতে পারি না।

আমরা এই সকল বিভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করাতে কেহ এরূপ না বুঝেন যে আমরা মিলনের নিতান্তই বিরোধী। আমরা ইহাই চাহি যে ব্রহ্মোপাসকগণ ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে যেন আপনাদিগের অবস্থা যথার্থরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন, এবং বিভিন্নতার স্থলগুলিও সবিশেষ আলোচনা করিয়া রাখেন; কারণ, তাহা হইলেই মিলনের পরে বিরোধের সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে। অবিবেচনা পূর্ব্বক সহসা অভিন্নভাবে মিলিত হইবার পরে মতভেদ দৃষ্টে তাহা লইয়া বিবাদ কলহ করা অপেক্ষা মিলিত হইবার পূর্ব্বেই বিবাদস্থল জানিয়া মিলিত হওয়া ভাল এবং তাহাতে বিবাদ উত্থাপন হইবার কারণও অতি অল্পই উপস্থিত হইবে।

ইউনিটেরীয়গণের সহিত আমাদের বিরোধের যে সকল কারণ বিদ্যমান আছে, সেইগুলির মধ্যবিন্দু যিশুখৃষ্টের প্রতি তাঁহাদের কিছু অতিমাত্র ভক্তি। ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই খৃষ্টকে তাঁহাদের ন্যায় অযথা ভক্তিপ্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। বাস্তবিক, ব্রাহ্মেরা কোন মনুষ্যকেই, তিনি আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও, মানবোচিত ভক্তির অতীত ঈশ্বরোচিত ভক্তি উপহার দিতে পারেন না। ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে ঈশ্বরের

ঠিক নিম্নেই আসন প্রদান করেন। ব্যক্তিবিশেষ ইহার ব্যতিরেকস্থল হইতে পারেন, কিন্তু আমরা সাধারণ ইউনিটেরীয় সমাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্ট ব্যতিরেকে ঈশ্বর সন্নিধানে যাইবার উপায় নাই ; যিশুখৃষ্ট তাঁহার ভক্তদিগের জন্য স্থান ঠিক করিয়া রাখিবেন। তাঁহাদের কর্তৃক খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত হইলেও, সকল মানবসন্তানের উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাঁহাকেই "শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্ত্তা" বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে যে খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "আমিই একমাত্র গতি, একমাত্র সত্য, একমাত্র জীবন ; কোন মনুষ্যই আমাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না।" ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টের এই দাবী পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন। তাঁহাদের চক্ষে যিশু কলঙ্করহিত ও পাপলেশহীন পূর্ণ মনুষ্য। তিনিই মনুষ্যদিগের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার পূর্ণ আদর্শ এবং তিনিই মানবের পরম গুরু—তাঁহার প্রত্যেক বাক্য অবনতমস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতে যিশুখৃষ্টই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের পিতৃভাব লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন। অবশ্য যখন তাঁহাদের এইপ্রকার মত প্রথম দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাঁহারা জানিতেন না যে খৃষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যদের বেদশাস্ত্রে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইউনিটেরীয়গণ শিশুর নামকরণের সময়ে "পরম পিতার নামে, পরম পুত্রের নামে এবং পরম পবিত্রাত্মার নামে" এইরূপ বাক্যসকল ব্যবহার করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের কোন মুখপত্রে খৃষ্টকে আত্মীয়স্বজন বলিয়া একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।*

* "And welcome to our Christmas cheer,
Dear Jesus thou shalt be ;

আমরা ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত হই বা না হই, আমরা যেন খৃষ্টের নাম অযথাভাবে উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বিঘ্ন আনয়ন না করি। ব্রাহ্মসমাজের অনেক নেতা এই-রূপে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা হয়তো খৃষ্টের প্রতি এইরূপ অতিমাত্র ভক্তি দেখাইয়া বিদেশীয় খৃষ্টানদিগের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা দেখেন না অথবা দেখিতে চাহেন না যে ইহাতে তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের আস্থা কতটা হারাইয়া বসেন। আমি একটী দৃষ্টান্ত দিব—কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্মভ্রাতা তাঁহার পুস্তকে খৃষ্টের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন :—

"ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যেখানে তুমি বসিয়া থাক, সেই স্থানে আমরাও তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিবার ফলে তোমার পুনরুত্থানের ভিতর দিয়া যাহাতে উঠিতে পারি, তদ্বিষয়ে পিতার বক্ষে থাকিয়া প্রার্থনা কর এবং আমাদের পক্ষে দণ্ডায়মান হও।" †

এইরূপ উক্তিসমূহে সহজেই বোধ হয় যে ইউনিটেরীয়গণ খৃষ্টকে যেভাবে দেখেন, ব্রাহ্মভ্রাতাও সেইভাবেই খৃষ্টকে দেখিয়া থাকেন।

Our guest through all the livelong year,
One of our family"

The Enquirer, Dec 2, 1895

† Pray and intercede in the bosom of the Father for those who have put their faith in thee, that, through thy resurection, we, too, may rise to the mansions where thou sittest at the right hand of God. Heart-Beats. P, 153

আমরা খৃষ্টসম্বন্ধে এরূপ অসংযত বাক্য ব্যবহার কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। এই প্রকার উক্তি সকল রূপকমাত্র অর্থাৎ সেগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে স্বীকার করিলেও আমরা বলি যে ধর্ম্মসম্বন্ধে এরূপ কূটব্যাখ্যাযুক্ত ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে। উক্ত ব্রাহ্মভ্রাতা নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন যে ভারতের শাস্ত্রকারগণ এইরূপ রূপকভাষা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলিতেছি যে খৃষ্টের প্রতি তিনি যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন এবং তিনিও করিতেছেন ও তাঁহার পদানুসারী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে করিতে পারেন।

আমরা এগুলি হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়াই বলিলাম। ইউনিটেরীয় প্রচারক সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব যেমন আপনার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, তেমনি ব্রাহ্মেরাও যেন প্রশংসালাভের বা স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় আপনাদের কর্ত্তব্য না ভুলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মধ্যে একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হয়েন না। যখন সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব আসিলেন, তখন অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি যে কতটা সম্মান প্রদর্শন করিবেন তাহার যেন ইয়ত্তা করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু সেদিন স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের দুইজন পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন—হায়! ব্রাহ্মসমাজগুলির মধ্যে এক আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে

দেখিলাম না। আমরা অবশ্য সাণ্ডর্লাণ্ড সাহেব অথবা বিদেশ হইতে আগত কোন সাধু পুরুষের সম্মাননা করিতে নিষেধ করিতেছি না। আমরাও বিদেশীয় সাধু পুরুষদিগের সম্মান করিতে জানি এবং করিয়াও থাকি ; কিন্তু আমরা বলি যে বিদেশকে আপনার করিতে গিয়া যেন স্বদেশকে পর করিয়া না ফেলি। কিছু দিন হইল, কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত আলাপ হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এই একটী কথা বলিলেন যে, 'যে ব্যক্তির পরিধান থানধুতি এবং যাঁহার পায়ে চটিজুতা আছে বা জুতাই নাই, ব্রাহ্মেরা এপ্রকার আচার্য্যকে কি প্রকারে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারেন।' ইহাতে আমাদের মনে বড়ই আঘাত লাগিল। ব্রাহ্মদিগের আদর্শ যদি এইরূপ অবনত হইয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশের অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা দৃঢ়তর হইয়া আইসে। আমরা তাঁহাদিগকে এইটুকু বন্ধুভাবে বলিতে পারি যে, তাঁহারা যেন খৃষ্টনাম যখন তখন অযথা ভাবে উল্লেখ এবং তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মভ্রাতার ভাষা প্রয়োগ না করেন। এই প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে, যখন ইউনিটেরীয়দিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার কথা হইতেছে, তখন ব্রাহ্মদিগের অনেক সময়ে খৃষ্টীয় প্রভাবে মগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনাও আছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইবার অন্যতর অন্তর্নিহিত কারণ এই

অথবা খৃষ্টপ্রীতি। আমরা কাতরভাবে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা পুনরায় খৃষ্টপ্রীতিতে ডুবিয়া পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া বিরোধ আনয়ন না করেন।

এতক্ষণ আমরা ইউনিটেরীয় সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিবাদস্থল দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে মিলন-স্থল নাই তাহা নহে—মিলনের স্থলও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এতদূর অসাম্প্রদায়িক যে ইহার সহিত সকল ধর্ম্মের মিলনস্থল আছেই, কারণ ইহা সকল ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত সার ধর্ম্ম। সুতরাং এই সূত্রে কে অস্বীকার করিবে যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটে-রীয় সমাজেরও মিলনস্থল আছে? যেটুকু জীবাত্মা ও পরমাত্মা লইয়া কথা, তাহাতে উভয় সমাজের মধ্যে যথেষ্টই ঐকমত্য আছে। ইউনিটেরীয়গণ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সম্ভজন করেন, আমরাও তাহাই করি; তাঁহারা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, আমরাও তাহাই করি। তাঁহারা প্রথম মানবের পতন ও সেই সূত্রে মানবপ্রকৃতির চিরবিকৃতি, ঈশ্বরের তাহার উপর ক্রোধ ও তজ্জনিত অভিশাপ; অনন্ত নরক এবং তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য মানবের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপে যিশু খৃষ্টের ক্লেশ প্রাপ্তি ও মৃত্যু, এই সকল কিছুই স্বীকার করেন না; আমরাও তাহা করি না। তাঁহারাও পৃথিবীর কোন ধর্ম্মসমাজকে এবং বাইবেলকে দৈব-প্রভাবোৎপন্ন অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না; আমরাও তাহা করি না। এইরূপ কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের যথে-ষ্টই মিল আছে। এই সকল বিষয়ে মিলিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হয় তজ্জন্যই আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সকল বিষয়ে মিলিতে গেলে বড়ই গোলযোগের সম্ভাবনা।

সেদিন "ইউনিটেরীয়দিগের সহিত মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটি"র একটী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সাণ্ডার্লাণ্ড সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ, এই তিনটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমরা এই সকলের কিছুমাত্র বিরোধী নহি। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম প্রস্তাবে যে নূতন মুখপত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য ইউনিটেরীয়দিগের নিকটে সাহায্য গ্রহণের উল্লেখ আছে, আমরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে এরূপ বিশেষ ভাবে সাহায্য গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী। অনেকে জানেন যে, অনেক স্থলে কোন প্রজাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হইলে জমীদার তাহাকে টাকা ধার দিতে থাকেন। সেই প্রজা তখন কৃতজ্ঞতাভারে এবং ঋণভারে অবনত হইয়া সহজে বিপক্ষতা করিতে পারে না। ইহাও অনেকে জানেন যে ঠিক এই ভাবে এক গবর্ণমেণ্ট অপর গবর্ণমেণ্টকে কোটী কোটী টাকা ধার দিয়া থাকেন। সেইরূপ, যদিও ইউনিটেরীয়গণ ব্রাহ্মদিগকে টাকা ঋণস্বরূপে না দিয়া সাহায্যস্বরূপেও দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ অধিকতর কৃতজ্ঞতাভারে এতদূর অবনত হইয়া পড়িবেন যে তাঁহারা ইউনিটেরীয়দিগের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িবেন। আর যদি কোন বিষয়ে, এমন কি সত্যের অনুরোধেও, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহারা অশেষ নিন্দার ভাগী হইবেন। বন্ধুভাবে এই কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে ইউনিটেরীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক পঞ্চম আলাপ সমাপ্ত।

—:০:—

ষষ্ঠ আলাপ—একটী উপন্যাসের সূচনা। *

রাঢ় ভূমি। ত্রিবান্তরের মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। যতদূর চক্ষু যায়, কেবলই বালি ও বেলে ঘাস। ইহার মধ্যেও কবিরা মাটীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদক্ষেপ করিলে কবিতা রচনার অনেক উপকরণ পাইতে পারেন—বেলে ঘাসের মাঝে মাঝে শৈবাল শ্রেণীর তৃণগুল্মে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল দৃষ্টি ঘোষণা করিতেছে। মাঠের মাঝে মাঝে বনখেজুর গাছের ঝোঁপ। দূরে অশ্বত্থ বটজাতীয় দুএকটী সহজজাত বৃক্ষ গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে পথশ্রান্ত পথিকদিগকে ছায়াদান করিবার জন্য দণ্ডায়মান।

এই মাঠের মধ্যে এক স্থানে দুইচারিটী কুটীরের একটী গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। এ অঞ্চলে জলের বড়ই অভাব। সেই অভাব দূর করিবার জন্য গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা একটী বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া বর্ষাকালে জল ধরিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন—বর্ষাকালে মাঠের এক অংশের সমুদয় জল সেই "বাঁধের" মধ্যে আসিয়া পড়ে। সেই জলে গ্রামবাসীদিগের সম্বৎসর জলসংকুলান হয়; বাঁধের অপর পারে কতকগুলি তালবৃক্ষ সারি সারি রোপিত হইয়াছে। সেই তালবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যস্থলে একটী ঘনচ্ছায় বটবৃক্ষ।

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকাল। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। দুএকটী নীলকণ্ঠ পাখী কর্কশকণ্ঠে চ্যা চ্যা চ্যা শব্দ করিতে

---

* বিংশ বৎসর বয়সে লিখিত।

করিতে তালগাছের কোটরে একবার ঢুকিতেছে আর একবার বাহির হইতেছে। চারিদিকে সুষুপ্তির একটা নিঝুম ভাব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। গ্রামের ভিতর যে কোন প্রাণী আছে তাহার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দূরে—অতি দূরে—দুএকটী রাখাল বালক ধেনু চরাইতেছে—গরু গুলি সাদা সাদা ছাগলের মত ছোট দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে মাঠের গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া রাখালবালকদিগের রামপ্রসাদী গানের দুএকটী ভাঙ্গা তান কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। কেবল বাঁধের পাড়ে সেই বটগাছের ছায়াতে একটি যুবক একমনে একটি গ্রন্থ পড়িতেছে। থাকিয়া থাকিয়া উদাস ভাবের আবেশে জলে প্রতিফলিত তালবৃক্ষগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতেছে; কখনও বা নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর উপভোগ করিতেছে, আবার পরক্ষণে একমনে গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিতেছে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

এই অংশ পড়িয়া যুবক গম্ভীররূপে চিন্তা করিতে করিতে গীতাখানি বন্ধ করিল। এই গীতাখানি যুবকের পৈতামহ সম্পত্তি। তাহার পিতামহ ও পিতার অনুকরণে সে নিজেও প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অন্তত এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিত না।

আজ আবার এমন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে যে জীবজন্তু মনুষ্য কেহই পারতপক্ষে রৌদ্রে বাহির হইতে চাহিতেছে না। মাঠেতে

নানাবর্ণের ছোট ছোট ঘাসের ফুল উকিঝুঁকি মারিতেছে। সরু মুখ ও লম্বা শুঁয়াবিশিষ্ট পাটকিলে রংঙ্গের কীটগুলি এক ফুল থেকে অন্য ফুলে মধ্যে মধ্যে লাফাইয়া পড়িতেছে। তাহা ছাড়া একরত্তি পোকাগুলিও প্রিং প্রিং করিয়া লাফালাফি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিল্লীরব মধ্যাহ্নের নীরব নিঝুম ভাব আরও বাড়াইয়া দিতেছে। দুএকটি নীলকণ্ঠ পক্ষী কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া তাল গাছের গায়ে বসিতেছে। দূরেতে খেজুর গাছের ঝোঁপে দুএকটি ফিঙ্গে পাখী খেলা করিতে করিতে বসিতেছে, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে উড়িয়া যাইতেছে।

যুবক যখন গ্রন্থপাঠে মন দেয়, তখন এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহাকে প্রলোভন দেখাইতে পারে না। যুবকটী দেখিতে বেশ সুপুরুষ—সুপুরুষ বলিতে যেন কেহ তাহাকে রমণী-সুলভ কোমল দেহবিশিষ্ট না বুঝেন। মাথাটা চৌকসধরণের; চুলগুলি খুব ঘন কিন্তু কাঁটার মত খাড়া হইয়া আছে—দেখিলেই বুঝাযায় যে মানুষটী কিছু একরোখা। কপালটী উপযুক্তরূপ প্রশস্ত। নাক শুকপক্ষীর ঠোঁটের ন্যায় ঠিক বক্র না হইলেও বেশ উচু—এ যুবক যে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বা গ্রামে আবদ্ধ থাকিবার লোক নহে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। চক্ষু দুইটী ঠিক হরিণনয়ন না হইলেও বুদ্ধিব্যঞ্জক। দেহযষ্টিখানি বিশেষ দীর্ঘাকৃতি না হইলেও বেশ সুস্থ ও পরিপুষ্ট—মাংসপেশী সকল বেশ দৃঢ় এবং অস্থিগুলি বেশ মজবুত।

যুবকটীর নাম ধরণীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রায় তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে যুবকের এক পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া বীরভূম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। যুবকের প্রপিতা-

মহ প্রান্তর ভেদ করিয়া দূর দুরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া ব্যবসায় অবলম্বনে কিছু টাকার সংস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই এই গ্রামটী প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা অতি উচ্চ ও মহৎ ছিল। সমস্ত ডাঙ্গাকে গ্রামে পরিণত করিয়া ফলপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত করিবেন। সেই কারণে তাঁহাকে প্রায়ই রাজধানীতে যাতায়াত করিয়া রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইয়াছিল। যুবকের পিতামহ গীতাপাঠ এবং নিজের খেয়ালমত সঙ্গীতচর্চ্চাতেই দিবা-রাত্র অতিবাহিত করিতেন। দূর দূর দেশ হইতে লোকে তাঁহার গীতাব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত শুনিতে আসিত। যুবকের পিতাকে একবার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যশোহর অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল— সেই স্থান হইতে ম্যালেরিয়াবিষ দেহে আনিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনকালের মধ্যেই পুত্রটীকে সৎশিক্ষা প্রদানের অবসর পাইয়া-ছিলেন। যে সকল বিদ্যা মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে পারে, সেই সকল বিদ্যাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন যুবকের সত্য সত্য আপনার বলিতে তাহার জননী আছেন। যুবকের বয়স এখন সবে মাত্র পনরো বৎসর।

যুবক যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে বংশ অতি উচ্চ ও সম্মানিত—তবে কি একটা "দোষের" কারণে একঘরে হইয়াছিল। মাঠের মধ্যস্থিত গ্রাম স্থাপন করিয়া উপনিবেশ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতাতে এই পরিবার কিছুকালের জন্ত বাস করিয়াছিলেন। সেখানে ইহাঁদিগকে একঘরে করাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই—বরঞ্চ তাহার ফলে এই গোষ্ঠীর লোকেরা নানা কার্য্যে

অনেকটা স্বাধীনতা পাইতেন, এবং জ্ঞানে কর্ম্মে ইহাঁরা সাধারণ অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন—কুসংস্কার ও সমাজভীতি হইতে ইহাঁরা আপনাদিগকে অনেকটা নির্ম্মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

যুবক গীতাখানি বন্ধ করিয়া চিন্তামগ্ন হইল। সম্মুখে এক জোড়া ঘুঘু ঘাস খুঁটিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে করিতে যুবকের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। একটী ঘুঘু সহসা যুবককে দেখিতে পাইয়া পাখায় ঝটপট শব্দ করিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া গিয়া নিকটস্থ একটী তালগাছের শিয়রে গিয়া বসিল। অন্য ঘুঘুটীও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া প্রথমটীর নিকটেই বসিল। উভয়েই পরে পরে উত্তর প্রত্যুত্তরে ঘু-ঘু রব করিয়া মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা আরও যেন গায়ের কাছে আনিতে লাগিল। যুবক দিবাস্বপ্নে আরও গভীররূপে নিমগ্ন হইল।

যুবক গীতা পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বয়সের অল্পতা এবং সুতরাং বুদ্ধির অপরিপক্কতা নিবন্ধন গীতার প্রকৃত ভাব—নিষ্কাম ভাবের অর্থ ধরিতে পারে নাই। গীতার পূর্ব্বে যুবক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবনচরিত অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং তাহাই যুবকের অর্দ্ধেক হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার দিবাস্বপ্নের প্রধান বিষয় ছিল যে সে নেপোলিয়নের মত অধ্যবসায়ী ও অধ্যয়নশীল হইয়া সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিপ্লব উপস্থিত করিবে এবং স্বদেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে। কার্য্যটা তাহার নিকট অতি সহজ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

দিবাস্বপ্নে যুবক গভীর মগ্ন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে একটী বালিকা তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। বালিকার বয়স

প্রায় তের বৎসর। বালক ডাকিল "শান্তশীলা"। বালিকা চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া হাসিতে লাগিল।

বালক বলিল "শান্তি, তুমি কখন্ এলে আমি কিছুই জানতে পারিনি ?"

বালিকা বালকের পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল। বালক জিজ্ঞাসা করিল "এই রৌদ্রে তুমি এখানে কেন এলে ?"

শান্তশীলা প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল—"বলি এত কি ভাবছিলে যে আমি এলুম আর তুমি জানতেই পারলে না" ?

বালক। "না এমন কিছুই না—স্বপ্নের মত দেখছিলুম যেন কতকি কাজে একেবারে ডুবে গিয়েছি"। বালিকা কথাটার মর্ম্ম তত ভালরূপ হৃদ্গত করিতে না পারিয়া বলিল—"সেতো ভাল কথা"। দুইজনেই কিছুক্ষণ সম্মুখের বাঁধের জলে তালগাছ গুলির ছায়ার খেলা এবং পুঁটীমাছের খেলা নীরবে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বালিকা সুন্দর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি করে জানতে পারলে যে আমি চোখ টিপে ধরেছিলুন" ?

ধরণীও আপনার সরল হাসি শান্তশীলার সরল হাসিতে মিলাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "এই ডাঙ্গার মাঝে তোমার ছাড়া এমন সুন্দর হাত আর কার হতে পারে" ? বালিকা হাসিল—উভয়ের সেই হাসিতে উভয়ের অজ্ঞাতসারে ভাবের সাগর চলিয়া গিয়াছিল।

বালিকাকে সুন্দরী বলিলে কিছুই বলা হইল না—উপন্যাসে বর্ণিত সুন্দরীর ন্যায় তাহার কোনই সৌন্দর্য্য ছিল না। তাহার

বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ নহে। চক্ষুযুগলও ঠিক পটোলচেরা চোখ ছিল না, নাকটীও তিলকুসুমের মত ছিল না এবং ঠোঁট দুটীও বিম্বাধর ছিল না। কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠবে বেশ একটী সামঞ্জস্য ভাব ছিল। তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত যে তাহার মনের মধ্যে যেন কিছুই লুকানো থাকিতে পারে না—এই সরলতাই তাহার সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বাম গালে নীচের দিকে একটী তিল ছিল—তাহাতে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিই হইয়াছিল। মুখখানি যেন একটু চেপ্টা বলিতে পারা যায়। বালিকার দৈহিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রধান সৌন্দর্য্য তাহার শুভ্র দন্তপংক্তি। হাসির সঙ্গে সেই দাঁতগুলির শোভা অতি সুন্দর বিকশিত হইত। তাহার কণ্ঠস্বরও অতি মিষ্ট ছিল—কেন যে মিষ্ট তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। সে কণ্ঠস্বরে বিলাসনিমগ্না বিলাসিনীদের উপযুক্ত কর্কশতা এতটুকুও ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদেও তাহার কিছুমাত্র আড়ম্বর থাকিত না—একটী শেমিজ, বন্ধগলা একটী জ্যাকেট এবং স্বদেশে প্রস্তুত একখানি কালাপেড়ে মোটা সাড়ী। বালিকার কাপড়ে জাঁকজমক না থাকিলেও কাপড় পরিবার ধরণে বেশ একটা সৌম্যভাব ছিল।

বালিকার পিতা কলিকাতার একটী পুরাতন জমীদার বংশোদ্ভূত। যুবকের পিতামাতার সহিত বালিকার পিতামাতার বহুকালের পুরাতন বন্ধুত্ব। বালিকার পিতার নাম গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ধরণীর বাসগ্রাম যে সবডিবিজনের অন্তর্গত, সেই সবডিবিজনের আদালতে গোপাল বাবুকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আসিতে হইত। সেই অবসরে তিনি মধ্যে মধ্যে ধরণীর বাড়ীতে আসিয়া তাহার ঠাকুরদাদার সঙ্গে

দেখা করিয়া যাইতেন। ধরণীর ঠাকুরদাদার অনুরোধে গোপাল বাবু সময়ে সময়ে সপরিবারে আসিয়া ধরণীর বাড়ীতে মাসখানেক করিয়া কাটাইয়া যাইতেন। এবারে আসিয়া তাঁহার প্রায় দুই মাস কাল থাকা হইয়াছে—এক একটী সপ্তাহ চলিয়া যায়, আর ধরণীর ও তাহার ঠাকুরদাদার অনুরোধক্রমে গোপাল বাবুও থাকিয়া যান। এইরূপ প্রায় মাস দুই চলিয়া গিয়াছে। এখন আর থাকিলে চলিতেছে না। জমীদারীর কার্য্যের গতিকে এবারে গোপাল বাবুকে যেতেই হবে। টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আজ বৃহস্পতিবার। আজ বৈকালেই তাঁহাকে ছাড়িতেই হইবে।

অন্যদিন যে রকম পল্লীগ্রামের ধূলিধূসরিত বেশে শান্তশীলা ধরণীর সম্মুখে উপস্থিত হইত, আজ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত বেশে আসিয়াছে। মুখে গভীর বিষাদরেখা। গালভরা হাসির মধ্যেও সেই বিষাদরেখা কিছুতেই একেবারে ঢাকা পড়িতেছে না।

ধরণী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "শান্তি, আজ তোমার মুখে এরকম ভাবনার ছায়া দেখ্ছি কেন?" বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। শান্তশীলা আর থাকিতে না পারিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরণীর হাতখানি লইয়া বলিল, "ভাই, তুমি জান বোধ হয় যে আজ আমাদের যেতে হবে। এতদিন কি সুখে দিনগুলো কেটে গেল। আমার কি রকম মনে হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে আর এরকম দেখা হবে না। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

ধরণী। কেন এবার কি যাওয়া বন্ধ হয় না?

শান্তশীলা। না ; টেলিগ্রাম এসেছে যে বাবার না গেলেই চলবে না।

ধরণীর মুখে আর কথাটী নেই—ভাবনার ভারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অবশেষে শান্তশীলা সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া—"আচ্ছা ভাই, তুমি কি আমাদের বাড়াতে আসতে পার না? সেখানে তোমার কোনই অসুবিধা হইবে না।"

ধরণী। তোমাদের যাবার কথায় আমার এতটুকু বিশ্বাস কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে না।

ধরণী অবশ্য বুঝেছে যে এবার আর গোপাল বাবুর যাওয়া কিছুতেই বন্ধ করিতে পারা যাইবে না। শান্তশীলার অভাবে যে তাহার হৃদয়ে কি একটা শূন্য ভাব আসিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। শান্তশীলা বলিতে গেলে তাহার একমাত্র বন্ধু ও খেলার সঙ্গী। কতদিন তাহার সঙ্গে চিরকালের আশা ভরসা ও দিবাস্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিয়াছে। এই দুই মাসের পর আজ সে চলে যাচ্ছে, আর কার সঙ্গে এমনভাবে প্রাণ খুলে কথা কহিবে?

উভয়েই ভাবনায় নীরব। অনেকক্ষণ পরে শান্তশীলা "আমার কাপড় চোপড় গুছাইতে হইবে" বলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল।

ধরণীর কাছে এবারে কি জানি কেন সমস্ত জগৎ যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল যে এমন কোন কথা নাই যে তাহার নিজেকে এই গ্রামে বনফুলের মত নীরবে ঝরিয়া পড়িতে হইবে। শান্তশীলার বিরহে সমস্ত মাঠের স্তব্ধভাব মরুময় বোধ হইতে লাগিল—কিছুই আর ভাল লাগিল না।

ধরণী স্বভাবতই একটু গম্ভীর ছিল, এখন অবধি আরও বেশী গম্ভীর হইয়া পড়িল।

যথাসময়ে গোপাল বাবু সপরিবারে কলিকাতায় যাইবার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত। ধরণীর ঠাকুরদাদা তাঁহাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য ধরণীকেই তাঁহাদের সঙ্গে পাঠালেন। ধরণী ও শান্তশীলার বেশী কিছু কথা হইল না—দুএকটী কথার পর উভয়েই নীরব। তাহারা পরস্পরের মনের কথা মন দিয়াই জানিতেছিল। যথাসময়ে গাড়ীর বাঁশী বাজিল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন ধরণী ও শান্তশীলা উভয়েরই মনে একটী কথা উঠিল এবং উভয়েই অন্যের অগোচরে মৃদুস্বরে পরস্পরকে একই সময়ে বলিয়া উঠিল "ভুলোনা।"

ইহার পর ধরণী ও শান্তশীলার জীবনের উপর দিয়া নানা ঘটনা ঘটিয়া গেল। পরিণামে শান্তশীলাকে তাহার পিতা এক ধনী জমীদারের সহিত বিবাহ দিলেন। শান্ত স্বামীর হস্তে অনেক কষ্ট পাইয়াছিল। বিবাহের পর অবধি সে ধর্ম্মকর্ম্মে সমস্ত হৃদয়-মন অর্পণ করিল। কিন্তু অনেক কষ্ট পাইতে পাইতে এক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অকালেই ভগবানের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিল। এদিকে ধরণী সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে একটী উপন্যাসের সূচনা বিষয়ক ষষ্ঠ আলাপ সমাপ্ত।

—:০:—

একা।

নিভৃত কুটীরে বসিয়া বসিয়া
অসীম চরণে হৃদয় খুলিয়া
একাকী গাহিছি গান—
বিশ্বের গান
প্রেমের গান
অনন্ত মহিমা গান—
দুঃখশোক পরিত্রাণ॥

—:ওঁ:—

অষ্টম আলাপ—ওয়াল্ট হুইটম্যান। *

পুরাণে পড়া গিয়াছে যে অতি পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র জর্জ ওয়াসিংটন মাতৃভূমির বিমাতৃসদৃশ অত্যাচার হইতে উপনিবেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে রক্ষা করিতে গিয়া "আমেরিকার যুক্তরাজ্য" সংস্থাপিত করিলেন। সেই নূতন বিশ্বামিত্রের নূতন রাজ্যে সকলই নূতন কাণ্ড। ইহাদিগের শাসনপ্রণালী, ইহাদিগের স্বাধীনতা, ইহাদিগের বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সকলই অদ্ভুত।

যখন ইউরোপ সাধারণতন্ত্র ও স্বাধীনতালাভের জন্য লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী ব্যক্তির জীবন বিনিময় করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারিল না, তখন আমেরিকার যুক্তরাজ্য ওয়াসিংটনের কথায় একদিনেই সাধারণতন্ত্র লাভ করিল এবং সেই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির এক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাতে আমেরিকার সাহিত্যও যেন সেই স্বাধীনতার বাতাস চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে। যে দেশের ধনীদরিদ্র, স্ত্রীপুরুষ, কৃষকশাসক, সকলেই মনুষ্যত্বের সাধারণ অধিকারে নির্ব্বিশেষভাগে স্বাধীন, সেই দেশ হইতেই স্বাধীনতার সৌরভবিশিষ্ট অপূর্ব্ব সাহিত্য জগতকে অতি উদার সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারে। এক কৃষক চা পান করিতেছিল, এমন সময়ে সে দেখিল যে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট (প্রধান

---

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে লিখিত।

শাসনকর্ত্তা) তাহার সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতেছেন ; কৃষক নির্ভীক চিত্তে, প্রেসিডেণ্টের সম্মানরক্ষার জন্য, তাঁহাকে তাহার পরিমিত চা প্রভৃতির অংশগ্রহণে অনুরোধ করিল ; প্রেসিডেণ্টও কৃষকের মহদাশয়তার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব না মিশিয়া গিয়াছে, সে দেশে কি এরূপ মনুষ্যত্বের সম্মানরক্ষা সম্ভবে ? সে দেশ কি কখনও প্রকৃত সাম্যমন্ত্র শিক্ষা দিতে পারে ? যে দেশের মনুষ্য স্বাধীন নহে, সেদেশের স্বাধীনতার সাহিত্যেও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। আমেরিকার মর্ম্মে মর্ম্মে এক বিরাট স্বাধীনতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তাহার স্বাধীনতাসাহিত্য এবং সাহিত্যস্বাধীনতা, উভয়ই এই পরাধীন বঙ্গসন্তানের হৃদয়কেও সাম্যমন্ত্রের ভেরীধ্বনিতে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে।

এই বিরাট স্বাধীনতা ও বিরাট প্রেমের আধারভূমি আমেরিকার স্বাধীন কবি, প্রেমিক কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান। যখন নব্যজগৎ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া পুরাতন জগত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যখন নব্যজগতের অধিবাসীগণ স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়া জগতকে নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ের আনন্দে ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন করিতেছে, সেই সময়ে ওয়াল্ট হুইটম্যানের জন্ম। এই সকল কারণে বোধ হয়, তাঁহার কবিতা স্বাধীনতা ও প্রেমের উৎস হইয়া পড়িয়াছে।

কবি প্রথমেই এক মহান উদার সঙ্গীত গাহিয়া আরম্ভ করিয়াছেন—

"One's self I sing, a single separate person:
Yet utter the word Democracy, the word En-masse
Of Physiology from top to toe I sing,
Not physiognomy alone, nor brain alone is worthy of
The muse, I say the form complete is worthier far.
The female equally with the male I sing—
Of life immense in passion, pulse and power,
Cheerful for freest action form'd under
the laws divine
The modern man I sing"

কবি বলিতেছেন যে তিনি আপনাকে কেন্দ্র স্থলে রাখিয়া জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির গান গাহিবেন ; তিনি কেবল আকৃতি-সৌন্দর্য্য বা বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে গাহিবেন না—তিনি গাহিবেন বর্ত্তমান মনুষ্য ; তাঁহার গানে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেই নির্বিশেষ ভাবে স্থান পাইবে ; তাঁহার গানে মানবজাতির ভাব, কর্ম্ম, বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ই স্থান পাইতে পারে এবং পাইবে।

বঙ্গদেশের নির্জ্জীব ভাষায় কি ঐ মার্কিণমুলুকের গানের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যায়? ঐরূপ সঙ্গীত রচনার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র সেই মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান। ঐ দেখ, হুইটম্যান কি সুন্দর ভাবে দণ্ডায়মান। আকৃতি দেখিলেই বোধ হয় যে ইনি প্রকৃতই স্বাধীনতার কবি, প্রকৃতই বর্ত্তমান মানবের কবি। দুইটী মাংসপেশীময় সুদৃঢ় বলিষ্ঠ বাহু প্যাণ্টা-লুনের দুই পকেটে রাখিয়া, গলার বোতামখোলা কামিজ পরিয়া, প্রশান্ত দুই সুন্দর স্থির নয়নে যেন বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডকে আপনার

বুকের ভিতরে স্থান দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন; স্বাধীনতা যেন কৃষকের সাজে সজ্জিত হইয়া কৃষক শাসক সকলকেই আপনার শান্তিপথে আহ্বান করিতেছে।

ইংলণ্ডেও সেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বাধীনতার বিষয়ে বিস্তর লিখিয়া গিয়াছেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বিস্তর লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই সকল লেখার মধ্যে হুইটম্যানের সেই প্রশান্ত উদারতা পাওয়া যায় না। সেলি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিতে লিখিতে রাজার বিরুদ্ধে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়া বসিলেন; রাজাকে নির্ব্বোধ, পাষণ্ড প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন যে তিনি রাজাকে ঘৃণা করেন। তিনি সাধারণ হইতে নামিয়া কেন্দ্রে আসিলেন, আপনাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হুইটম্যানের বোধ হয় একটী কবিতাতেও এরূপ কটূক্তি অথবা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায় নাই। হুইটম্যান রাজা ও সম্রাটদিগের নিন্দা করিবার প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রকৃত ভক্ত; এই জন্য তাঁহাকে রাজা প্রজা সকলকেই সমানভাবে আহ্বান করিতে হইবে। তাই তিনি যখন পৃথিবীকে অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইংলণ্ডের পুত্রকন্যাদিগকে রাজাপ্রজানির্ব্বিশেষে অভিবাদন করিলেন; তখন রুসিয়ার পুত্রকন্যাদিগকে কৃষকসম্রাটনির্ব্বিশেষে অভিবাদন করিলেন। তিনি রাজা বা সম্রাট, বিশেষভাবে কাহাকেও উল্লেখ করিলেন না, কারণ তিনি সাধারণতন্ত্রের লোক; কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিবেন না, ইহাও নিশ্চয়। কি সুন্দর ভাবে, কি দেবস্পৃহনীয় স্বরে তিনি সকলকে

আহ্বান করিতেছেন, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে :—

You whoever you are !

You daughter or son of England !

* * * You Russ in Russia !

You Chinaman and Chinawoman of China ! You Tartar of Tartary !

All you continentals of Asia, Africa, Europe, Australia, indifferent of place !

All you on the numberless islands of the archipelagoes of the sea !

And you of centuries hence when you listen to me !

And you each and everywhere whom I specify not, but include just the same !

Health to you ! goodwill to you all, from me and America sent !

ইংলণ্ডের কবিতার সহিত মার্কিন কবিতার এরূপ প্রভেদ থাকিবার একটী বিশেষ কারণ আছে। ইংলণ্ডের কবিতা স্থিতিশীল হইয়া গতিশীল। মার্কিন কবিতা গতিশীল হইয়া স্থিতিশীল। ইংলণ্ডের কবি পুরাতন হইতে নূতন হইতে চাহেন ; মার্কিন কবি নূতন হইতে পুরাতন হইতে চাহেন। ইংলণ্ডের কবি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার নূতন পত্তন করিতে সপ্রয়াস ; মার্কিন কবি চতুর্দ্দিকেই স্বাধীনতার তীব্র স্রোত প্রবাহিত দেখিয়া, পাছে সেই স্রোতে কেহ বিপথে গিয়া পড়ে, এই ভয়ে সেই স্বাধীনতাকে

সুনিয়ম, প্রেম, শান্তি প্রভৃতির সুদৃঢ় বন্ধনে সীমাবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। ইংলণ্ডের কবিতা ভাঙ্গনের দিকে, এই জন্য তাহা সময়ে সময়ে সাধারণ হইতে ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে; মার্কিন কবিতা গড়নের দিকে, এই জন্য তাহা ব্যক্তিকে ছাড়িয়া প্রায়ই সাধারণে গিয়া পড়ে। এই সকল কারণে আমরা যেলি প্রভৃতি ইংরাজ কবিদিগের মুখে সর্ব্বদাই যেন কি এক অতৃপ্তির গাথা শুনিতে পাই; কিন্তু হুইটম্যানপ্রমুখ মার্কিন কবিদিগের মুখে অতৃপ্তির পরিবর্ত্তে এক অগাধ তৃপ্তি, এক অগাধ শান্তির কথা শুনিতে পাই। এই তৃপ্তি তৃপ্তিময় অতৃপ্তি; এই শান্তি শান্তিসমুদ্রের অশান্তি। পুরাকালে এক ঋষি যেন কোন্ পর্ব্বতের শিখর হইতে উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এই আহ্বানসঙ্গীতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে "সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় পুরুষকে" লাভ করাতে এক অগাধ তৃপ্তি, অগাধ শান্তির ভাব আছে, কিন্তু তথাপি ঋষির আশাস্থল পূর্ণ রূপে হস্তগত না হওয়াতে, ইহাতেও—এই তৃপ্তি, এই শান্তির মধ্যেও এক অতৃপ্তির ভাব বিরাজমান। মার্কিন কবিদিগের এবং বিশেষত হুইটম্যানের কবিতায় ঠিক এই ভাবটী ব্যক্ত আছে। বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক থোরো (Thoreau) হুইটম্যানকে যে প্রাচ্য ঋষি কবিদিগের সহিত একাসনে স্থান দিয়াছেন, তাহা অন্তত কতকাংশে উপযুক্ত।

এতক্ষণ যে মার্কিন ভাবের কথা বলিয়া আসিলাম, তাহার পূর্ব্বাভাস আরও দুইটী মার্কিন কবির কবিতায় দেখিতে পাই—

সেই দুই কবি লংফেলো এবং পোয়ে। এই দুই কবিতে যাহা দেখি, তাহা বাস্তবিকই হুইটম্যানের পূর্ব্বাভাস মাত্র। লংফেলো তাঁহার "এবাঞ্জেলাইন" কাব্যে সেই বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের মুখে যে শান্তিবাচন করাইয়াছিলেন, তিনি অস্ত্রাগারের মধ্যেও যে গভীর শান্তিবাক্য শুনিতে পাইয়াছিলেন, হুইটম্যানে যেন সেই শান্তিভাব প্রগাঢ়তা ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

লংফেলো তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "জীবন সঙ্গীতে"(Psalm of Life) ঘোষণা করিলেন যে জীবন একটা বাস্তবিক কিছু, কেবলি মায়া নহে—জয়পরাজয় সহিত জীবন একটা বাস্তব পদার্থ। এদিকে পোয়ে তাঁহার কবিতাগুলির সূচনায় বলিলেন যে মানসিক প্রবৃত্তি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। হুইটম্যানকে আর ঐ দুইটী ভাব প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি ধরিয়াই লইলেন যে এই দুইটী একপ্রকার প্রত্যক্ষ সত্য; তবে সে বিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন কি? তাই তিনি একেবারেই বলিয়া উঠিলেন যে তিনি গান গাহিবেন—

Of life immense in passion, pulse and power,

Cheerful for freest actions form'd under the laws divine,

The modern man I sing.

বর্ত্তমান মানবের জীবন, তাহার বৃত্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা সকলই।

লংফেলোর মার্কিনত্ব হুইটম্যানের হাতে আরও কিরূপ অধিকতর উদারতা লাভ করিয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের উভয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যসম্মিলন সম্বন্ধে উক্তি দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইতে পারিবে।

লংফেলো বলিলেন—

Thou too, sail on, o ship of State !
Sail on, O Union, strong and great !
Humanity with all its fears,
With all the hopes of future years,
Is hanging breathless on thy fate !

* * * *

In spite of rock and tempests' roar,
In spite of false lights on the shore,
Sail on, nor fear to breast the sea !
Our hearts, our hopes, are all with thee.
Our hearts, our hopes, our prayers, our tears,
Our taith triumphant o'er our tears,
Are all with thee,—are all with thee !

যদিও লংফেলোর "ইউনিয়ন" (যুক্তরাজ্যের সম্মিলনী পতাকা) অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রের উপর ঘোর বিশ্বাস, কিন্তু তবু কোথায় যেন তাহার ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাস লুকাইয়া আছে। সাধারণতন্ত্রের উপর যেমন তাঁহার আশা আছে, তেমনি তাহার বিপদের ভয়ও তাঁহার মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই বিষয়ের লেখা পড়িয়া দেখ। কেবলই আশা, ভয়ের লেশমাত্রও নাই। কঠিন কাষ্ঠখণ্ডে কুঠার লাগিলে যেরূপ তীব্র ধ্বনি নির্গত হয়, এই কবিতারও প্রত্যেক শব্দ সেইরূপ তীব্রতা সহকারে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মুদ্রিত হইয়া যায়। এত আশাপ্রদ বাণী যেন কখনও শুনি নাই—

All thine O sacred Union !

Ships, farms, shops, barns, factories, mines,

City and State, North, South, item and aggregate,

We dedicate, dread mother, all to thee !

Protector absolute, thou ! bulwark of all !

For well we know that while thou givest each and all, (generous as God)

Without thee neither all nor each, nor land, home,

Nor ship, nor mine, nor any here this day secure,

Nor aught, nor any day secure—

While we rehearse our measureless wealth, it is for thee, dear mother,

We own it all and several today indissoluble in thee ;

* * * *

Our farms, inventions, crops, we owe in thee ! cities and states in thee !

Our freedom all in thee ! our very lives in thee !

এইবারে দেখা যাউক, হুইটম্যানের কাংকেলো প্রভৃতি হইতে নূতনত্ব—হুইটম্যানত্ব কোথায়। পূর্ব্বতন কবিগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ পুরুষভক্ত,

অপরভাগ স্ত্রীভক্ত। মিল্টন কাব্য লিখিলেন প্রায় সমস্তই পুরুষ লইয়া; বায়রণ প্রভৃতি কাব্য লিখিলেন প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোক লইয়া। যাঁহারা পুরুষভক্ত, তাঁহারা স্ত্রীলোককে নিন্দা করিয়া পুরুষের সম্মান বাড়াইবার প্রয়াস পাইলেন; যাঁহারা স্ত্রীভক্ত, তাঁহারা স্ত্রীলোকের গুণগান করিতে পুরুষদিগকে দৃষ্টির বাহির করিতে লাগিলেন। আর এই দুই দলেরই একটা মনের ভাব এই যে, নায়ক বা নায়িকাকে একটা আকাশকুসুমের মত 'ধরি-কি-না-ধরি গোছের একটা আকার দিতে না পারিলে, সে নায়ক নায়কই নহে এবং সে নায়িকা নায়িকা নহে। লংফেলো ও মহাজনগত পথ অবলম্বন করিয়া একটা দলের, দ্বিতীয় দলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার "এবাঞ্জেলাইন" কাব্যে নায়িকারই গুণগান করিয়া যাইতেছেন; অবশ্য দু এক স্থলে নায়কের উল্লেখ আছে। কিন্তু হুইটম্যান সেই পুরাতন দলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলেরই বিষয় সমানরূপে গান গাহিবেন। তিনি বলিলেন—

"The Female equally with the Male I sing,"

তিনি বলিলেন—

"I am the poet of the woman the same as the man,

And I say it is as great to be a woman as to be a man." *

ধন্য আমেরিকা, তুমি ধন্য যে এই স্বাধীনচেতা উদার পুরুষকে তুমি আপনার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পার। কি সুন্দর,

কি হৃদয়স্পর্শী উক্তি! হুইটম্যানের হৃদয় এমনি প্রশস্ত যে তাহা কেবল স্ত্রীলোক বা কেবল পুরুষের দ্বারা পূর্ণ হয় না। তিনি উভয়কেই স্বীয় হৃদয় দিয়া দেখিয়া উভয় হইতেই গভীর কবিতা বাহির করিয়া লইবেন। ইহাই ত এক নূতন কলম্বসের নূতন আমেরিকা আবিষ্কার! সাধারণতন্ত্রের মর্ম্ম যেন ঐ কয়টী পংক্তিতে পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ওয়াল্ট হুইটম্যানের হৃদয় যেন উদ্ভিন্ন হইয়া আমাদের নয়নের সম্মুখে ধৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,কেবল স্ত্রীপুরুষের রূপ নহে, কিম্বা তাহাদিগের সাঁঝের বেলায় ছুটো চুপিচুপি প্রণয়ের কথা নহে,কিন্তু সমগ্র মানবের প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রত্যেক ভাব,প্রত্যেক বৃত্তি, এই সমুদয়ই সাধারণতন্ত্রের এই দুর্জ্জয় প্রেমিক কবির কবিতার উৎস। প্রকৃতই তাঁহার কবিতার এই মহান সার্ব্বভৌমিকত্বই অন্যান্য কবিদিগের কবিতা হইতে বিভিন্নতার এক প্রধান নিদান। তিনি এই বিষয়ে "তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গীতে" স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন' তাহারই কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Housebuilding, measurinig, sawing the boards,
Blacksmithing, glass-blowing, nail-making,
coopering, tin-roofing, shingle-dressing,

* * * *

Iron-works, forge-fires in the mountains or by river-banks, men around feeling the melt with huge crowbars, lumps of ore, the due combining of ore, limestone, coal.

* * * *

In them realities for you and me, in them poems for you and me.

বাস্তবিক, নব্যমানবের বোধ হয় এমন কিছুই নাই, যাহাতে হুইটম্যান স্বীয় লেখনীর অপূর্ব্ব মন্ত্রস্পর্শে অপূর্ব্ব বেশ না দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের নবনীত-কোমল তনু, পুরুষের বজ্রদৃঢ় শরীর, রাজ্য, বিবাহ, স্নান, পলাতক, ক্রীতদাস, কষাই, ঐতিহাসিক, নাবিক, কলের কারখানা, ষ্টীমার, জাহাজ, আর কত বলিব, সকলই এই প্রেমিক কবির নিকট আসিয়া প্রেমের নব নব বেশ পরিয়া গিয়াছে।

আর একটী কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া জগতের গান গাহিবেন। এই আমিত্ব-জ্ঞান এবং কবিতায় তাহার ব্যাপ্তি, হুইটম্যানের বিশেষত্ব। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যদিও তাঁহার কবিতায় এই আমিত্ব-ভাবের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু হুইটম্যানের কবিতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে কবিতার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যহ্রাস হয় নাই; বরঞ্চ বলিতে গেলে, এই আমিত্বভাবই হুইটম্যানের কবিতার এক বিশেষ সৌন্দর্য্য। তিনি যদিও সকল কবিতায় "আমি" শব্দ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কবিতা, এমন কি প্রতি ছত্র যেন আমিত্বে পরিপূর্ণ। এই আমিত্ব বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার কোন কবিতায় লেশমাত্র বিনয়ের অভাব দেখা যায় না। তিনি একটী গানে বলিতেছেন "I celebrate myself, and sing myself." আমি আপনার বিষয়ই গান গাহিব। কেবলমাত্র এই লাইনটী দেখিলে কবিকে অত্যন্ত অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার পরে যখন দেখি যে তিনি বলিতেছেন—

"And what I assume you shall assume,

For every atom belonging to me as good belongs to you."

এবং—

"Walt Whitman

* * no stander above men and women or apart from them."

তখন তাঁহাকে অহঙ্কারী বলা দূরে থাক্, তাঁহাকে নিতান্ত বিনয়ী, অত্যন্ত মহদাশয় না বলিয়া থাকিতে পারি না। তখন বুঝিতে পারি যে, তিনি আত্মপ্রশংসার ছলে সাধারণতন্ত্রের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যে কোনও বিষয় বলিয়া যাইতে-ছেন, সকলেতেই যেন আমিত্ব-সূর্য্য হইতে কিরণজাল মুক্ত হইয়া আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করি, "তুমি কি?" তখন যেন উত্তর পাই যে "আমি কেহই নহি; সাধারণ প্রজা, সাধারণতন্ত্রই সব; আমিই সাধারণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্রই আমি।" কবিতা দেখিলেই বোধ হয় যে কবি সাধারণ প্রজা-দিগেরই একজন, অথচ যেন সকল প্রজা হইতে ভিন্ন। এইরূপ কি এক গর্ব্বিত বিনয়ে সমস্ত পুস্তকটীকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। এই আমিত্ব থাকাতেই প্রত্যেক কবিতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বল-সঞ্চার হইয়াছে। কবি তাঁহার কবিতার নাম দিয়াছেন "তৃণপত্র" (Leaves of Grass) কিন্তু এই চিরনবীন দুর্ব্বাদলশ্যাম "তৃণ পত্রের" এরূপ সঞ্জীবনী শক্তি আছে যে, ইহা দেখিবামাত্র এমন আলস্যপরতন্ত্র মুমূর্ষুপ্রায় বঙ্গবাসীরও দেহ হইতে তেজ নির্গত হইতে থাকে।

আমি হুইটম্যানের "Leaves of Grass" এর সমালোচনা

করিতে গিয়া প্রথম হইতে ধরিয়া লইয়াছি যে ইহা একখানি কবিতাপুস্তক। কেহ কেহ অবশ্য ইহাকে কবিতাপুস্তক বলেন, আবার কেহ কেহ হুইটম্যানের রচনার কবিতাত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা হুইটম্যানের কবিতাকে কবিতা নহে বলেন, জানি না, তাঁহারা কবিতা কাহাকে বলেন। কবিতার দুইটী প্রধান অঙ্গ—ভাব ও ছন্দ। যে সকল রচনা ছন্দোবদ্ধ হইয়া আমাদিগের মনে সরসভাব উপস্থিত করে, আমরা সেই গুলিকেই কবিতা বলি। এই সরসভাব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা বিষয়েও হইতে পারে, কিম্বা একটা অদৃশ্য অনন্ত কোন বিষয়েও হইতে পারে। তবে ইহাদিগের মধ্যে যে কবি যতটা আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ, যে কবি যতটা আমাদিগের অন্তরে অনন্তের ভাব আনয়ন করিতে সমর্থ, আমরা সেই কবিরই অধিকতর কবিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিব। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ওয়াল্ট হুইটম্যানকেও বোধ হয় আমরা শেষোক্ত প্রকারের কবিদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আসন দিতে কুণ্ঠিত হইব না। তিনি যখন স্বাধীনতার মূর্ত্তিমান ছবি নয়নের সম্মুখে আনিয়া, স্বাধীনতার, উদারতার, বিশ্বপ্রেমের অনন্ত সৌন্দর্য্যে আমাদিগকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন কেন না তাঁহাকে উক্ত শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিব ?

কেহ কেহ বলেন যে এই সকল কবিতার ছন্দ নাই। আশ্চর্য্য ! ইহাতে আবার ছন্দ নাই ? অবশ্য স্বীকার করি যে তাঁহাদিগের মনে ছন্দের বিষয়ে যেরূপ ধারণা, সেরূপ ছন্দ ইহাতে নাই। ইহাতে কৃত্রিম চাঁচাছোলা অমিত্রাক্ষরের গোণাগুন্তি শব্দবিভাগ

নাই ; ইহাতে মেলির বেমিল ছন্দের মিলও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে ছন্দ নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। হুইট-ম্যানের প্রত্যেক কবিতায় নদীর স্রোতের ন্যায় ছন্দের স্রোত অবিশ্রামে বহিয়া যাইতেছে। যেমন সময়ে সময়ে নদীতে আমরা তুফানও দেখিতে পাই, আবার ছোট ছোট লহরীও দেখিতে পাই, সেইরূপ হুইটম্যানের কবিতায়, একই ছন্দ প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের জন্য বীরচ্ছন্দে আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধভেরী বাজাইতে থাকে, সৈন্যগণকে উন্মত্ত করিয়া তোলে ; আবার সেই ছন্দ প্রেমিক যুগলের নিকটে মৃদু মৃদু অস্ফুট ভাষার ছন্দে উপস্থিত হইয়া যেন তাহাদিগকে একসূত্রে সম্বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে কি ছন্দ, কি ভাব, সকল বিষয়েই হুইটম্যান একজন প্রকৃত কবি, প্রেমিক কবি, সাধারণতন্ত্রের উপযুক্ত।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ওয়াল্ট হুইটম্যান বিষয়ক অষ্টম
আলাপ সমাপ্ত।

—ঃ০ঃ—

নবম আলাপ—চিঠি।*

কাহাকে ভালবাস?—চিঠিকে জিজ্ঞাসা কর। একটী সামান্য চিঠিতে কত ভালবাসা, কত প্রাণের কথা! অন্যান্য সমস্ত চিঠির কথা ছাড়িয়া দাও—যাহাকে তুমি ভালবাস, সে যখন লেখে "তোমারই প্রাণের" ইত্যাদি, তখন সেই চিঠির আয়নার ভিতর দিয়া তোমার হৃদয়ের বন্ধুর ছবি একেবারে কি স্পষ্ট দেখিতে পাও না? তুমি অনেক দিন প্রবাসে আছ—না? ঐ দেখ একটু চেষ্টা করিয়া দেখ—চিঠিতে তোমার ভগিনীর মুখ দেখিতে পাইবে; তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া অনবরত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। কত কালের স্মৃতিপুষ্পগুলি চিঠিতে তোমার ভগিনী কত রকমে সাজাইয়া রাখিয়াছেন—একবার দেখিতে পাইতেছ কি? বাড়ী যাইও না, কিন্তু এই প্রকারে চিঠির দ্বারা ভালবাসার আদান প্রদান কর। বাড়ী গেলেই চিঠি উঠিয়া গেল—কিন্তু তাহা যেন না হয়। ফুলকে একেবারে বৃন্তচ্যুত করিও না, কিন্তু অশ্রুজল দিয়া ফুল আরও বেশী ফুটাইয়া তুলিও।

চিঠি হৃদয়ের স্বতউত্থিত গান। যেই তুমি চিঠি পড়ো, তখনি পুরাতন স্মৃতিগুলি হৃদয়ে প্রবেশ করে—হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ইহা যদি গান নহে, তবে পৃথিবীতে আর কাহাকে গান বলিব?

কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে যাহার হৃদয়ে সঙ্গীত নাই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না—যাহার হৃদয় হইতে মৃদুমধুর বীণা-

* ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রচিত।

ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইয়া না আইসে, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিবে না। জগতে এমন কর্ম্মই নাই, তাহা যতই কেন নিষ্ঠুর প্রকারের হউক না, যাহাতে সে ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস না করে। উঃ সে হৃদয় কি ভয়ঙ্কর!

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
চিঠি বিষয়ক নবম আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

দশম আলাপ—ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ। *

স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ!

সংবৎসর ধরিয়া তোমরা পাঠে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলে এবং তাহার ফলে আজ তোমরা পারিতোষিক লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছ। আমা অপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর অনেক ব্যক্তি থাকিতেও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেন যে আজ আমাকে এই পারিতোষিক-বিতরণ কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা আমাকে এই কার্য্যে আহ্বান করিয়া আমার যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতেছি, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞও রহিলাম। কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে public man বলে, আমার তাহা হইবার একটুকুও আকাঙ্ক্ষা নাই। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে আমি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" অর্থাৎ ফলদাতা ভগবানের হস্তে ফলভার ন্যস্ত করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, এবং কোলাহলপূর্ণ নাগরিক জীবন (public life) হইতে ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করিবার চেষ্টায় আছি। তাহা হইলেও এই কার্য্যে আহূত হইয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আনন্দের কথা অধিক আর কি বলিব—আমার মনে হইতেছে যে, পারিতোষিক-

---

* সাকিখা মনোহর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিবৃত।

বিতরণের পরিবর্ত্তে আমি নিজেই যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক গ্রহণের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি—বাল্যকালের সেই পাঠাভ্যাসে উদ্যম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আনন্দ আজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।

সাধারণ প্রথানুসারে যিনি পারিতোষিক বিতরণ করেন, তাঁহাকে ছাত্রদিগের প্রতি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিতে হয়। সেই প্রথা একেবারে ভঙ্গ করিতে গেলে আমার পক্ষে অসমসাহসিকের কার্য্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা যদি আমার নিকটে একটী সুদীর্ঘ অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা শুনিবার আশা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদিগকে অত্যন্ত নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিতে হইবে। তোমাদিগকে কেবল একটী কথা বলিব স্থির করিয়া আমি আজ এখানে আসিয়াছি। তাহা এই—যে কোন কর্ম্ম কর, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিবে এবং কর্ম্মফল তাঁহাতেই সমর্পণ করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাধারণতঃ মানবের যে পরমায়ু হয়, তাহার অর্দ্ধেকের উপর বোধ হয় আমি অতিক্রম করিয়াছি এবং সেই কারণে আজ এখানে আহূত হইয়া আমার জীবনার্দ্ধের অভিজ্ঞতার ফল তোমাদিগকে বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার রাখি। সেই অভিজ্ঞতার ফল এই যে, ফলদাতা ঈশ্বরের চরণে সমুদয় কর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকেই স্মরণ পূর্ব্বক সকল শুভকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে তোমরা যে দুই একখানি পুস্তক পাঠ কর, তাহা এই বিশ্বপুস্তকের দুএকটী অক্ষরও হইবে কি না সন্দেহ। বিশ্বগ্রন্থ অধ্যয়নের পক্ষে তাহা প্রথম সোপান মাত্র। তোমরা ইহা

মনে স্থির জেনো যে, পরে তোমাদিগকে বিশ্বগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেই হইবে। তোমরা যদি এই সময় অবধি সে দিকে লক্ষ্য স্থির না কর, তাহা হইলে পরে তোমাদিগকে অনেক কষ্ট পাইয়া সেই দিকে ফিরিতে হইবে। একই মহান্ পুরুষের ইঙ্গিতে এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র, গ্রহতারকাপরিবেষ্টিত জগতচরাচর পরিভ্রমণ করিতেছে এবং সেই একই মহান্ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এক নিমেষও চলিতে পারে না। তোমাদিগকে বিশ্বগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে সেই জগতের নিয়ম সকল জানিয়া ও মানিয়া চলিতেই হইবে এবং সেই সকল নিয়মের নিয়ন্তাকে সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে রাখিবার অভ্যাস করিতে হইবে। যদি না কর, তবে উত্তরকালে দুঃখশোকের তাড়নায়, বিপদ আপদের কশাঘাতে তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। তোমাদের কর্ত্তব্য যে, এখন অবধি তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিয়া, তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া প্রত্যেক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, পাঠে মনোনিবেশ কর, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হও। এই উপদেশ অনুসরণ করিলে দেখিবে যে, তোমাদের সকল কার্য্যই সহজ হইবে—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তো কিছুই নহে—এবং কোন প্রকার বিপদ আপদই আর তোমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না।

যেমন তোমাদিগকে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে মনে রাখিতে হইবে, সেইরূপ আরও একটী কার্য্য করিতে হইবে—তাহা ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ঈশ্বরকে মনে রাখা এবং ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এই দুইটী পরস্পরসম্বদ্ধ। একটী অপরটীর সহায়। ঈশ্বরকে মনে রাখ, ব্রহ্মচর্য্য সহজ হইবে; ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, ঈশ্বরস্মরণ সহজ হইবে। ইহা সকলেই জানে যে ব্রহ্মচর্য্যের

অভাবই ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল কারণ। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে শরীরে বল আসে, হৃদয়ে তেজ হয় এবং আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায়। ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা আমি এক মুখে শেষ করিতে পারি না, আমাদের ঋষিমুনিরাও শেষ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই ভারতবাসীরা দাসত্বশৃঙ্খল সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিতে একটুকুও দ্বিধা করে না। উদরপূর্ত্তির সংস্থান নাই, বিবাহ করিতে হইবে; ফলে কতকগুলি বিবাহিত দম্পতী কতকগুলি দুর্ভাগ্য বালকবালিকার জন্মদান করিয়া দাসত্ব গ্রহণে উন্মুখ হয়। ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা থাকিলে দাসত্বশৃঙ্খল কণ্ঠে ধরিতে ঘৃণা আসিবে। ব্রহ্মচর্য্যের যে কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তাহা যিনি এই বিষয়ে একপদও অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেকালে ঋষিদের ইচ্ছানত নানাকার্য্য করিবার কথা পড়া ও শোনা যায়। তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে। ব্রহ্মচর্য্যের বলে সেরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে।

ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে অশ্লীল আমোদ প্রমোদ, অশ্লীল পুস্তক পাঠ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গের উপযোগী উপন্যাস নাটক প্রভৃতি পাঠ, রাত্রিজাগরণ করিয়া অভিনয় যাত্রা প্রভৃতি দর্শন শ্রবণ ত্যাগ করিতে হইবে। বৃথা লোকসঙ্গ, তাসপাশা প্রভৃতি বৃথা আমোদে কালহরণ, অযথা হাস্যপরিহাস, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা আচরণ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দর্শন, ইতিহাস, মহৎ লোকের জীবনী, এই সকল বিষয় পাঠ্যাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠার বড়ই সহায়তা করে।

আমি তোমাদিগকে বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আমার উপদেশমত কার্য্য একদিন অবলম্বনে যে ক্ষমতা লাভ করিবে,

অন্ততঃ সেই ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় দশদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে প্রবৃত্তি জন্মিবে; দশদিন করিলে দশমাস এবং দশমাস করিলে দশ বৎসর তাহা করিতে ইচ্ছা হইবে। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা দূর করিবার জন্য এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য আজ পর্য্যন্ত যত চীৎকার হইয়াছে ও হইতেছে, এক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে সে চীৎকারের কোনই প্রয়োজন থাকিবে না; কুপ্রথা সকল সহজে দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সুপ্রথার সু-আচারের সুগন্ধ বায়ু অতি সহজে প্রবাহিত হইবে।

পাঠ্যাবস্থায় বৃথা গোলযোগে যোগদান করিয়া বহুমূল্য সময় কাটাইও না। আমরা বুঝিতেছি এবং আমাদের কথা গ্রহণ কর যে বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে যে জ্ঞানবিজ্ঞান সহজে আয়ত্ত করা যায়, জীবনের শেষভাগে শত চেষ্টাতেও তাহা পারা যায় না। জীবনের যে সময়ের যে কাজ, সেই সময়ে সেই কাজ করিতে হইবে। উপন্যাস প্রভৃতি যদি পড়িতে ইচ্ছা হয়, তবে যে সময়ে অন্য কাজ করিবার অক্ষমতা জন্মিবে, সেই সময়ে উপন্যাস পড়িও। বিশ্বজগতের অভিনয় যদি বুঝিবার চেষ্টা কর, তবে থিয়েটারে যাইয়া অভিনয় দেখিবার প্রয়োজন হইবে না। পাঠ্যাবস্থায় একমনে পাঠাভ্যাসে মন দিবে। চক্ষু খুলিয়া বিশ্ব-জগতে বিচরণ করিবে, কিন্তু নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। বিলা-সিতাকে পদদলিত করিয়া দিবে। দুইটী বিষয় সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিয়া রাখিবে, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা এবং ঈশ্বরের চরণে কর্ম্মসমর্পণ। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে নিজের ক্ষমতায় হইল বলিয়া গর্ব্বিত হইও না। ইচ্ছা হয়তো একবার এই উপদেশমত কার্য্য করিয়া দেখ যে ইহাতে তোমাদের ভাল হয় অথবা মন্দ হয়।

পরিশেষে এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি যে তাঁহাদেরই কল্যাণে আজ আমার পাঠাভ্যাসের কথা প্রভৃতি বাল্যস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারাই আজ তোমাদের নিকটে আমার প্রিয়তম ঈশ্বরের কথা ও ব্রহ্মচর্য্যমহিমা শুনাইবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। সেই ভগবান তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করুন, এই প্রার্থনা। সেই পরমেশ্বরই একমাত্র শান্তির আলয়, আরামের স্থল; তিনিই আমাদের পিপাসার জল, ক্ষুধার শান্তি; তিনিই আমাদের পূর্ণ শান্তি-নিকেতন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ছাত্রদিগের প্রতি অভিভাষণ বিষয়ক
দশম আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

দাদা।*

এ ধরায় যত ছিল তব কাজ
সকলি ফুরায়ে গেছে।
দেবদেব তাই লয়েছেন ডাকি
তোমারে আপন কাছে॥

গেছ তুমি চলি অনায়াসে ছাড়ি
সংসারের ধূলি যত।
দেবগণ সাথে অতুল আনন্দে
করিছ সঙ্গীত কত॥

আমরা হেথায় পড়ে আছি পিছে
সংশয় হতাশা মাঝে।
ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট দুখ
হৃদয় পূরিয়া আছে॥

ভব করাগারে বদ্ধ আছি মোরা
মায়ার নিগড় ডোরে।
শ্রম কষ্ট তাই প্রতি কাজে পাই
ভগন হৃদয় ভোরে॥

---

*১৯০৮ খৃঃ অঃ ৪ঠা মে সন্ধ্যাকালে ৪১ বৎসর বয়সে মদীয় জ্যেষ্ঠ ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে লোকান্তরিত হয়েন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেরই প্রিয়পাত্র এবং কবি এবং চিত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমাদের পিতৃদেবের পরলোকগমনের পর তিনি ভাই বোনদিগের শিক্ষায়, বিশেষত ধর্ম্মের উন্নতিসাধনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন।

তুমি দেবলোকে বিচরিছ সুখে
ত্যজিয়া ক্রন্দন শোক।
তোমার আনন্দে নাহি কোন বাধা—
আনন্দনন্দন লোক॥

মুছায়ে দেছেন ভগবান তিনি
অশ্রু তব চিরতরে।
আনন্দসঙ্গীত শুনিতেছ সদা
বসি তাঁর পদতলে॥

সে গান পশে না আমাদের কাণে—
মরণে লইয়া খেলি।
কাহার না যায় দেখিবারে সাধ
সে আনন্দ কোলাকুলি॥

মুজঃফরনগর.
২৭শে এপ্রিল, ১৯১০।

—ঃওঃ—

দ্বাদশ আলাপ—লর্ড টেনিসন।*

লর্ড টেনিসন সম্প্রতি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে শান্তভাবে কাব্যজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন—ধীরে ধীরে শান্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। কাব্যজগতে যখন তাঁহার আবির্ভাব হয়, তখন আর সেই উন্মত্ত ফরাসিবিপ্লব ইউ-রোপকে কম্পিত করিতে থাকে নাই, কিন্তু ফরাসিবিপ্লবের সংঘর্ষণে আবিষ্কৃত নানাবিধ জ্ঞান-সত্য সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়া গিয়াছে; মারামারি কাটাকাটি চলিয়া গিয়া প্রেমের রাজত্ব এক পদ অগ্রসর হইয়াছে; জনসাধারণের হৃদয়ে দারুণ অশান্তির পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই সময়ে টেনিসনের আবির্ভাব। শুধু আবির্ভাব কেন—টেনিসনকে আমরা শান্তিময় খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শ কবি বলিয়া ধরিতে পারি। ষাট বৎসর পূর্ব্বে টেনিসন যখন তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে একবার সমালোচনার তীব্র বিষবাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার প্রত্যুত্তর কি দিলেন? সমালোচনার পরে দশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন কবিতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যদি বায়রণের ন্যায় সংগ্রামিক কবি হইতেন, তাহা হইলে দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস দূরে থাক, সমালোচনার উপযুক্ত তীব্র প্রত্যুত্তর না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

---

* ১৮১৪ শক কার্ত্তিক মাসে লিখিত।

বর্ত্তমান কালে সমালোচকদিগের বিষবাণ সকলকেই অনেক সময়ে বৃথা অস্থির করিয়া তুলে। অধিকাংশ সমালোচক আপনাদিগকে বড়লোক মনে করিয়া যাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাহাও অনেক সময়ে সমালোচনা করিতে বসেন। তাঁহারা সমালোচ্য বিষয়ের গুণগুলি বুঝিতে অক্ষম হইয়া দোষদর্শী হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই আপনাদিগকে মহা সমালোচক জ্ঞান করেন। কোন বিশেষ জ্ঞানতত্ত্ববিষয়ক বিচার উঠিলে প্রমাণাদির দ্বারা হাতেকলমে ধরাইয়া দেওয়া যায় যে কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কবিতার সমালোচনায় সে নিয়ম খাটে না। কবিতা ডাক্তারি ছুরি চালাইবার বিষয় নহে—ইহা হৃদয় দিয়া বুঝিবার বিষয়। অনেক সময়েই সমালোচকগণ ডাক্তারি ছুরি চালাইয়া কবিতা বুঝিতে গিয়া কবির হৃদয়ে বড়ই আঘাত প্রদান করেন।

যাই হউক, টেনিসন তাঁহার দশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর যখন পুনরায় স্বীয় নামে কবিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই এক নূতন কবির অভ্যুদয় দেখিয়া আনন্দিত হইল। গ্রীষ্মকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে কালবৈশাখী ঝড়ের পর পূর্ণচন্দ্র যেরূপ আনন্দ বিধান করে, সংগ্রামিক কবিদিগের পর টেনিসনের অভ্যুদয়ও জনসাধারণের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। লোকে সাংগ্রামিক কবিদিগের কবিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা বায়রণ সেলি প্রভৃতির দেশছাড়া ঘরছাড়া বহির্মুখী ভাবও চাহিত না, আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতির নিতান্ত অন্তর্নিহিত গভীর আত্মতত্ত্বও চাহিত না। তাহারা এমন এক কবির অভাব অনুভব করিতেছিল, যিনি

তাহাদিগকে ছুটো ঘরের সরল কথা শুনাইতে পারিবেন। তাঁহাকে গৃহস্থের নিকটে, সমস্ত জাতির সম্মুখে, ধর্ম্মের সরল ও কমনীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে হইবে; তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে একটী সামান্য কুটীরবাসীরও স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ স্ত্রীচরিত্রকে যেরূপ বাসনার দিক হইতে দেখিয়া মোটের উপর প্রায় একই ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ করিলে চলিবে না। শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীচরিত্র নানা দিক হইতে দেখিতে হইবে; একটী বালিকার চপলতাও যেমন চিত্রিত করিতে হইবে, একটী প্রৌঢ়ার গৃহস্থলী ভাবও তেমনি চিত্রিত করিতে হইবে। আবার একটী বুড়ী ঠাকুরমার আধো-শৈশবী ভাবও তেমনি ব্যক্ত করিতে হইবে। এই সমুদয় অভাব পূরণ করিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ কবি লর্ড টেনিসন।

ধর্ম্মের ভাব দেখাইতে হইবে বলিয়া যে তিনি তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল; তিনি তাঁহার কাব্যসমূহে ধর্ম্মভাব প্রবেশ না করাইয়া থাকিতে পারেন নাই। বোধ হয় তাঁহার এমন একটীও দীর্ঘ কবিতা নাই যাহার মধ্যে দুএকটা ধর্ম্মের কথা পাওয়া না যায়—এবং এই ধর্ম্মভাব থাকাতেই সেই কবিতাগুলি যথার্থই মিষ্ট হইয়াছে। টেনিসন তাঁহার "The Idylls of the King" নামক কাব্যে কেমন এক ধর্ম্মভাবের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন—তাই তাহা বড়ই মিষ্ট, শান্তরসাশ্রিত হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে কেমন শান্তি হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। গাইনভিয়ের রাজমহিষী হইয়া

রাজার এক পারিষদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু সেই অনুতাপ কি আত্মহত্যা প্রভৃতি উপন্যাসসুলভ উৎকট ব্যাপারে প্রকাশিত হইবে? তাহা নহে; রাজমহিষী পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন সন্ন্যাসিনী হইয়া এবং জগতের হিতসাধন করিয়া। বর্ত্তমান যুগের আদর্শ কবির এই ভাব দেখানই আবশ্যক বটে। The Idylls of the King কাব্যে কবি এক একটী চরিত্রকে আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহুপূর্ব্বে তিনি আর একটী ধর্ম্মভাবপরিপূর্ণ দীর্ঘ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু অর্থাৎ হ্যালামের মৃত্যু উপলক্ষে ইহা রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম "In Memoriam" দেওয়া হইয়াছে। The Idylls of the King কাব্যে কবি যেমন আদর্শ চরিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, In Memoriam সঙ্গীতে তিনি তাহা করেন নাই। এই সঙ্গীতে মৃত্যুর ভীষণ সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের মীমাংসার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সঙ্গীতটী কতকগুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। আমরা বলি যে পরমেশ্বর মঙ্গলময়, কিন্তু নানা কারণে সময়ে সময়ে কি তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে সন্দেহ হয় না? প্রিয়তম বন্ধু হ্যালামের মৃত্যুতে কবি টেনিসনেরও হৃদয়ে সেই সন্দেহ আসিয়াছিল। তাই কবি আপনি একটী উচ্ছ্বাসে সেই সন্দেহ কি সুন্দর ভাষায় অপনয়ন করিতেছেন—

Oh yet we trust that somehow good
Will be the final goal of ill,

To pangs of nature, sins of will,
Defects of doubt, and taints of blood;

That nothing walks with aimless feet;
That not one life shall be destroy'd,
Or cast as rubbish to the vow,
When God hath made the pile complete?

* * * *

Behold, we know not anything;
I can but trust that good shall fall
At last—far off—at last, to all,
And every winter change to spring.

So runs my dream; but what am I?
An infant crying in the night:
An infant crying for the light:
And with no language but a cry.

এই সঙ্গীতের মধ্যে কি আর্য্য ঋষিদিগের গভীর প্রশান্তভাব ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আভাস পাইতেছি না? আমাদের শাস্ত্রে আছে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন;" কবি টেনিসনের সঙ্গীতেও আমরা এই ভাবের কিছু আভাস পাইতেছি—

What fame is left for human deeds
In endless age? It rests with God.

পূর্ব্বোক্ত কাব্য ও সঙ্গীতে কবি কতকটা জগত হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া ধর্ম্মকে দেখিয়াছেন, কিন্তু "Enoch Arden" এ ধর্ম্মকে জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। একজন মানুষ —ক্ষুদ্র মানুষ যে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারে এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া যে আত্মবলি দিতে পারে, তাহাই এই Enoch Arden কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আরও একটু দেখান হইয়াছে যে এক সামান্য কুটীরবাসীরও আত্মবলি অবহেলার সামগ্রী নহে—প্রত্যুত পূজার সামগ্রী।

এই কাব্যের গল্পটী অতি সামান্য। দুইটী বালক ও একটী বালিকা (ফিলিপ, ঈনক ও আ্যানি) প্রতিদিন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে যাইত। ক্রমে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় বালকেরই ইচ্ছা হইল যে অ্যানিকে বিবাহ করে। তন্মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঈনক অ্যানির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং অ্যানির সম্মতিক্রমে তাহাদের বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। সাত বৎসর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। এই সাত বৎসরে ঈনকের কয়েকটী পুত্রকন্যাও হইল। অবশেষে ঈনক বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেল, কিন্তু দৈবক্রমে স্বদেশে ফিরিবার সময় জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন হওয়াতে ঈনক অপর দুইটী সঙ্গীর সহিত এক ভেলার দ্বারা কোন অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইল। দুইটী সঙ্গীও নানা কারণে প্রাণ হারাইল—ঈনক সেই দ্বীপে একা পড়িয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। ফিলিপ অ্যানিকে বুঝাইতে লাগিল যে যখন তাহার স্বামী নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে (কারণ তাহা না হইলে কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যাইত) তখন অ্যানি ফিলিপকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে এবং বিবাহ না করিলে তাহার ছেলে মেয়েরা বড়ই

কষ্টে পড়িবে। ফিলিপ অ্যানিকে বিবাহ না করিয়া বারম্বার সাহায্য করিলে অ্যানির মিথ্যা দুর্ণাম রটিতে পারে। অ্যানি ঈনকের প্রত্যাগমনে নিরাশ হইয়া এবং ফিলিপের কথা যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিয়া ফিলিপকে বিবাহ করিল। ফিলিপেরও কয়েকটী সন্তান হইল। ইত্যবসরে কোন জাহাজ ঈনকের দ্বীপে লাগাইয়াছিল এবং সেই জাহাজে ঈনক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ঈনককে কেহই চিনিতে পারিল না। ঈনক একেবারে গৃহে না গিয়া এক পান্থাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে ফিলিপের সহিত অ্যানির বিবাহ প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহপানে চলিল—আজ গোপনে দেখিবে যে তাহার অ্যানি কি করিতেছে। কিন্তু দেখিল যাহা—আর দেখিতে পারিল না—চলিয়া আসিল; অ্যানি ফিলিপের শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছে, পার্শ্বে ঈনকের পুত্রকন্যা সুখে খেলা করিতেছে। কিন্তু ঈনক, ফিলিপ ও অ্যানির সুখে কোন বিঘ্ন আনয়ন না করিয়া ধীরে ধীরে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

গল্পটী অতি সামান্য বটে, কিন্তু কি গভীর স্বার্থত্যাগ এই কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। ঈনক যখন ফিলিপ ও অ্যানির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া তাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন আনয়ন করিতে বিরত হইল, তখন তাহার মনের ভাব কি করুণ!

"Too hard to bear! why did they take me thence?
O God Almighty, blessed Saviour, Thou
That did'st uphold me on my lonely isle,
Uphold me, Father, in my loneliness

A little longer! and me, give me strength
Not to tell her, never to let her know.
Help me not to break in upon her peace.
My children too! must I not speak to these?
They know me not. I should betray myself.
Never: no father's kiss for me—"

ঈনক মৃত্যুকালে সেই পান্থাবাসের একটী স্ত্রীলোককে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল; তাহাতে স্ত্রীলোকটী অন্তত তাহার পুত্রকন্যাদিগকে একবার দেখিতে বলিল। ঈনক অল্পক্ষণ ইতস্তত করিয়া বলিল—

"Woman, disturb me not now at the last,
But let me hold my purpose till I die.
* * * I charge you now,
When you shall see her, tell her that I died
Blessing her, praying for her, loving her;
* * * *
And say to Phillip that I blest him too;
He never meant us anything but good."

ইহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক অক্ষর হইতে যেন অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে। এরূপ কোমলতা পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, টেনিসনের হৃদয় স্বভাবতই এরূপ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল যে, তিনি তাঁহার দীর্ঘ কবিতামাত্রেই অন্তত দুএকটা ধর্ম্মের কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ঈশ্বরের প্রতি

একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং প্রার্থনার মর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"Prayer from a living source within the will,
And beating up thro' all the bitter world,
Like fountains of sweet water in the sea,
Kept him a living soul."

"Or if you fear
Cast all your cares on God ; that anchor holds."

"More things are wrought by prayer
Than this world dreams of" * *

যাঁহারা টেনিসনের অঙ্কিত স্ত্রীচরিত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার The Grandmother প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে টেনিসনের কবিতা পড়িলেই মনে হয় যেন তিনি তাঁহার ঘরের এক নিভৃত কোনে চৌকী টানিয়া আনিয়া হৃদয়ের ভাবসমূহকে সংযত করিয়া লিখিতে বসিয়াছেন। বায়রণ, শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতির কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন যথার্থই তাঁহারা আমাদিগের নিকট হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতেছেন—যেন তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু টেনিসনের দুএকটী কবিতা ভিন্ন কোন কবিতাতেই যেন তাঁহার নিজের ছবি দেখিতে পাই না, যেন তাঁহার নিজের কোন কথা শুনিতে পাই না। তাঁহার কবিতা হইতে আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে এইরূপ করা কর্ত্তব্য, এই-রূপ করিলে জগতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে ইত্যাদি।

হিন্দুজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহাদের নাম খোদিত করিয়া দিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ বিধি সম্পূর্ণরূপে দেওয়া না যাউক, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে যদি স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের সম্মানার্থ অন্ততঃ বাৎসরিক সভারও অধিবেশন করিয়া তাঁহাদের গুণব্যাখ্যা করা যায়, তবে তাহার শুভফল অতি শীঘ্রই আমাদিগের দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে দেখা যাইতে পারে। আমরা যদি উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদাই চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগেরও উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী, একথা বলা বাহুল্য। এই কারণেই "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, এই দুই নরসিংহের ন্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় অতি অল্পই হইয়াছে। এই দুই জনই দুই অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া যেন ভারতের নূতন সংগঠিত ধর্ম্মের দুই দ্বার রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিলেই ব্রাহ্মসমাজেরই কথা যেমন সর্ব্বপ্রথমে আমাদের স্মরণপথে উদিত হয়, সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের কথা মনে আসে। আমরা এতদূর সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি, যে আমরা প্রায়ই মহৎ লোকদিগকে সাম্প্রদায়িক ভাবেই দেখিতে চেষ্টা করি এবং এই প্রকারে তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ের অতীত করিয়া সার্ব্বভৌমিকভাবে দেখিতে অনভ্যস্ত হইতেছি। আমাদিগের দেশে যে সকল ধর্ম্মসংস্কার সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় একটীও স্বীয় বিমলশোভন প্রথম সৌন্দর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হয় নাই—ধর্ম্মসংস্কারক-

দিগকে সাম্প্রদায়িক চক্ষে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতামাত্র-রূপে দেখিতে যাওয়াই তাহার এক প্রধান কারণ। যে সকল ধর্ম্মবীর সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত থাকিয়া জনসাধারণকে উপধর্ম্মের তীক্ষ্ণ কণ্টকরাশি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন এবং বিপথগামী ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের সরল পথের অভিমুখী করিবার চেষ্টা করেন, সেই বিপথগামী ব্যক্তিরাই তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ের নেতারূপে দৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের ও ভবিষ্যদ্বংশের বিশেষ অনিষ্টের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমার এই কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন আর রাজা রামমোহন ও স্বামী দয়ানন্দকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মাত্রের প্রবর্ত্তকরূপে না দেখি—আর বাস্তবিকও ইহঁাদিগের কেহই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নেতা হইবার জন্য ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহঁারা উভয়েই আপনাদের হৃদয়ের আকর্ষণে, ভগবানের প্রেরণায় এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের সরল পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ উদার চক্ষে দৃষ্টি করিয়া সেই রাজর্ষি রামমোহন রায় এবং পরম ব্রহ্মচারী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মনামের এই দুই সুযোগ্য প্রচারক-দিগকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় স্বামী দয়ানন্দও মূলতঃ ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন। ইতিহাসে বিধাতার এই মঙ্গলবিধান দেখা যায়, যে, যখন মানব স্বীয় অপূর্ণতাবশতঃ বিধাতার বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কাতরহৃদয়ে করুণা ভিক্ষা করে, তখনই তিনি স্বয়ং তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মঙ্গলালোকে সমস্ত হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া দেন। এই মঙ্গলবিধানের কার্য্য প্রতি মানবের জীবনে,

প্রত্যেক সমাজের জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে দেখা যায়—সমগ্র জগতের কুত্রাপি এই বিধানের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই বিধানবশেই হিন্দুজাতির এরূপ গভীর ধর্ম্মপ্রবণতা এবং এই বিধানেরই ফলে হিন্দুর প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব। সমগ্র জাতি যখন কাতর হইয়া সেই দেবদেবের চরণতলে দণ্ডায়মান হয়, তখনই ভগবানের প্রেরণায় এক ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহারই মঙ্গলকিরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন। ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণের কাতর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কাতর প্রাণের ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি এবং স্বামী দয়ানন্দের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের, বিশেষত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাতরতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচায়ক।

যে কালের, যে অবস্থার এবং যে স্থানের যাহা উপযোগী, করুণাময় ভগবান তখন তাহাই প্রেরণ করেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে আমরা এই সত্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। এক সময়ে এই ভারতে হিংসার ভীষণতা দেখিয়া দেখিয়া জনসাধারণের মনপ্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল; লোকে অহিংসাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছিল—দেশ, কাল, ব্যবস্থা সকলই উপযোগী হইয়া উঠিল, অমনি বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া অহিংসাধর্ম্মের বংশীধ্বনিতে সকলকে আকৃষ্ট করিলেন। আর এক সময়ে এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে বলিদান শবসাধন প্রভৃতি তান্ত্রিক আচার ব্যবহারের কঠোরতায় মানবহৃদয়

নির্ম্মম এবং সুতরাং নীরস অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন লোকেরা আর থাকিতে পারিল না—সমগ্র দেশ হরিপ্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল, অমনি তাহারই অভিব্যক্তিস্বরূপে চৈতন্য-দেব আবির্ভূত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের উন্মাদিনী শক্তিতে সমগ্র দেশ একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গেলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি শব্দে সেই হরিপ্রেম-ভিক্ষার প্রতিধ্বনি ও সেই সরল শ্রদ্ধার ছায়া আজও আমরা অনুভব করিতে পারি।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতের কার্য্যতঃ এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। এই সময়ে আবার দুর্ব্বল ভারতসন্তান নানা কারণে অজ্ঞানসাগরে ডুবিয়া, আপনার চিরসাধিত ধর্ম্মধন অবহেলা করিয়া, উপধর্ম্মের ছায়ায় ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরগুলি অবলম্বন করিয়া, দুর্লভ মানবজন্ম বৃথাই যাপন করিতে লাগিল। অন্যদিকে ঠিক সেই সময়ে এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। জন-সাধারণ অজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। সকলে কাতরকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিল—দেশ, কাল, অবস্থা অনুকূল হইয়া উঠিল, আর ভগবান রাজা রামমোহন রায়কে জনসাধারণের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। রামমোহন রায় কোথা হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অজ্ঞানের কুঠার ও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি উপনিষদুক্ত সেই "সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" ব্রহ্মধনকে পুন-র্লাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মনামের জয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা এবং কোথায় এই দীনহীন বঙ্গদেশ, সকলকে এক কোমল-

কঠোর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক অপূর্ব্ব মিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারই পথানুবর্ত্তী ব্রহ্মপরায়ণ ভক্ত সন্তানেরা এই ভারতের যেখানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ালোক অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র ব্রহ্মনামের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এইরূপে ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখি যে ভগবান যথা-সময়ে ও যথাস্থানে উপযোগী ব্যক্তি ও ঘটনা প্রেরণ করিয়া সকলকেই আপনার দিকে আহ্বান করেন। নদীসকল সুখে দুঃখে অপরাজিত চিত্তে ধাবিত হইয়া যেমন সাগরের কোলে বিশ্রামসুখ অনুভব করে সেইরূপ জগতবাসী সকলে সুখে দুঃখে তাঁহারই ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে এই উদ্দেশে তিনি সর্ব্বসময়েই যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে আমরা যেমন ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনায় ভগবানের মঙ্গলবিধান দেখিলাম, সেইরূপ বর্ত্তমান শতা-ব্দীর শেষভাগে স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের স্থাপনায়ও আমরা সেই সত্যেরই আর একটী প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। দুর্ব্বল ভারতবাসী যখন ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সত্যসকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না, জ্ঞানবিজ্ঞানের দুইচারিটী বাঁধা বুলি শিক্ষা করিয়া আত্মাভিমানে ও অহঙ্কারে স্ফীত হইতে লাগিলেন; আপনাদিগকে সকলের অতীত বোধ করিয়া আপনাদিগের কথাকেই অভ্রান্ত বেদবাক্য মনে করিয়া তদনুরূপ প্রচারও করিতে লাগিলেন; আপনারা একরূপ উপদেশ দিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিপরীতে চলিতে লাগিলেন; যখন তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া জনসমাজের শান্তি বিধ্বস্ত করিয়া

তুলিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মচারী স্বামী দয়ানন্দ ব্রহ্মনামের বিজয়-পতাকা নূতনস্থানে রোপিত করিয়া নূতনভাবে তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। একই হিমালয় হইতে জলরাশি আহরণ করিয়া যেমন সিন্ধু জাহ্নবী প্রভৃতি নদনদী সকল বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে সিক্ত রাখিয়াছে, সেইরূপ রাজা রামমোহন রায় এবং স্বামী দয়ানন্দ উভয়েই সেই অত্যুন্নত উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা আহরণ করিয়া বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন।

এই সূত্রে থিওসফিষ্টগণ আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা যেরূপ ব্রাহ্মসমাজকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য লোকের মন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল, সেইরূপ থিওসফিষ্টদিগেরও অভ্যুদয় আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুকূলতা করিয়াছিল। অধিকাংশ ব্রাহ্মই সেশ্বর পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আমাদের স্বদেশীয় যোগাচার্য্যদিগের সূক্ষ্ম যোগতত্ত্ব সকল আমলেই আনিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের একখানি মুখপত্র এই সমস্ত যোগতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এই অবনতির কালে কেমন এক বিকৃত স্বভাব দাঁড়াইয়াছে যে পাশ্চাত্যদিগের মুখ হইতে কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল তত্ত্বের পক্ষসমর্থন না দেখিলে আমরা সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না। যখন থিওসফিষ্টদিগের নেতা ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহোদয়গণ প্রাচ্য যোগতত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব তেজের সহিত সেই সকল সমর্থন

করিতে লাগিলেন,তখন ভারতের সকল স্থান হইতে লোকেরা দলে দলে থিওসফিষ্ট হইয়া যোগতত্ত্বের অনেক কথায়,কার্য্যে নাই হউক, অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন এবং ভারতের উত্তরপশ্চিমবাসীগণের অনেকে স্বামী দয়ানন্দে সেই সকল যোগতত্ত্বের সত্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া তাঁহারই জয়পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাই স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সহসা বিস্তৃত প্রতিষ্ঠালাভের ঐতিহাসিক রহস্য।

আর্য্যসমাজের বিস্তৃত প্রতিষ্ঠালাভের আর একটী কারণ তাহার ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা অধিকতর জাতীয়ভাবে ধর্ম্মপ্রচার। বাহির হইতে দেখিলে স্থূলদর্শী লোকদিগের চক্ষে সহসা বোধ হইবে যে দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ এবং রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্বদ্ধ। উভয়েরই মূলমন্ত্র এক। মনুষ্য জন্মগ্রহণমুহূর্ত্তে প্রথম নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যে ব্রহ্মনাম গ্রহণ করিয়া থাকে; বায়ুর প্রতি হিল্লোলে যে ব্রহ্মগাথা শুনিতে পাওয়া যায়; বাহিরের এই অনন্ত আকাশে বিধৃত অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রের নিয়মিত ভ্রমণে এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মার ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতায় যে ব্রহ্মের দুরনুমেয় মহত্ত্ব ও আনন্দের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই দেবাধিদেব মহাদেবেরই মহিমাপ্রচারের জন্য যেমন ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, তেমনি তাহারই জন্য আর্য্যসমাজেরও জন্ম। উভয়েই একই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আমি অবগত হইয়াছি যে আর্য্যসমাজ তাঁহাদের সভাধিবেশনে পাঠোপযোগী "আর্য্য" পুস্তক তালিকার মধ্যে

ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ এবং তদবলম্বিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" এই দুই পুস্তকই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এক সময় স্বামী দয়ানন্দ লাহোরে অবস্থিতিকালে কিরূপ উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবেন, এই বিষয় লইয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় একদিন তিনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া উপাসনাপদ্ধতি দৃষ্টি করিয়া তাহারই আদর্শ লইয়া আপনাদিগের উপযোগীভাবে উপাসনাপদ্ধতি সংগঠিত করিলেন—ইহা আমি আর্য্যসমাজের কোন বিশিষ্ট সভ্যের নিকট শুনিয়াছি। আবার আমরাও তাঁহার বেদভাষ্য প্রভৃতির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সাহায্য পাইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে উভয়ে কেমন ঘনিষ্টসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু উভয়ের প্রচারপ্রণালী কিছু ভিন্ন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রণালীকে আমরা জাতীয়তা অপেক্ষা যুক্তিবিচারের অধিকতর অনুকূল এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রণালীকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা জাতীয়তার অধিকতর অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করি। ইংরাজীতে বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রণালীকে more rational than national এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রণালীকে more national than rational বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যে জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিবিচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা স্বামী দয়ানন্দই যে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। তাঁহাদের উভয়েরই প্রচারপ্রণালী ঐ উভয় প্রকার ভাবের উপরেই সংগ্রথিত—তবে কেহ বা এক ভাবের প্রতি, কেহ বা অপর ভাবের প্রতি একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া-

ছেন, এইমাত্র দেখা যায়। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাঁহাদিগের এই বিভিন্ন ভাবপ্রবণতা বিভিন্ন দেশকাল ও অবস্থার উপযোগী হইয়াই আসিয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচার-প্রণালীর মূলমন্ত্র যুক্তিবিচার এবং সহায় আপ্তবাক্য, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারপ্রণালীর মূলমন্ত্র আপ্তবাক্য এবং সহায় যুক্তি-বিচার। রামমোহন রায় যুক্তিবিচারে প্রতিপন্ন করিলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই মানবের শ্রেষ্ঠতম অধিকার ও কর্ত্তব্য এবং তৎসঙ্গেই ইহাও দেখাইলেন যে, আমাদিগেরই শাস্ত্রে এতৎবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি একথা বলেন নাই যে, অন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মকথা থাকিলে তাহা গ্রহণ করিবে না; প্রত্যুত তাঁহার মতে সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মোপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যে কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে যুক্তিবিচারকেই প্রধান অস্ত্রস্বরূপে গ্রহণ না করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। বঙ্গদেশের আবহাওয়ার গুণ এমনি যে, এখানকার অধিবাসীমাত্রেই অল্লাধিক নৈয়ায়িক— মিথিলা হইতে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র আনীত হইয়া এমনি তেজের সহিত বৰ্দ্ধিত হইল যে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অন্য কোন বিভাগ বঙ্গদেশের এই গৌরব অপহরণ করিতে পারে নাই। এই আবহাওয়ার এমনি গুণ যে, অমন যে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব, তিনিও ইহারই গুণে কাশীতে বিচারকালে শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। এক কথায়, বঙ্গবাসী স্বভাবতই অল্লাধিক নৈয়ায়িক। ইহার উপর রাজা রামমোহন রায়ের কালে ইংরাজী শিক্ষার সূচনায় এবং খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের

সহায়তায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তর্কের প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার মিশনরিগণ কথায় কথায় শাস্ত্রের দোষ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যত হইলে তিনি যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই রামমোহন রায় যুক্তিবিচার অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বনে উপাসনাপদ্ধতি রচনা করিলেন। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়েও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে দেশকাল-পাত্রের বিভিন্নতা অনুসারে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে মূলত তাঁহারই প্রণালী রক্ষিত হইল। কেবল মধ্যে একবার ব্রাহ্মসমাজে যুক্তিবিচারের স্থানে বেদমূলক জাতীয় ভাবের প্রাধান্য স্থাপনের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিদিগের সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। তখন জাতীয়ভাবের সহায়তায় যুক্তিবিচারের ভিত্তিভূমির উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের নামেই জাতীয়তা অপেক্ষা যুক্তিমূলক সার্ব্বভৌমিকতা জলন্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে একদিকে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতার বিজয়ঘোষণা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে একটু অনিষ্টেরও সূচনা দৃষ্ট হইল। অনেক দুর্ব্বল মনুষ্য স্বাধীনতার নামমোহে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু ক্রমে বিকৃত স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিল। এই স্বেচ্ছাচারিতা যখন নিষ্ঠাবান পশ্চিমভারতের চক্ষে পতিত হইল, তখনই আর্য্যসমাজের আবির্ভাব, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে রামমোহন রায়ের

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি স্বাধীনতার ছায়ায় আনীত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য স্বপ্রতিষ্ঠিত সমাজকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা জাতীয়ভাবের উপরেই অধিকতর গঠিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেন। তিনি ব্যাকরণাদি অবলম্বনে ব্রহ্মানুবোধক নূতন বেদভাষ্য প্রণয়ন করিয়া স্বভাবত নিষ্ঠাবান পশ্চিমভারতবাসী এবং অবান্তরে সমগ্র ভারতবাসীকে বলিলেন যে বেদাদি শাস্ত্রে যখন একমাত্র ব্রহ্মপূজারই বিধি আছে, তখন আমাদের মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। নিষ্ঠাবান পশ্চিম ভারতের হিন্দুগণ বেদের নামে দলে দলে স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য হইতে লাগিলেন। পশ্চিমভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রাদির প্রতি যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দয়ানন্দের ন্যায় লোক না উঠিলে তথায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বিলক্ষণ অসুবিধা হইত। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে ব্রাহ্মসমাজ ভারতের পশ্চিম বিভাগে বঙ্গদেশের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রামমোহন রায় বঙ্গবাসীর প্রকৃতির উপযোগী বুঝিয়া উপনিষদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত স্বমত সমর্থনের জন্য স্বীকার করিয়া এখানে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সহজ উপায় করিয়া গিয়াছেন; স্বামী দয়ানন্দ পশ্চিমবাসীর প্রকৃতির উপযোগী বুঝিয়া তাঁহার মতে প্রাচীন ঋষিপ্রণীত বেদ অবধি মনুসংহিতা পর্য্যন্ত শাস্ত্র অবলম্বনে আত্মমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উপযুক্ত উপায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ শাস্ত্রের

সম্মান যথেষ্ট রক্ষা করিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা তাঁহা কর্ত্তৃক কিছু সঙ্কীর্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং রাজা রামমোহন দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শাস্ত্রমর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে না পারিলেও মনুষ্যত্বের সম্মান বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

যাই হৌক্ আমি এতক্ষণে দেখিয়া আসিলাম যে, আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ মূলে একমন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও বিভিন্ন প্রচারপ্রণালী অবলম্বনে দুই বিভিন্ন পথে গিয়া পড়িয়াছেন— ব্রাহ্মসমাজ কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতার দিকে এবং আর্য্যসমাজ শাস্ত্রবিশেষের প্রতি অন্ধভক্তির অনুরূপ এবং জাতীয়তার ছায়ায় পরিপুষ্ট কিছু অতিরিক্ত ভক্তির দিকে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজে এই অতিরিক্ত স্বাধীনতায় কিছু কুফল ফলিয়াছে। আর্য্যসমাজেও সেইরূপ অতিরিক্ত জাতীয়তায় শাস্ত্রের একদেশ ভক্তিতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি যে, বেদাদিতে "নিয়োগ প্রথার" অস্তিত্ব দেখা যায় বলিয়াই দয়ানন্দও তাহা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা দেশের মঙ্গলের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমরা মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে এই নিয়োগ প্রথার ফলে অনেক কুফল হওয়াতে তৎকালে উহা পূর্ব্বপ্রচলিত নিন্দিত আচার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার মন্দফল অনুভব করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহা হইতে লোককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কেবল এই প্রথা বেদে উল্লিখিত বলিয়া ইহার সমর্থন

করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য পণ্ডিত লোকদিগের স্বমত সমর্থনের জন্য সহজে প্রমাণপ্রয়োগের অভাব ঘটে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই—এই সেদিন আর্য্যসমাজের নেতাদিগের পরস্পরের মধ্যে এই অতিরিক্ত শাস্ত্রভক্তি হইতে উৎপন্ন এক মহাতর্ক আসিয়া বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল। আমিষ আহার এবং নিরামিষ আহার, ইহার মধ্যে কোন্‌টা বেদে সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই তর্কের বিষয়। এই বিষয় লইয়া দলাদলি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে এই তর্ক আসিল না যে শরীর রক্ষার জন্য কোন্ প্রকার আহার অবলম্বনীয় অথবা অন্য কোন কারণে কোন্‌টা পরিত্যজ্য—তর্ক আসিল যে বেদে কোন্ প্রকার আহার অনুমোদিত হইয়াছে। জাতীয়তার দোহাই দিয়া এই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া অনেক কলহবিবাদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের গুরূপদিষ্ট এই জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠা থাকাতে একটি অপূর্ব্ব সুফলও ফলিয়াছে। এত দলাদলি মারামারির পরেও এক মুসলমান গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে আর্য্যসমাজের অন্যতম গুরুকল্প ভক্তিভাজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুতে তাঁহারা সকল বিবাদ কলহ ভুলিয়া গিয়া একপ্রাণে মিলিত হইয়া আর্য্যোচিত প্রকৃত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মেরা মৈত্রীর বিষয়ে সহস্রবার বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিলেও স্বয়ং অভিমানমুগ্ধ হইয়া আজও প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিতেছেন না।

স্বামী দয়ানন্দ ও রাজা রামমোহন উভয়েই প্রধানত ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন—ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহাদের উভয়েরই জীবনের মধ্যবিন্দু ও ব্রত ছিল, অন্যান্য কার্য্য ইহারই আনুষঙ্গিক পরিধি-

স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই আমি আজ ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে উভয়ের অবলম্বিত প্রণালী আলোচনা করিলাম। ইহার উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাহস বলিয়া বিবেচনা করি এবং সেই কারণে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ব্রহ্মতেজে যাঁহাদের হৃদয় মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের নিকটে অনেককেই অবনতমস্তক হইতে হয়। রাজা রামোহনের পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁহার সমসাময়িক একজনও কি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন? সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ যে বেদভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা বিষয়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন পণ্ডিতই তাহার বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় আপত্তি আনয়ন করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ যখন আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সাধুভাবে পরস্পরের গুণ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত হইতে পারিবেন— ব্রাহ্মসমাজ নিজ উদারভাবের উপর আর্য্যসমাজের জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠা আত্মগত করিবেন এবং আর্য্যসমাজ স্বীয় জাতীয়তা-নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিক উদারতা মিশ্রিত করিবেন এবং এইরূপে যখন এক বৃহৎ ধর্ম্মপরিবার অবতীর্ণ হইবে তখনই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, ঋষিযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে, ইন্দ্র-দেব স্বর্গলোক হইতে পারিজাত বর্ষণ করিবেন; দিক্ সকল সুপ্রসন্ন হইবে, বায়ু সুগন্ধ বহন করিবে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হইবে এবং সকলেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্রে অভিষিক্ত হইয়া আনন্দময়

হইয়া উঠিবে—জগত হইতে অশান্তি ও দুঃখরাশি চলিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।*

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
স্বামী দয়ানন্দ ও রাজা রামমোহন বিষয়ক
ত্রয়োদশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

দীনবন্ধু ।*

তুমি দীনবন্ধু হৃদয়নাথ
দেখা দাও হৃদয়ে আমার ।
চিরকাল থাক আমারি সাথ
তোমারেই জানি সারাৎসার ॥
তোমারি কঠোর নিয়ম বলে
ছুটেছে তারকা অসীমেতে ।
ছুটেছে রবি বিশ্ব চরাচরে
তোমারি একের আদেশেতে
নিয়ম মহান সুখের এ'যে
তুমি বিনা কে করিতে পারে ।
মরম বুঝিবে নিয়মের কে
তুমি বিনা কে বুঝাতে পারে ।
প্রেমরূপ তুমি করুণাময়
এস তুমি আত্মার আসনে ।
দূরে যাক শোক মোহের ভয়
দেখি তব স্নেহের আননে ॥
হৃদয়ে আছে যে পাপের ধূলি
প্রেমবারি সেথা বরষিয়া ।

---

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত ।

মুছাও প্রভু কাঁদি হে আকুলি
তোমারই চরণ ধরিয়া॥
পতিতপাবন তুমি হে নাথ
তার দেব তার দীনজনে।
সম্পদে বিপদে তোমারি হাত
ধরে থাকি যেন প্রাণপণে॥

—ঃওঁঃ—

নাগানন্দ।*

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং নচ পাপে প্রবর্ত্ততে॥

পাত্র ও পাত্রীগণ।

জীমূতবাহন—দাক্ষিণাত্যের প্রদেশ বিশেষের যুবরাজ
আত্রেয়—বিদূষক
মতঙ্গ—জীমূতবাহনের পার্শ্ববর্ত্তী রাজা
তাপস—
মিত্রাবসু—সিদ্ধযুবরাজ
কৌশিক—কুলপতি
শেখরক—সিদ্ধযুবরাজের মোসাহেব।
মোসাহেবের চাকর

মলয়বতী—সিদ্ধরাজকন্যা
চতুরিকা—মলয়বতীর সখী
মনোহরিকা—মলয়বতীর দাসী
নবমল্লিকা—চেটী

প্রথমাঙ্ক, ১ম দৃশ্য ; স্থান—বিদ্যাধরদিগের রাজ্যের সন্নিহিত তপোবন।

(যুবরাজ জীমূতবাহন ও বিদূষকের প্রবেশ।)

জীমূত। আত্রেয়! এই যৌবন কালটা আমাদের জীবন-পরীক্ষার একটী অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা। এই সময় হৃদয় যেমন সহজে পুণ্যের দিকে যাইতে পারে, তেমনি সহজে পাপের পথেও

---

* ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই, ১৮১০ শক, ৫৯ ব্রাহ্মসম্বত, ১৫ শ্রাবণে লিখিত। সংস্কৃত ভাষায় নাগানন্দ নাটক যখন প্রথম পড়ি, তখন তাহার অন্ত-

দৌড়িতে পারে ; পুণ্যের পথটী অধিকাংশ লোকে সংসারের ধূলিমাখা চোখ দিয়ে দেখে সোজা হইলেও বক্র মনে করে এবং পাপের বক্র, মলিন, দুর্গন্ধবিশিষ্ট পথকে সরল, পরিষ্কার এবং সুগন্ধবিশিষ্ট মনে করে। এইরূপ ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াই অধিকাংশ লোক পাপের পথে পড়িয়া যায়। আরও এই পাপ পথটা এমন পিছল, যে একবার সেই রাস্তায় পা দিলে একমাত্র সেই পরমপিতা অখিলনাথ, "যাঁর নাম পরশরতন, পাপিহৃদয়-তাপহরণ," তাঁহার সাহায্য বিনা কাহারও সে পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার আশা থাকে না। এখন আমি সেই একমাত্র সনাতন "আত্মার আত্মার" নিকটে এই প্রার্থনা করি যে আমি ওরূপ পাপপথে যেন কদাপি না বিচরণ করি। প্রিয়বন্ধু! তার এক সুবিধাও এসে উপস্থিত হয়েছে—আমার বাপ মা সংসার ছেড়ে দিয়ে বনে গেছেন, আমিও—

বিদূ। (স্বগত) এইবারে মজালে দেখছি ; এও আবার রাজ্য ছেড়ে বনে গেলে আমারই সমূহ বিপদ—কেবল বনবাদাড়ে ঘুরে মরি আর কি! যাই হোক্ দেখা যাক্ কি বলে, সেই বুঝে আমাকে চল্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) তুমিও কি—বনে যাবে?

নিহিত শান্তরস আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন অবধি তদবলম্বনে একখানি নাটক রচনার অভিপ্রায় আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল—মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সেই নাটক পড়িয়া পাঠকদিগের ঈশ্বরের প্রতি মতিগতি হইবে। অবসরের অভাবে আমি এই নাটক সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই, এবং এখন আর তাহা সম্পূর্ণ করিবার আশাও রাখি না। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থ পৃথক প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনায় ইহাকে আলাপ গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলাম। ইহা মূল নাটকের কোনপ্রকার অনুবাদ নহে। মূল ভাবটী রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছি।

জীমূত। হ্যাঁ ঠিক ভেবেছ; আমিও বনে যাব মনে কর্ছি।

বিদূ। আচ্ছা ভাই তোমার একি কাজ? তোমার বাপ মা ত এখন মৃত বল্লেই হয়; তাদের শুশ্রূষা করিবার জন্য সব রাজ্য টাজ্য ছেড়ে দিয়ে বনের ভিতর ঢুকে পড়বে?

জীমূত। এটা তুমি অন্যায় বল্ছ। বল দেখি, বাপের সামনে ছেলে যদি মাটিতে বসে, তা'তে যে শোভা হয়, একটা মস্ত সিংহাসনে বস্লে কি সে রকমটা হয়? বাপ মায়ের সেবা করলে যে সুখ হয়, রাজত্বে কি সে সুখ পাওয়া যায়? তাঁদের প্রসাদ খেলে মনে যে এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি আসে, ত্রিভুবন লাভ করিলেও কি সে তৃপ্তি পাওয়া যায়?

বিদূ। (আত্মগত) তাই তো, পিতৃমাতৃভক্তি দেখছি এঁর বড় বেশী রকমের। যাই হোক্ আমি অন্য রকম করে একবার দেখি; নিতান্ত না হয়ত নাচার। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, আমি কি তোমাকে কেবল সুখভোগের জন্য রাজ্য ছাড়তে নিষেধ কর্ছি? এখানে তোমার অনেক কর্ত্তব্য কাজ পড়ে আছে; সেগুলো কি শেষ করা উচিত নয়?

জীমূত। (একটু হাসিয়া) সখে, যা কর্ত্তব্য তা' সব করেছি; এই শোন—প্রজাদিগকে সৎপথে চলিতে শিক্ষা দিয়েছি; সাধু লোকদিগকে সুখে রেখেছি; বন্ধুলোকদিগকে তো আপনার সমান সম্মান দেখাইয়াছি; রাজ্যেতেও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেছি, দরিদ্রদিগের জন্য একটা কল্পবৃক্ষ প্রদান করিয়াছি, প্রার্থনামাত্রেই সেই বৃক্ষ অধিকতর ফল দেয়। এখন আমার যা' যা' কর্ত্তব্য ছিল সেগুলো তো বল্লুম; আর সে সব শেষও করেছি। তোমার মনে এ সব ছাড়া আর কি কর্ত্তব্য বলে মনে হচ্চে, আমাকে তা' বল।

বিদূ। আমি ও সব কিছুই বলি নি; আমি বল্‌ছিলুম কি জান, যে, তোমার রাজ্যের পাশেই সেই দুর্দ্দান্ত মতঙ্গ রাজা আছে। এখন যদিও তুমি সমুদয় রাজ্যের ভার প্রধান অমাত্যের উপর দিয়েছ, তবুও তুমি সেখানে না থাকলে রাজ্য যে সুস্থির থাকবে, তা' বোধ হয় না। এইজন্য তোমাকে থাকতে বল্‌ছি।

জীমূত। তাই বল; মতঙ্গ আমার রাজ্য কেড়ে নেবে এই জন্যে তোমার মাথায় এত ভাবনা ঢুকেছে?

বিদূ। তা নয় ত' আবার কি?

জীমূত। তাইত চাই। আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরের জন্য রেখেছি—তা' এই রাজ্য ত' অতি সামান্য। যদি বল যে তবে সেই রাজাকে ডেকে এনে আমার রাজ্যটা নিজে হাতে ক'রে তুলে দিইনি কেন? সে কেবল বাপের অনুরোধে। যাক্ যাক্ এ সব যেতে দাও; এ রকম ছোট খাট বিষয়ে ভাববার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন শোন দিকিন—বাবা আমাকে বলেছেন যে, তিনি যে তপোবনে থাকেন, সেখানকার সমিধ, ফল মূল প্রভৃতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তাই তাঁর বাসোপযুক্ত একটী আশ্রমস্থান মলয়পর্ব্বতে দেখতে হবে। এস সেইখানেই যাওয়া যাক।

বিদূ। যা' বল'। চল, তবে যাওয়া যাক।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য—মলয় পর্ব্বত, তাহার উপরে আশ্রম স্থান।

(জীমূতবাহন ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। আঃ কেমন মলয় বাতাস বচ্চে! ঠাণ্ডা!—হ্যাঁ দেখ, চন্দনের গন্ধ পাচ্চ না? এখানে অনেক চন্দনের গাছ আছে কি না, তাই বাতাস এলেই চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়।

জীমূত। (একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে চারিদিকে চেয়ে) তাইতো' আমরা যে মলয়পর্ব্বতে এসে পড়েছি দেখছি। কি চমৎকার শোভা। ওধারে অনন্ত সমুদ্র এক একবারে জগৎব্যাপী হুঙ্কার ছেড়ে জগতের লোককে অনন্তপ্রেমের সমুদ্রে স্নান করিবার জন্য আহ্বান করছে, আর এধারে মলয়পর্ব্বত আপনার অভ্র-ভেদী শৃঙ্গ নিয়ে যেন জগতের ক্ষুদ্র কোলাহলের প্রতি উপেক্ষা দৃষ্টি ফেলে অনন্তসাগরের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে। ইহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার যথার্থ স্থান। হৃদয়দ্বার আপনিই ঈশ্বরের পানে ধাবিত হয়। অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্চে যে এই নির্জ্জনস্থানে পরমেশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া একটী সুশ্রাব্য গান গাই।

বিদূ। সে তো বেশ কথা। (আত্মগত) ও পরমেশ্বরই হোক, আর যে ঈশ্বরই খুসি হোক না কেন, আমার গানটা শুন্‌তে পেলেই হল; গানের সুরটা জেনে আমার মনের মতন কথা বসালেই আমার গানের পুঁজিতে একটা বাড়ল। তবে একটু তাড়া লাগাই। (প্রকাশ্যে) কৈ, গান্‌টা হোক তবে।

জিমুত। তবে শোন— (গান)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ, তুমি আদি, তুমি অন্ত তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।

জলস্থল মরুতব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম।

পূর্ণ হলো মনস্কাম লয়ে আজি তব নাম, তব পায় শতবার করি প্রণাম করি প্রণাম।

যাক, এখন এস, এর উপরে উঠে একটা আশ্রমস্থান খোঁজা যাক।

বিদূ। তাই চল। (একটু এগিয়ে গিয়ে) তুমিও এস।

জীমূত। (একটু গিয়ে দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন সূচনা ক'রে) ওহে আমার যে ডান চোখটা নাচ্চে; আমিত এর জন্য কিছু ফল পাবার আশা করিনে; কিন্তু ঋষিরা যা' বলে গেছেন, তাওতো মিথ্যা হবে না; তবে বল দিকিন্ আমার কি ফল হবে?

বিদূ। হবে একটা শুভ ফল, নিশ্চয়ই হবে।

জীমূত। হলেও হতে পারে।

বিদূ। বন্ধু! এই যে সাম্‌নে তপোবন দেখতে পাচ্চি। হরিণীরা শুয়ে আছে যেন কিছুরই ভয় নাই। আস্তে আস্তে কুড়ে ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্চে—কত ঋষি হোম আরম্ভ করেছেন। (আত্মগত) হ্যাঁ, রাজা যে বলেছেন রাজ্য ছেড়ে বনে বাস করবেন, তা' তো হ'তেই পারে; ঋষিগুলো তো দেখতে পাচ্চি বেশ হৃষ্টপুষ্ট—এখানে সব জিনিষ টাট্‌কা পাওয়া যায়—এ খেয়ে কি আর সহরের 'জাগান' ফল খেতে ভাল লাগে? সহরে

একটা সাঁচ্চা জিনিষ মেলে?—না। হোকগে বাপু ওরা সব হৃষ্টিমিষ্টি ; আমি আসল চীজ ছেড়ে নকলে ভুলব না। বাবা, সেই রূপচাঁদ সহরের চীজ বটে,কিন্তু সেই একটাতেই পিরথিমীকে হাতে রেখেছে—বাবা জোর কি কম!

জীমূত। আত্রেয়! ঠিক বলেছ—এ তপোবনই বটে ; এই দেখনা, ঋষিরা পরিবার জন্য গাছের ছাল কেটে নিয়েছেন ; ভাঙ্গা কমণ্ডলু সব নির্ঝরের জাল ফেলে দিয়েছেন, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—শোন! শোন! শুকেরা পর্য্যন্ত সামগান মুখস্থ করে ফেলেছে।

বিদূ। এইস্থানেই আশ্রমস্থানটা ঠিক কর না?

জীমূত। এইখানেই ত ঠিক করবো।

বিদূ। হঁ্যা দেখ, গানের মতন একটা সরু আওয়াজ আসছে না? হরিণগুলো খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে কাণ খাড়া করে এখানে গান শুনছে বলে বোধ হচ্চে—না?

জীমূত। বটেইত, সত্য সত্যই গানের সুর শুনতে পাচ্চি, তার সঙ্গে আবার একটু একটু বীণার ঝঙ্কারও আস্‌চে। দেখ—ওই যে একটা ব্রহ্মমন্দির দেখছ,আমার বোধ হয়, ঐখানে কোন ধর্ম্মশীলা নারী গানের দ্বারা ব্রহ্মের স্তব করছেন।

বিদূ। আচ্ছা ভাই, একবার ব্রহ্মমন্দিরটী কি দেখতে যাবে না? (আত্মগত) এই বারে একবার চেষ্টা করে দেখব, যাতে আমার বন্ধুর মন তাতে ডুবে যায়, তা হলেই আর আমাকে বন বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পা' খোয়াতে হবে না।

জীমূত। চল্‌'না দেখে আসি ; তাতে আর ক্ষতি কি? এস তবে। (উভয়ের নিস্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য; একটি ব্রহ্মমন্দির, তাহাতে কোন নারী উপাসনা করিতেছেন; নিকটে একটি সখী; চারিপার্শ্বে অল্প স্বল্প বন, ঝোঁপঝাঁপ ইত্যাদি।

(জীমূতবাহন ও বিদূষকের প্রবেশ।)

জীমূত। আত্রেয়! এস, আমরা এই অশ্বত্থগাছের আড়াল থেকে দেখি। মন্দিরের ভিতরে গেলে কি জানি যদি উপাসনার ব্যাঘাত ঘটে। আর বিশেষতঃ ইনি যুবতী এবং ইহাঁর সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ নাই; এ অবস্থায় মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা উচিত মনে হয় না।

বিদূ। তবে এস এই গাছের আড়াল থেকেই দেখি। (অশ্বত্থ গাছের আড়ালে লুকাওন)। (যুবতীর বীণাতে ঝঙ্কার প্রদান) ঐ শোন শোন বোধ হয় এবারে একটা গান গাবেন।

(মলয়বতীর গান)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগনন্দন।
ব্রহ্মসনাতন পাতকনাশন।
এক দেব ত্রিভুবনপরিপালক।
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক মনোমদ মঙ্গলদাতা।
বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধিবিধাতা।
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে।
বিতর প্রেমসুধা চিত্ত চকোরে।

(পুনরায় উপাসনা করিতে উপবেশন)

জীমূত। কি সুন্দর! কি মিষ্ট! একবার মুখখানি দেখ দিকিন; তপস্যা নিজে যেন ফুটে বেরোচ্চে। এঁর কাছ থেকে পাপতাপ দূরে পলায়ন করেছে। যেমন রূপ তেমনি গুণ। পুণ্যাত্মার কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! উনি তপস্যা করছেন, আর ঐ দেখে আমার মনে হচ্চে যেন আমিও অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছি। দেখ আত্রেয়! ললাট হ'তে কি শুভ্র জ্যোতি আস্‌ছে—না?

বিদূ। (আত্মগত) স্পষ্টই দেখছি এই মেয়েটাকে বন্ধুর পছন্দ হয়েছে; আমাকে এই ছাইঢাকা আগুনে ঘি ঢালতে হবে দেখছি। (প্রকাশ্যে) তা' আর বোলতে?—যেমন রূপখানি, গুণগুলিও তেমনি। এখনো দেখা যাক্ না—আরও কি বলে, আর সখীটাই বা কি বলে।

মলয়। (উপাসনার আসন হইতে উঠিয়া সখীর প্রতি) চতুরিকা! আমার উপাসনা হয়ে গেছে; আরও খানিকক্ষণ এই মন্দিরে বসে, তার পরে ঘরে যাব এখন। আমার এই মন্দিরটী বড় ভাল লাগে।

চতু। আচ্ছা ভাই তুমি ত' এতকাল তপস্যা করলে; কিছুই ত ফল দেখতে পাচ্চিনে; আর কেন এ কষ্টভোগ করছ? আজ তোমার বয়স প্রায় উনিশ বছর হ'তে চল্ল; আর তুমি প্রায় সাত আট বছর ধরে ত তপস্যা করছ,তবুও ত' দেবতা প্রসন্ন হলেন না; তোমার বিয়ের জন্যে আমরা সব ভেবে অস্থির,তবুও তো দেবতার দয়া দেখতে পাইনে।

বিদূ। (রাজার প্রতি) বন্ধু! আমার বোধ হয় যে মন্দিরের ভিতরে গেলেও কোনও দোষ নেই। ইনি কুমারী।

রাজা। তা' ঠিক বলেছ, কুমারীর নিকটে যাওয়া যেতে পারে; তাতে কোন দোষ নেই,কিন্তু এখনো যাব না; তা' হলে হয়ত ভয়টয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারেন।

বিদূ। ইনি কে, তা' এখনও জানতে পারলুম না; ভাল, আরও খানিকটা দেখা যাক্।

মলয়। (সখীর প্রতি) সখি! তুমি কি ভেবেছ যে আমি সুন্দর বর পাবার জন্যে তপস্যা করছি? তা ভেবো না; সকাম হ'য়ে তপস্যাকে কি আর তপস্যা বলে? নিষ্কাম হয়ে, স্বার্থপরতা ছেড়ে দিয়ে তপস্যা করলে তবেই যথার্থ পুণ্য উপার্জ্জিত হয়। আমি পুণ্যের জন্যই পুণ্যকর্ম্ম, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অভ্যাস করেছি। তবে মানুষ যখন জন্মেছে তখন সে একেবারে নিষ্কাম হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের কামনার বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; এই কামনার বিষয় নিয়ে আমরা কাউকে ধার্ম্মিক, কাউকে অধার্ম্মিক, কাউকে বড়লোক, কাউকে ছোটলোক বলি; সেইজন্য এই কামনার বিষয়টাকে যত পারা যায়, একটা ভাল বিষয় ধরতে হবে। এখন তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, স্বয়ং ভগবানের চেয়ে আর কে ভাল হইতে পারে? তবে কি তাঁকেই আমাদের কামনার বিষয়, আমাদের পরমধন বলে মনে করা উচিত নয়? তবে যে—

বিদূ। (আত্মগত) তাই তো! মেয়েটী যে দেখচি একেবারে গৌতমমুনি হয়ে পড়েছেন।

মলয়। (সখীর প্রতি) তবে যে চতুরিকা, তুমি আমার বিয়ের কথা বল্লে, মলয়বতী সেই পার্থিব বিয়ের জন্যে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তুমি আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও কি এই সামান্য

কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লে না যে, মঙ্গলস্বরূপ অন্তর্যামী ভগবান্‌ যখন আমার মঙ্গল বুঝবেন, তখনই আমার বিয়ে দেওয়াবেন; আর তিনি যখন বুঝবেন যে বিয়ে হলে আমার অমঙ্গল হবে, তখন স্বয়ং শিব এসে চেষ্টা করলেও আমার বিয়ে কিছুতেই হতে দেবেন না। তিনি যেমন একটা পোকার দরকারী জিনিষ যুগিয়ে দিচ্চেন, তেমনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও দরকারী জিনিষ যোগাচ্চেন; আর আমি এক সামান্য স্ত্রীলোক—আমার মঙ্গল অমঙ্গল কি তিনি জান্‌ছেন না।

চতু। তুমি এত বিদ্যা শিখেছ! আমি বল্‌ছি কি, না ভেবে একটা মস্ত বক্তৃতা দিতে লাগলে। আমি এই জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে বল্‌চি যে, স্ত্রীলোক অবলা; চিরকাল তার একজনের উপর নির্ভর চাই; কেন এই দেখনা, আমাদের শাস্ত্রেতেও বলে—

মলয়। কেন, আমার ত' নির্ভর রয়েচে; ভগবান ত' সর্ব্বত্রই আছেন, তাঁর উপর নির্ভর করলে আর কিছুতেই ভয় পেতে হয় না।

চতু। আমি তোমাদের অত ভগবান টগবান্‌ বুঝিনে টুঝিনে; তবে শুনেছি যে আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, মেয়ে মানুষে ছেলে বেলায় বাপমায়ের অধীনে থাকে, একটু বয়স হলে স্বামীর অধীনে, তার পরে বুড় হলে ছেলের অধীনে থাকে।

মলয়। আচ্ছা বাপু, তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন? বিয়ে আজ না হয়, আর চারদিন বাদেই হবে।

বিদূ। (রাজার প্রতি) আচ্ছা, বন্ধু, এইবারে মন্দিরের ভিতরে একবার গেলে হয় না?

জীমূত। চল' না, বেশ ত' চল' না।

বিদূ। (আত্মগত) বন্ধুর দেখছি মনটা ওর দিকে কিছু দৌড়াচ্চে; যা হোক্ এ বিয়ের ঘটকালী করতে পারলে,ফলারটাত ধরাই আছে; তা ছাড়া, আমার এই পেটের মতন একটা থলে পোরা দক্ষিণা পাওয়া যাবে।

জীমূত। দেখ, আত্রেয়, আমরা একবারে দুজনে যাব না; আমি আগে যাই, তার পরে তুমি যেও; তা' না হ'লে হঠাৎ ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়বে।

বিদূ। তা'তে আর ক্ষতি কি? তাই হবে; তুমি আগে যাও আমি সুবিধা বুঝে যাব।

(জীমূতবাহনের মন্দিরে প্রবেশ)

(মলয়বতী একটু সরে দাঁড়ালেন)

মলয়। (চতুরিকার প্রতি) সখি! ঐ অপরিচিত ব্যক্তির এস্থানে আসিবার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর।

চতু। (রাজার প্রতি) মহাশয়! আপনার এখানে কি কিছু প্রয়োজন আছে? বলুন, যদি থাকে, আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।

জীমূত। আমি, আমার একটী বন্ধুর সঙ্গে সম্প্রতি পিতার আশ্রমস্থান নির্ণয় করতে মলয়পর্ব্বতে উপস্থিত হয়েছি।

চতু। কৈ, আপনার সে বন্ধুটী কোথায়?

জীমূত। তিনি এইখানেই আছেন; আপনাদের পাছে বিরক্তি হয়, সেইজন্ত তাঁহাকে আনি নি। ওহে ও আত্রেয়! আত্রেয়! এদিকে এস।

(নেপথ্যে) এই এলুম বলে। (বিদূষকের প্রবেশ)

জীমূত। উনি আর আমি এই দুইজনে এসে এদিক ওদিক

ঘুরচি এমন সময় আপনার সখীর মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শুন্‌তে পেয়ে এই ব্রহ্মমন্দিরে এসেছি ; এসে দেখলুম উনি উপাসনা করিতেছেন ; তাই ভিতরে না এসে ওই অশ্বত্থগাছের আড়ালে বসেছিলুম।

(মলয়বতীর সলজ্জভাবে অবস্থান)

মলয়। (চতুরিকার প্রতি, এরূপ ভাবে যে রাজা ও বিদূষক শুনিতে না পান) চতুরিকা ! ইহাঁর সাম্‌নে থাক্‌তে আমার বড় লজ্জা হচ্চে ; চল অন্যত্র যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

বিদূ। (চতুরিকার প্রতি) আপনাদের দেশে কি এইরূপ শিষ্টাচার যে অতিথিকে একটা কথা বলেও সন্তুষ্ট করবে না ?

চতুরিকা। (মলয়বতীকে দেখে আত্মগত) এই লোকটীকে দেখে বেশ ভদ্রঘরের লোক বলে মনে হচ্চে ; আর সখীও দেখছি এঁতে অনুরাগপূর্ণ হয়েছেন। (প্রকাশ্যে) সখি, এই ব্রাহ্মণ ঠিক বলেছেন ; তোমার অতিথিসৎকার করা নিতান্ত উচিত। আচ্ছা, আমিই তোমার হয়ে যথাকর্ত্তব্য করছি।

(রাজার প্রতি) মহাশয়েরা আসন গ্রহণ করুন।

বিদূ। (রাজার প্রতি) ইনি বেশ বলেছেন , এস খানিকক্ষণ বসা যাক্‌। (উভয়ের উপবেশন)

মলয়। (চতুরিকার প্রতি) ও রকম কোরো না ; যদি কোন তাপস এসে উপস্থিত হন, আমাকে নির্লজ্জা মনে করতে পারেন।

(একজন তাপস পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ গাছের কাছে আসতে আস্‌তে)

তাপস। কুলপতি কৌশিক এই আদেশ করিয়াছেন, "বৎস শাণ্ডিল্য ! আজ কয়েক দিন হল রাজা জীমূতবাহন আমাদের এখানে এসেছেন ; কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তা কেহই জানে না ; তাই সিদ্ধযুবরাজ, বাপের আজ্ঞায় সেই জীমূতবাহনের হস্তে

স্বীয় ভগিনী মলয়বতীকে সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁর বাসস্থান অন্বেষণ করতে গিয়েছেন। তা' যদি মিত্রাবসুর জন্য মলয়বতী অপেক্ষা করে, তা' হলে তার মধ্যাহ্ন স্নানের সময় উতরে যেতে পারে। তাই তাকে ডেকে নিয়ে এস।" যাই তবে, দেখি মলয়বতী এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিতর আছেন কি না। (খানিক গিয়ে নীচের দিকে চোখ দিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে একটু দাঁড়িয়ে) আচ্ছা ঐ কার পা দেখ্‌তে পাচ্চি? হয়ত রাজা জীমূতবাহন এইখানেই আছেন। তবে যাই; আর দেরী না। (মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে আত্মগত) ইনিই নিশ্চয় সেই জীমূতবাহন। (রাজার কাছে গিয়ে) তোমার মঙ্গল হউক।

জীমূত। আপনাকে জীমূতবাহন প্রণাম করিতেছে (প্রণাম করিবার জন্য উত্থানোদ্যত)।

তাপস। থাক্ থাক্, আর উঠে কাজ নেই; অতিথি সকলের গুরু; অতএব আপনি আমাদেরও পূজ্য; বসুন, আর উঠ্‌তে হবে না।

মলয়। আর্য্য প্রণাম করি।

তাপস। (মলয়বতীর প্রতি) বৎস! তোমার অনুরূপ বর লাভ কর। মলয়বতী! কুলপতি কৌশিক বলেছেন যে, তোমার মধ্যাহ্নস্নানের সময় চলে যাবে, এইজন্য তুমি শীঘ্র স্নান করিতে চল।

মলয়বতী। এই যাই। (আত্মগত) তাই তো ওদিকে গুরুর আজ্ঞা আর এদিকে এই প্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রাণ দৌড়চ্চে; আমি এদিকেও যেতে পারচিনে, ওদিকেও পারচিনে। (উঠিয়া সলজ্জ ভাবে রাজার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী

একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পশ্চাৎ তাপসের সহিত নিষ্ক্রান্ত)।

জীমূত। (আত্মগত) একি! এই তপস্বিনী আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি রেখে গেলেন। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়টী কেড়ে নিয়ে গেছেন। আমি এখন ক্রমেই আত্মহারা হইতে চল্লুম দেখছি। না—এর সঙ্গে বিয়ে হয় ভাল, না হয় তাও ভাল; ঈশ্বর যাতে মঙ্গল বুঝবেন, তাই করুন; তাঁরই ইচ্ছা সফল হউক।

বিদূ। চল, আর কেন? এবারে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা দেখতে হবে কি? সূর্য্য মাথার উপরে উঠে গেছে, এখন চল মুনিদিগের কাছে অতিথি হয়ে কিছু খাবার টাবার যোগাড় করিগে।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য; ঘাসযুক্ত মাঠের মধ্যে একটি পথ।

(মনোহরিকার প্রবেশ)

মনো। দাদাবাবু এসেছেন কিনা, দিদিঠাকরুণ দেখতে বল্লেন; যাই দেখিগে। (খানিকটা চলে নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ও কে এদিকে ছুটে আস্চে ? (খানিকক্ষণ দেখে) ও মা এ যে চতুরিকা দিদি; এত ছুটে কোজ্জাচ্চ ?

চতু। মনোহরি! সখীর বড় অসুখ হয়েছে, তাই আমাকে তাঁর লতাঘরটী পরিষ্কার কর্‌তে বল্লেন; তিনি দিনের বেলাটা বোধ হয় সেইখানেই কাটাবেন। সে সব পরিষ্কার টরিষ্কার হয়েছে, তাই খবর দিতে যাচ্চি।

মনো। তবে যাও, যদি গরমে অসুখ হয়ে থাকে, তাহলে বোধ হয় সেখানে গেলে সেরেও যেতে পারে।

চতু। তুমি যাচ্চ কোথায় ?

মনো। দিদিঠাকুরুণ দাদাবাবুকে ডাকতে বলেছেন। তবে যাই, তুমিও এস। (নিষ্ক্রমণ)

চতু। (আত্মগত) মনোহরী মনে করেছে জ্বরটর হয়েছে, (হাসিয়া) সে বুঝতেই পারিনি। যাক্ যাই এখন, দেখি সখী কেমন আছেন।

(প্রস্থান)

(ক্ষণেক পরে মলয়বতীর সহিত প্রত্যাগমন)

মলয়। (অন্যমনস্কভাবে আত্মগত) হৃদয়! যখন তাঁর সম্মুখে

ছিলে, তখন একটীও কথা কইলে না ; এখন না জানি তিনি কতই দুঃখ করছেন। (প্রকাশ্যে) সখি!—সখি!—ব্রহ্মমন্দিরের পথ দেখাইয়া দাও।

চতু। (আত্মগত) সখীর দেখছি মন ব্রহ্মমন্দিরের দিকেই যাচ্চে। (প্রকাশ্যে) তুমি যে লতাঘরে যাবে বলেছিলে।

মলয়। ঠিক্ মনে করে দিয়েছ, চল সেইখানেই যাই।

চতু। এই যে এই পথে। (মলয়বতীর অন্যদিকে গমন)

চতু। (পিছনদিকে চেয়ে আত্মগত) সখীর একি হল! সেই মন্দিরের দিকেই যাচ্চেন দেখছি। (প্রকাশ্যে) এই যে লতা-ঘর এই পথে, এই দিকে এস। (মলয়বতীর সলজ্জভাবে তথাকরণ) (উভয়ের নিষ্ক্রমণ)

দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য; লতাগৃহ।

(মলয়বতী ও চতুরিকার প্রবেশ।)

চতু। সখি! এস এই পাথরের বেদীতে বোস এসে, দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। (উভয়ের উপবেশন)

মলয়। সখি! তোমাকে একটি কথা বলিব, কাউকেও বল্‌বে না? তিন সত্যি কর।

চতু। সত্যি বলব না।

মলয়। সেই সেদিন (লজ্জার অভিনয় করিয়া) ভাই জানইত যে এতদিন আমি ঈশ্বরের ধ্যান ছাড়া আর কিছুই জান্‌তুম না—কিন্তু—ভাই সেই যে সেদিন সেই ব্রহ্মমন্দিরে জীমূত—বাহন নামে লোক এসেছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আমার বোধ হয় যেন—না ভাই আর বলব না; আমার দুঃখ ভগবান ছাড়া আর কে শুনবে বল?

চতু। এই বুঝি এক পলের মধ্যে সমুদয় ছেলেবেলার ভাব, ভালবাসা সমস্তই ভুলে গেলে? না বল্‌তে চাও, অবশ্য আমি শুন্‌তেও চাইতে পারিনে। তা' জানি যে আমাকে বল্‌বে না—এখন একজনকে মনে ধরেছে কিনা, তাই আর ছেলেবেলার সঙ্গীকে দরকার নেই? তোমার সব বুঝলুম। (অর্দ্ধক্রন্দন)

মলয়। আমি একটুখানি চালাকি করলুম, আর তুমি কেঁদে ফেল্লে! আমি বল্‌ছিলুম কি যে সেইদিন থেকে বোধ হতে লাগল যেন তাঁর হাতে আমার প্রাণটা নিজে দিতে না পারলে আর কিছুতেই সুখ নেই।

চতু। (আত্মগত) আমি যখন বলেছিলুম যে জীমূতবাহনকে বিয়ে কর্‌তেই হবে, তখন ভারী বক্তৃতা হয়ে গেল ; আর এখন—

মলয়। এই লতাগৃহে এসে যেন তাঁর জন্যে মন আরো উৎসুক হচ্চে।

চতু। তুমি কি মনে কর, তাঁরও মন তোমার জন্যে উৎসুক হচ্চে না ?

মলয়। সেদিন কি আস্‌বে ? (অর্দ্ধক্রন্দন)

চতু। শুধু শুধু কাঁদচ কেন ? (আত্মগত) আর না কেঁদেই বা কি করবেন। (একটা কলার পাতার পাখা দিয়ে বাতাস দেওন)

মলয়। থাক্‌, থাক্‌, আর তোমার বাতাস দিতে হবে না। (হস্তদ্বারা নিবারণ)

চতু। এই সময় যদি সেই ব্যক্তি আসেন।

মলয়। তা হলে কি হয় ?—শোন শোন কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি।

চতু। তাইতো—এযে দেখছি ক্রমেই এগিয়ে আস্‌চে। এসো আমরা দুজনে এই অশোকলতার আড়ালে লুকিয়ে দেখি।

(তথাকরণ)

(জীমূতবাহন ও বিদূষকের প্রবেশ)

জীমূত। আত্রেয়, সেই যেদিন থেকে তাঁকে দেখেছি, মন যেন আর কিছুতেই স্থির হ'তে চায় না। তাঁর একবার মাত্র দেখা পাবার জন্য এই সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, তবুও দেখা পাই না কেন ?

বিদূ। অত অধীর হইলে চলিবে কেন ? তিনিও বোধ হয়

তোমার ন্যায় কষ্ট পাচ্চেন। তিনি যদি সহ্য কর্‌তে পারেন, তবে তুমিই বা কেন না পারবে ?

জীমূত। আত্রেয়! আমাকে নিকটস্থ এক পাহাড় থেকে একটী গেরী মাটির খণ্ড এনে দাও তো, গুণবতীর একটী ছবি এঁকে আমার হৃদয়কে শীতল করি।

বিদূ। আচ্ছা, সে বড় মন্দ কথা বলনি—(নেপথ্যে গিয়া পুনরায় পাঁচ প্রকার খড়ি আনিয়া) এই এনেছি ; তুমি এক রকম বলেছিলে, আমি পাঁচ রঙ্গের এনেছি। এই নাও (রাজাকে দান)

জীমূত। ভালই করেছ। (এই বলিয়া সেইগুলি দ্বারা একটী পাথরে ছবি আঁকা)।

বিদূ। বা বেশ ত হয়েছে ; না দেখে আঁকলে কি করে ?

মলয়। (চতুরিকার প্রতি) তুমিই না আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, আমিও যেমন তাঁর কথা ভাবছি, তিনিও তেমনি আমার জন্য ভাবছেন ! চল অন্যত্র যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

চতু। একটু দাঁড়াও, সমস্তটা আগে শোন। (মলয়বতীর বিষণ্ণবদনে তথাকরণ)

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

বিদূ। (রাজার প্রতি) ছবিটা ঢাক, শীঘ্‌গির, শীঘ্‌গির। মিত্রাবসু এসেছেন। (রাজার একটা কদলী পত্রের দ্বারা তথাকরণ)

জীমূত। (মিত্রাবসুকে) এই যে, মহাশয় এসেছেন ; বেশ হয়েছে, বসুন বসুন।

মিত্রাবসু। মহাশয়কে একটী কথা বল্‌তে ইচ্ছুক হচ্চি।

আপনাকে সমস্ত গ্রামটা খুঁজেছি কোথাও পাইনি; অবশেষে শুন্‌লুম যে আপনি এই দিকে এসেছেন।

জীমূত। তাহলেত মহাশয় আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছেন দেখছি; আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে আপনি আমা হতে এতটা কষ্ট পেলেন।

মিত্রাবসু। না, তেমন কিছুই কষ্ট নয়। এখন আপনাকে যে কথাটা বল্‌ব বলে এসেছি সেইটে শুনুন তবে।

জীমূত। বল্‌তে আজ্ঞে হউক।

মিত্রাবসু। আপনাকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে আমার পিতা সিদ্ধরাজ তাঁহার গুণবতী কন্যাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করেছেন। এখন আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র।

বিদূ। (আত্মগত) একটা ফলার আছে দেখছি কপালে; এখন বন্ধুটী হাতের পাখী না ছাড়্‌লে হয়।

জীমূত। (খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া মিত্রাবসুকে) অত্যন্ত কষ্ট বোধ হচ্চে যে আমি আপনার কথায় সায় দিতে পারিলাম না; কারণ আমি আর একটী অতি গুণবতী রমণীর প্রতি অনুরক্ত আছি।

বিদূ। আপনি ওঁর কথা শুন্‌ছেন কেন? উনি ওঁর পিতার অধীন কিনা, তাই পিতাকে বল্লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিত্রা। আপনি ঠিক বলেছেন; তবে তাই চল্লুম। (প্রস্থান)

(মলয়বতীর মূর্চ্ছা প্রাপ্তি)

চতু। ওমা কি হল—ওগো কে আছ তোমরা শীঘ্‌ঘির এস।

(জীমূতবাহন ও বিদূষকের তাড়াতাড়ি তথায় গমন)

জীমূত। (আশ্চর্য্য ভাবে) এই যে সেই চতুরিকা;

আপনাকে—(ক্ষণেক থামিয়া চতুরিকার প্রতি) কি হয়েছে ?—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আমার মলয়—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত মলয়বতীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে)

এই যে সেই আমার মলয়—একি অবস্থা দেখছি—(মলয়বতীর প্রতি) প্রিয়ে একবারটী কথা কও।

চতু। অধীর হবেন না—শুনুন——ওঁর এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ আপনিই।

জীমূত। আমি! আমি! কি করে ?

চতু। (বিদূষকের প্রতি) আপনি একটা ঠোঙ্গা করে কিছু জল আনুন দিকিন। (বিদূষকের প্রস্থান)

(রাজার প্রতি) আপনি যে ছবি এঁকেছেন, প্রথমতঃ ইনি তাহা অন্য কোন স্ত্রীলোকের ছবি ভেবেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ওঁর ভাই আর্য্য মিত্রাবসু যখন আপনাকে সিদ্ধরাজকন্যাকে বিয়ে করবার কথা বল্লেন, তখন আপনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে আপনি অন্য এক স্ত্রীলোককে ভাল বাসেন। ইহাই ওঁর মূর্চ্ছা প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

(বিদূষকের জল লইয়া প্রবেশ)

এই যে আপনার বন্ধু জল এনেছেন ; (বিদূষকের হস্ত হইতে ঠোঙাটী গ্রহণ করিয়া মলয়বতীর মুখে ছিটা প্রদান; ক্রমে মলয়বতীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ ও জীমূতবাহনকে দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান)

মলয়। কে আমাকে জাগালে ?—আমি বেশ ঘুমিয়েছিলুম—

চতু। সখি ! শোন, কথাটাই শোন ; দেখে এস দিকিন, কার ছবি হয়েছে ?

মলয়। না আমি কোন ছবি দেখতে চাইনে—চল যাই।

চতু। চলই না কেন ; একবার দেখলেত আর তুমি ক্ষয়ে

যাবে না; চল, চল। (প্রণয়কোপের সহিত ধরিয়া লইয়া ছবির কাছে গমন)

মলয়। সত্যি চতুরিকা! দেখ আমারই মত অবিকল চেহারা এঁকেছেন।

জীমূত। আপনি সবিশেষ না জেনে এরূপ—

বিদূ। আচ্ছা বাপু তুমি —

চতু। (রাজার প্রতি) আপনি জানতেন না বোধ হয় যে আর্য্য মিত্রাবসু এঁর ভাই আর ইনিই সেই সিদ্ধরাজকন্যা মলয়বতী।

জীমূ। ঠিক্ বলেছেন, আমি ত এ সব কিছুই জানতুম না।

বিদূ। যা' হোক ভাই খুব একটা দাঁও ছেড়ে দিয়েছ।

চতু। এ দাঁও যাবে না; আমরা সকল ঘটনা বলব, তা'হলেই ঠিক হবে।

জীমূত। এর জন্যে আপনার কাছে ঋণী রইলুম।

চতু। সখি দেখ ও কে হাসতে হাসতে এদিকে আস্‌ছে।

(মনোহরিকার প্রবেশ)

চতু। কি হয়েছে, এত হাসি কেন?

মনোহরি। (মলয়বতীর প্রতি) দিদিঠাকরুণ! কিছু দিতে হবে—একটা শুভ খবর দিচ্চি।

মলয়। আচ্ছা দেবো, এখন তুমি বল দিকি।

মনোহরি। দাদাবাবু শীঘ্র দিদিঠাকরুণকে ডাক্‌তে বল্লেন—তিনি আজই দিদিঠাকরুণের—ওই যে কোন্ রাজা এসেছেন—তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

চতু। ওমা সত্যি নাকি?

মনো। সত্যি না ত' মিথ্যা বল্‌ছি? দাদাবাবু কাল জামাই-বাবুর বাপের বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি এই বিয়েতে খুব মত দিয়েছেন। তা' যাই হোক শীগ্‌গির এস; স্নান টান করে নিতে হবে?

চতু। যাচ্চি, তুমি এগিয়ে চলনা—আমরা এই এলুম বলে।

(মনোহরিকার প্রস্থান)

(আত্মগত) আর কারই বা অমত? (প্রকাশ্যে) তবে সখি এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

জীমূত। আমরাই বা আর কি করব? বেলা প্রায় নটা দশটা হবে; চল আমরাও স্নানাহারের যোগাড় করি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ; সিন্ধুরাজের কুসুমাকরোদ্যান।

(সিন্ধুযুবরাজের একটি মোসাহেব আলখাল্লা পোষাকে মাতাল ভাবে প্রবেশ ; হাতে একটা মদ খাবার পাত্র এবং সঙ্গে একটি চাকর)

মোসাহেব। (জড়িয়ে জড়িয়ে) এই—বলদেব—আর—এই কামদেব—এঁরাই দুজনে আমার বাবার দেবতা আর কি। ইনি খা—ন্ সুরা—উনি মেলান যোড়া। বাঃ রে বাঃ আমি দেখছি একজন উঁচু মাথার কবি হয়ে পড়লুম! বেশ ত'। সুরা আর যোড়া? বাঃ বাঃ বাঃ ওরে শুন্‌ছিস্—এই সু—রা—আর যো—ড়া—এখন বুঝতে পেরেছিস্ ত' কাকে কাব্য বলে? (মাতলাম দেখিয়ে ঘুরে) কে—রে? ও—আমার নবমল্লিকে এসেছ? তুমি একটু তামাসা করছ?—তা করনা কেন?

চাকর। হুজুর এখানে তিনি ত' আসেন নি।

মোসা। ওরে! কি বল্লি? তিনি এখনও আসেন নি? না—লা—আছেন বই কি? এই লু—কি—য়ে আছেন। আরে—বাপু—মণিহারা ফণীর শোভা থাকতে পারে? তেমনি নবমল্লি-কাকে ছেড়ে দিলে আমি কি একটা মানুষ?—আস্ত জন্তু—জন্তু। (নেপথ্যের দিকে দেখে) এস আমার প্রিয়ে এস! আমার প্রেয়সি এস! (স্ত্রীলোকের বেশে বিদূষকের প্রবেশ এবং মোসাহেবের ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বিদূষকের গলা জড়িয়ে ধরা) আমার হৃদয়েশ্বরি এস! এঁই তোঁমাঁর জঁন্যে সাঁরা মুল্লুক খুঁজেছি প্রাঁণেঁশ্বঁরীর কোঁথাও না দেখা পেঁয়ে একেবারে আর কি বলব—মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি।

বিদূ। (স্বগত) বেটা ত' দেখছি একপেট মদ খেয়েছে—এমন গন্ধ?—রাম! রাম! (থুৎকার ক্ষেপণ)

মোসাহেব। পেয়সি! আমার পেয়সি! ও পেয়সি! এতক্ষণ আমি আসিনি বলে কি রাগ কোরেছ? পায়ে পড়ছি—(মোসাহেব বিদূষকের পায়ে পড়া)

(অপরদিক হইতে এক দাসীর প্রবেশ)

চেটী। (আত্মগত) বটে! এ দেখছি আমাকে ভুলে গেছে। দেখিই না কাণ্ডটা কতদূর গড়ায়।

বিদূ। (মোসাহেবের প্রতি) বেটা ওঠ্ বল্‌ছি—ওঠ্,এখনো ওঠ্—নইলে কীল খেলি দেখছি।

মোসা। বল তুমি পেসন্ন হলে? বল আমার নব-মল্লিকে।

বিদূ। (আত্মগত) এ বেটা ত' ছাড়বার পাত্তর নয়, দু চারি ঘা ডালভাত-খেগো কীল না খেলে টের পাবে না যে আমি ওর প্রিয়েও নই আর প্রেয়সিও নই। (প্রকাশ্যে) উঠবিনে বটে—এই নে—(কীলমারণ) কেমন এখন বুঝলি যে আমি তোর নব-মল্লিকে নই—কোথা তোর নবমল্লিকে?

নবম। এই যে ভাই এইখানেইত আছি। (বিদূষকের প্রতি) আহা তুমি শেখরকের পিঠটা কীল মেরে দাগ পাড়িয়ে দিয়েছ।

(মোসাহেবের প্রতি) ও শেখরক! তুমি আমাকে ভেবে কাকে ঠাট্টা কর্‌তে গিয়েছিলে?

চাকর। হুজুর—এই যে আপনার নবমল্লিকে; ইনি নব-মল্লিকা ন'ন্, এঁর পা ছেড়ে দিন।

শেখর। (বিদূষকের প্রতি) আমাকে ঠকাতে গিয়েছিলে ? (চাকরকে) ধরে রাখ, খবরদার হুকুম না পেলে ছাড়িস্ নে।

চাকর। যে আজ্ঞে।

(বিদূষককে ছাড়িয়া শেখরকের নবমল্লিকার পদতলে পতন)

শেখর। নবমল্লিকে, নবমল্লিকে—তোমার চারটী পায়ে পড়্ছি, আমাকে রেখ।

বিদূ। (আত্মগত) এই ত বাবা চম্পট দেবার সময়। (পলায়নের চেষ্টা)

চাকর। (বিদূষকের পৈতা ধর্‌তে গিয়ে ছিঁড়ে দিলে ও গলায় একটা কাপড় ফেলে ধরে) বাবা! পালাবে কোথায় ? পালাও।

বিদূ। (নবমল্লিকাকে) যাই যে, তুমি এ গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি একটুখানি দয়া কর।

নবমল্লি। তুমি যদি আমার পায়ে পড়।

বিদূ। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) কি, আমি জীমূতবাহনের বন্ধু হয়ে এক দাসীর পায়ে পড়ব ?

নবম। (হেসে, তর্জ্জনী আঙ্গুল দেখাইয়া) আচ্ছা রোস, এখনি পড়্তে হবে। (শেখরককে) শেখরক ওঠ, আমি খুব প্রসন্ন হয়েছি। (শেখরকের গলা ধরে) কিন্তু তুমি বাপু এঁকে যে রকম কষ্ট দিয়েছ, কর্ত্তা শুন্‌লে রাগ করবেন। ইনি আমাদের জামাইবাবুর বড় বন্ধু, তা' এঁকে এখন খুব খাতির টাতির কর।

শেখর। তুমি যা বল্‌বে,তার উপর কি আমার আর কথা আছে ?

বিদূ। (স্বগত) যা'হোক, আমার বড় সৌভাগ্যি যে ও বেটার মাতলামটা কতক কতক ছাড়্ছে।

শেখর। আমার পেরসি! নবমল্লিকে! তুমিও এসে এঁর পাশে বসো; দুজনেরই একসঙ্গে পূজার্চ্চনা করি।

(হাসিতে হাসিতে নবমল্লিকার উপবেশন)

শেখর। (সুরাপাত্র নিয়ে চাকরের প্রতি) বাবা, একটু ঢাল। (চাকরের তথাকরণ)

(নবমল্লিকাকে) তুমি খেয়ে এঁকে দাও।

নবমল্লি। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা, যা' বল্‌ছো তাই করি।

(তথাকরণ)

বিদূ। আরে, আমি যে ব্রাহ্মণ।

শেখর। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার পৈতে কই?

বিদূ। তোমার এই চাকর বেটা ছিঁড়ে দিয়েছে।

নবমল্লি। আচ্ছা তবে বেদের কোন শ্লোক আওড়াও।

বিদূ। মদের গন্ধে কি বেদ থাকতে পায়? অত ঝঞ্ঝাটে কাজ কি?—এই নাও আমি তোমার পায়ে পড়ছি (চেটীর পায়ে পড়িতে উদ্যত)

নবমল্লি। আহা! কর কি! কর কি! উঠ উঠ, রাগ করনিত? একটুখানি ঠাট্টা করলুম বইত' নয়?

বিদূ। এখন বাপু ছেড়ে দেও, না না রাগ করিনি।

(প্রস্থান)

—ঃওঁঃ—

নীরব প্রেম।

(লংফেলো)

প্রেমের সন্ধানে যদি কেহ ফিরে।
ভালবেসে যাক চিরকাল তরে॥
কেবলি কথার না বাড়ায়ে রাশি।
আমি তোরে বড়—বড় ভালবাসি॥
নীরব ভাবের প্রেমেতে রাজত্ব।
অভাবে কি কষ্ট—প্রেমেরি এ তত্ত্ব॥

মজঃফরনগর }
২রা বৈশাখ, ১৩১৭। }

—ঃওঁঃ—

সপ্তদশ আলাপ —প্রকৃতি। *

(সমালোচনা।)

অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় "প্রকৃতি" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই পুস্তকের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, এই কথা শুনিলে অনেকেই আমাদিগকে উপহাস করিতে ছাড়িবেন না তাহা জানি। তাই প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে, আমরা বাস্তবিক তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করিতে আসি নাই; কিন্তু পুস্তকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে বলিয়া সমালোচনার নামে তাহার গুণবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি;—তবে যদি অল্প বিস্তর মতভেদ ঘটে, তাহাও এই অবসরে বলিয়া লইব।

এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া সম্প্রতি স্থায়ী আকার প্রাপ্ত হওয়াতে, বিজ্ঞান-পিপাসু মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবে। রামেন্দ্র বাবু যেরূপ বিজ্ঞানবিশারদ, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে যে এরূপ প্রবন্ধ সকল প্রসূত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্চর্য্য হই নাই। আমরা ইহাতেই আশ্চর্য্য হইতেছি যে, তিনি ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সেই সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের "দীনা বঙ্গভাষায়" এত সরল ও সরস ভাবে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ সুমিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই আছে, এ কথা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার বক্তব্য

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে লিখিত।

বিষয়গুলি সুন্দর রূপে আয়ত্ত করিয়া তবে লিখিয়াছেন; এবং এই কারণেই সে গুলি এত প্রাঞ্জল ও সরস হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবু প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি এত প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্বগুলির বিষয় কিছু জানেন শোনেন তাঁহারাই এই পুস্তকে তাঁহাদের জ্ঞানপিপাসা বহুল পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিয়া রামেন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রবন্ধগুলি যেমন এক দিকে বৈজ্ঞানিক, অপর দিকে তেমনি কবিত্বপূর্ণ। বোধ হয়, এই বিষয় আমি ঘোষণা না করিলেও গ্রন্থের নামেই তাহা পাঠকগণের নিকট সুব্যক্ত হইবে। "প্রকৃতি" নাম এক দিকে কঠোর বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্লেষণগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়, অপর দিকে মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল হস্তের সাক্ষ্য-স্বরূপ এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশে বিধৃত এই শোভনসুন্দর জগতের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাঁহার প্রবন্ধগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি আবার নানাবিষয়ক। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে এক দিকে জ্যোতির্বিস্থার, অপর দিকে জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। এক দিকে তিনি যেমন সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, প্রাচীন জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে লিপিকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে পৃথিবীর বয়স, ক্লিফোর্ডের কীট, মৃত্যু প্রভৃতির ব্যাখ্যাকালেও তাঁহার সিদ্ধহস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। লিপি-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে গবেষণার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার পরিশ্রমের ফলে অনেক

নূতন তথ্য সহজে জানিতে পারিতেছি। তাঁহার "আকাশতরঙ্গ" প্রবন্ধটি পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা গুরুতর বিষয় সকল বুঝান তাঁহার কেমন আয়ত্ত। আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে "প্রকৃতির" একটি প্রবন্ধ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি—সে প্রবন্ধটি হর্ম্মান হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্‌। এই সুপ্রসিদ্ধ জর্মান পণ্ডিত যে কিরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, এবং তিনি একাকী মহারথীর ন্যায় বিজ্ঞানরাজ্যের কত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রবন্ধটী না পাঠ করিলে বঙ্গীয় পাঠক, বোধ হয়, সহজে ধারণা করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানক্ষেত্রের প্রায় এমন অংশ ছিল না যাহাতে তিনি হলচালনা করেন নাই, এবং যাহা হইতে তিনি নূতন সত্য সকল আবিষ্কার করেন নাই। ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ব্যক্তিও জ্ঞানার্জ্জনে অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা করা যায়। "জ্ঞানের সীমানা" পাঠ করিয়াও আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিজ্ঞানের যে যে বিষয়ে যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সিদ্ধান্তরূপে সর্ব্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহাদের সেই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা এই প্রবন্ধ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন।

প্রাচীন জ্যোতিষ বিষয়ক দুইটী প্রবন্ধে আমরা তাঁহার পক্ষপাতরাহিত্য দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে পক্ষপাত একেবারে পরিত্যাজ্য। যেখান হইতে বৈজ্ঞানিক সত্য পাইব, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিব, এইরূপ মূলমন্ত্র করিলে তবে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। এই দুইটী প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন

যে, সত্যের প্রতি ভারতের পূর্ব্বের ন্যায় আকর্ষণ না থাকাতে আমাদের গণনায় কিরূপ ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইতেছে। আমরা এখন সত্য দেখিতে পাইলেও পুরাকালের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি-বশতঃ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি না, ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। কারণ, যে পুরাকালের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি দেখাইতেছি, সেই পুরাকালের লোকেরা এ বিষয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই বিষয়ে বঙ্গের যে সকল কৃতবিদ্য সন্তান হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা "মৃণ্ময়ীর" লেখকের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। স্বদেশের প্রতি ভক্তির আধিক্যবশতঃ তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক গতির বিষয় আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে, এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥—আর্য্যসিদ্ধান্ত

আমরা যখন এই শ্লোকটি প্রথম দেখি, তখনই আমাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, এই শ্লোকটি পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক গতিবিষয়ক নহে, পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনবিষয়ক। কিন্তু সমগ্র আর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্র আমাদিগের অধীত না থাকাতে সে বিষয়ে কিছুই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু সম্প্রতি রামেন্দ্রবাবু পক্ষপাতরহিত হইয়া আমাদের সন্দেহ মিটাইয়া দিয়াছেন যে, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক গতির বিষয়ে উল্লেখ নাই। এইরূপ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার পূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করিলে তবেই আমাদের প্রকৃত

আর্য্যত্ব বজায় থাকিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বলিয়া রাখি যে, বর্ত্তমানকালে এক সম্প্রদায়ের লোকে উল্টা দিকে যাইয়া প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে সত্যমাত্রও দেখিতে কুণ্ঠিত হন; কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অসঙ্গত। রামেন্দ্র বাবু উভয় দিক বজায় রাখিয়া প্রাচীন ও নবীন উভয় শাস্ত্র হইতেই সত্যগ্রহণের চেষ্টা করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃত আর্য্যত্বের (আর্য্যামীর বা সাহেবিয়ানার নহে) পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা "প্রকৃতির" কোন্ প্রবন্ধটি ছাড়িয়া কোন্ প্রবন্ধের প্রশংসা করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, রামেন্দ্র বাবুর এই পুস্তকখানি বিজ্ঞানগ্রন্থ হইলেও কঠোর নীরস হয় নাই, প্রত্যুত কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। এই কবিত্ব কেমন এক প্রকার ছায়াময় কবিত্ব, অতৃপ্তির কবিত্ব। সমস্ত পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির ভাব, আতঙ্কের ভাব দুঃস্বপ্নের মত অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত কথায় বুকের উপর চাপিয়া নৃত্য করিতে চাহে। যখন তিনি শেষপ্রবন্ধে প্রলয়ের ভীষণ প্রতিকৃতি দেখাইয়া উপসংহারে বলিলেন—"পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুইবেল তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন, ভয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমণ্ডলী এক রকম একবাক্যে বলিতেছেন, ভরসাও নাই"—এ কথা পড়িয়া আমাদেরও কেমন এক আতঙ্ক আইসে, শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় মন শুকাইয়া যায়। আমাদের মনে হয় যে তবে কেন বৃথা এত অধ্যয়ন অধ্যাপন, বৃথা এত অর্থচেষ্টা এবং বৃথাই এত স্বার্থত্যাগ। রামেন্দ্র বাবুও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় যেন একপ্রকার ছায়াময়

আবরণের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে যেন কি একটা "ভরসা নাই" এর ভাব, সুতরাং অতৃপ্তির ভাব জাগিয়া আছে, এবং আমরাও তাহার অংশ পাইয়া চারিদিক আরও অন্ধকার দেখিবার উদ্যোগ করি—আমাদের সেই আতঙ্কের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, অন্তরের কথা অন্তরেই থাকিয়া যায়। এই অতৃপ্তির ভাব, আমাদের বোধ হয় কঠোর বিজ্ঞানালোচনার ফল। বিজ্ঞানরাজ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই আরও অধিক রাজ্য আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা হয়, সুতরাং অতৃপ্তি আসা স্বাভাবিক; এবং আমাদের ইহাও বোধ হয় যে, এই প্রকার অতৃপ্তির ভাব অন্ততঃ আংশিকরূপে না থাকিলে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য রাশি রাশি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা দুরূহ হইয়া উঠে।

এইবারে রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমাদের একটি মতভেদের উল্লেখ করিব। রামেন্দ্র বাবু বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে মতভেদের কথা নহে, কিন্তু তিনি তাঁহার "জ্ঞানের সীমানা" প্রবন্ধে যেখানে জড়বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয় জড় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আত্মবিজ্ঞানে গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের কিছু মতভেদ হইতেছে। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন "পাপ আর পুণ্য এই দুইটী কথা লইয়া চিরকাল আন্দোলন চলিয়াছে। * * * তর্ক বিবাদ রক্তপাত কতই না এই তথ্য উদ্ঘাটনপ্রয়াসের ফলস্বরূপ। ডারুইনের নিকট উত্তর পাইয়াছি। প্রাচীন হিন্দু উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন। * * * কথাটা বড়ই গুরুতর, এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা বিড়ম্বনা।" রামেন্দ্র বাবু যদি এই পর্য্যন্ত বলি-

স্নাই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোনই বক্তব্য থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহার পরে পাপপুণ্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারুইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসরণ করিয়া আরও কিছু বলিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম আমরা তাঁহারই কথায় দিতেছি—"সনাতন ধর্ম্ম নাই সনাতন পাপ নাই। সমাজ-জীবন যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম; সমাজজীবন যাহাতে রক্ষা পায় না তাহাই অধর্ম্ম। সমাজজীবন রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তি-জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। এই উৎসর্গ ধর্ম্ম; এই উৎসর্গ না করিলে পাপ হয়। ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমার সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সমাজজীবন রাখিতে হইবে; ধর্ম্মসাধন করিতেই হইবে।"

রামেন্দ্র বাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা ইঙ্গিতমাত্রে বলিব। * এমন যদি কোন কার্য্য উপস্থিত হয়, যাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, আমি তাহা করিব কি না? সমাজের তাহাতে উপকার হইবে কি না ঠিক করিয়া বলা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। প্রত্যেক কার্য্যে সমাজের সুদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে কাহার সাধ্য যে গণনা করিয়া ঠিক বলিতে পারে? আর আমিও যখন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত একজন, তখন সহজেই আমার ধর্ম্মজ্ঞানকে সান্ত্বনা দিব যে, ইহাতে সমাজের মঙ্গল হই-তেই পারে না, সুতরাং এ কার্য্যে আমার নিরস্ত থাকাই শ্রেয়—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইহাই ক্রমশঃ মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

* এই বিষয়ে আমার প্রণীত "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ" গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি।—লেখক

রামেন্দ্র বাবু যে "ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম" বলিয়াছেন, এই কর্ত্তব্য কথার বল ও অধিকার থাকে কি প্রকারে? একটী দৃষ্টান্ত দিই—আমি একটী বৈজ্ঞানিক অথবা আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিলাম। কিন্তু সেই সত্য অবলম্বন করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে গেলে দেখি যে, আমাকে বিবিধ ক্ষতি অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হইবে। আমি তাহা অবলম্বন করিব কি না? রামেন্দ্র বাবুর মত শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিলে দেখি যে, আমার সত্যপ্রচার কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এই সত্য অবলম্বন করিলে আমার জীবন রক্ষা হয় না; আবার আমার দেখাদেখি অপরে অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগরও জীবন রক্ষা হয় না—সুতরাং সেই সত্য অবলম্বন করিলে সমগ্র সমাজের জীবন রক্ষা হয় না; অতএব তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইহাই রামেন্দ্র বাবুর অথবা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতের উপসংহারে আসিয়া পড়ে না কি? কিন্তু ইহার বিপরীতে, আমাদের যদি সত্যের উপর অটল নিষ্ঠা থাকে, যদি আমার মনে এই দৃঢ় ধারণা থাকে যে, সত্যপ্রবর্ত্তক ভগবান্ মঙ্গলময়, তাঁহার সত্য প্রচার বা অবলম্বন করিলে পরিণামে মঙ্গল হইবেই হইবে, তবেই কেমন একটা সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়, তবেই আমরা সত্যের জন্য কেমন অটল সাহসের সহিত প্রস্তুত হইতে পারি, এবং তবেই সেই সত্য-প্রচারে আমার ইষ্ট, তোমার ইষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও ইষ্ট সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

আমরা যে রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করি, তাহা কি সমাজের জীবন-রক্ষা ভাবিয়া? কর্ত্তব্য বলিয়া, ধর্ম্ম বলিয়াই তাহা করি। অনেক সময়ে হয় ত রোগসেবা সমাজরক্ষার প্রতিকূলেও যাইতে

পারে। যে রুগ্নব্যক্তির বাঁচিবার আশা নাই, তাহার সেবা করিতে গেলে এই ভীষণ জীবনসংগ্রামে রোগসেবকদিগকে নিশ্চয়ই অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি তাহার সেবা ধর্ম্ম বলিয়া আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি এইরূপ পরিত্যাগ করিবার প্রথা থাকিত, তবে সংসার কি নীরস মরুভূমিতে পরিণত হইত, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প হয়। এই ধর্ম্মের কি অপরিবর্ত্তনশীল ও সাধারণ মানবের অগম্য, সমাজ-জীবন-রক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্ম গণনার অতিরিক্ত কোন দৃঢ়তর ও উচ্চ-তর ভিত্তি নাই? থাকিতেই হইবে। আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচার করিয়া দেওয়া অসম্ভব, তবে সাধারণের আলোচনার জন্য ইঙ্গিত মাত্রে এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম মাত্র। তাঁহাদের সুবিধার জন্য এইটুকু বলিয়া রাখি যে, সুবি-খ্যাত জীববিদ্যাবিশারদ ওয়ালেসও তাঁহার পুস্তকে (Natural Selection) এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি শত শত নিয়মের দ্বারাও সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়া সত্য কথা বলা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের জন্য আত্মপরিতোষের উৎপত্তি বুঝান যায় না।

উপসংহারে রামেন্দ্র বাবুর উপর আমাদের আশাভরসার দুই চারিটী কথা বলিব। তিনি অবশ্য তাঁহার পুস্তকে আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।" আমরাও তাঁহার এই দুঃখের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমাদের কি ইহা কম আশার কথা যে, রামেন্দ্র বাবু প্রভৃতির ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আমাদের মাতৃ-

ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ? ইংরাজদিগের মধ্যে যদি হক্সলি, স্পেন্সর প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিগণ ইংরাজী ভাষাকে এত সমুন্নত না করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহারা কিসের গৌরব করিতেন ? তেমনি আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন বলিয়াই আমরা আজ গৌরব করিতেছি যে, ভারতের সকল ভাষার মধ্যে বঙ্গভাষা সমধিক পরিপুষ্ট। বিশেষতঃ আজ কাল কয়েক ব্যক্তির প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া বঙ্গভাষার ও বঙ্গ সাহিত্যের মৌলিকতা ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সমধিক আশান্বিত হইতেছি। তন্মধ্যে পুনবায় উল্লেখ করিতেছি যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবুর ন্যায় সিদ্ধহস্ত আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমাদের কোন বিলাতপ্রত্যাগত সুবিদ্বান বন্ধু আমার সহিত এই বিষয়ের আলাপে বলিয়াছিলেন যে রামেন্দ্র বাবুর অনেকগুলি প্রবন্ধ "নাইনটীন্থ সেঞ্চুরির" ন্যায় সাময়িক পত্রে হক্‌স্‌লি প্রভৃতির লিখিত প্রবন্ধগুলির সহিত সমান আসন প্রাপ্ত হইতে পারে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে

"প্রকৃতি" বিষয়ক সপ্তদশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

অষ্টাদশ আলাপ—প্রেম। *

(সমালোচনা)

প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। সম্প্রতি আমরা সমালোচনার্থ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানির নাম "প্রেম"; রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ। হেমেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই প্রেমিক, তাহা না হইলে তাঁহার হাত দিয়া প্রেমের এরূপ যশোগীত বাহির হইত না। গ্রন্থকার যখন প্রেমিক, তখন তিনি যে কবি, তাহা বলা বাহুল্য। পদ্যে লিখিলেই যে কবি হওয়া যায় না, এই সেকেলে ভাব এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন আনন্দের ধারা "রসাত্মক বাক্য" গদ্যে লিখিলেও আমরা লেখককে কবি বলিতে পারি। ইহাই কবির লক্ষণ ধরিলে আমরা হেমেন্দ্র বাবুকে নিশ্চয়ই কবি বলিব। তিনি এরূপ ভাবাত্মক বিষয়ে এত সুন্দর কথার সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কবি না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্বীকার করি, তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অপরের অনেক উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। হউক, কিন্তু কবি না হইলে সেই সকল পুষ্প লইয়া এমন সুন্দর মালা গাঁথিতে পারিত কে? তবে উদ্ধৃত অংশ যেন একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে সে দোষ মার্জ্জনীয়। আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে দুএকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

"জ্ঞান আত্মার শোভা। প্রেম আত্মার সৌরভ। জ্ঞান

---

*সমীরণ, ১৩১২, সাল ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বর্গীয় আলোক, প্রেম স্বর্গের সোপান। জ্ঞান পথপ্রদর্শক, প্রেমই পথ। জ্ঞান অন্ন, প্রেম রস। জ্ঞান পল্লব, প্রেম পুষ্প।"

"প্রেম অনন্তের দ্বার। প্রেমবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে। বিন্দুর অন্তরালে সিন্ধুর আভাস পাইবে। সিন্ধু ও বিন্দুর একতার তাৎপর্য্য প্রেমের অভিধানেই মিলে।"

এই শেষ অংশে লিখিত প্রেমের উদার ও কেন্দ্রগত ভাবের প্রতিধ্বনি নূতন জগতের কবিশ্রেষ্ঠ ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রত্যেক কবিতায় দেখিতে পাই। হুইটম্যান তাঁহার প্রথম কবিতা অবধিই এইভাবের মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

হেমেন্দ্র বাবুর ভাষা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ইহা সরল প্রেমের ভাষা। তিনি প্রেমিক বলিয়াই ভাষার চাকচিক্যের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি দেন নাই। হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষা। "প্রেম" গ্রন্থে প্রেমিক হৃদয়ের ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে। প্রেম সম্বন্ধে অনেক ভাব তাঁহার হৃদয়ে সুস্পষ্ট আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়াই গ্রন্থকার এত স্পষ্ট ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
"প্রেম" বিষয়ক অষ্টাদশ আলাপ সমাপ্ত।

—:০:—

ঊনবিংশ আলাপ—লর্ড বায়রণ। *

মানবের জীবন দুই ভাবে চলিয়া যায়—এক, যেমন যাইতেছে সেই ভাবে; দ্বিতীয়, সংগ্রামের ভাবে। আমার যদি অন্নসংস্থান থাকে, আর যদি আমি নির্ব্বিরোধী হই, তাহা হইলে আমার জীবন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিন্তু যদি আমার অন্নসংস্থান না থাকে, তবে আমাকে পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং পরিশ্রম করিতে গেলেই অন্যান্য শ্রম-জীবীদিগের সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিবার খুবই সম্ভাবনা ঘটিবে। এই দ্বন্দ্বকারীদিগের মধ্যে যে যতটা আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে, সেই খুব সম্ভবত জয়লাভ করিবে। এই কারণে দ্বন্দ্ব করিতে গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়।

অন্নসংস্থানের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা দেখাইলাম যে সংগ্রাম করিতে গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হয়। অন্নসংস্থানের জন্য সংগ্রাম করা শারীরিক সংগ্রাম; এই শারীরিক সংগ্রাম ব্যতীত আমাদিগের মানসিক সংগ্রাম আছে, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আছে। আমি যদি জ্যামিতির উপপাদ্য লইয়া সংগ্রাম করি, তাহাই হইল মানসিক সংগ্রাম; আর আমি যদি পাপবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করি, তাহাই হইল আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার সংগ্রামেই সকলের সমান জয় হয় না। কেহ বা বারম্বার পরাজিত হইয়া থাকে; কেহ বা একেবারেই জয়লাভ

---

* ১২৯৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাসে লিখিত।

করে। যে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে যতটুকু প্রস্ফুটিত করিয়া যে প্রকার সংগ্রামের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকার সংগ্রামে ততই বেশী জয়লাভ করিবে।

এই যেমন প্রতি মানবের বিষয় বলিলাম, সেইরূপ এক একটী জাতির মধ্যেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলিতে পারে—বিশেষ গুণবিশিষ্ট কতকগুলি মানবের সমষ্টির নামই তো জাতি। এই জাতীয় সংগ্রামেও যে ব্যক্তি বা যে জাতি জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইবে, তাহারই জয় হইবে।

যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রথম আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন, তখন অন্নসংস্থানের নিমিত্ত প্রাচ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগকে কঠোর শারীরিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আর্য্য ও প্রাচ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত ছিলেন, যাঁহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক অন্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই জয়লাভ করিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই জাতীয় শারীরিক সংগ্রামের মধ্য হইতেই আর্য্যগণ প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইলেন।

আবার কলিযুগের প্রারম্ভে কুরুপাণ্ডবের যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাকে আমরা জাতীয় আধ্যাত্মিক সংগ্রাম বলিতে পারি। সেই সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভূমিলাভ করিবার সংগ্রাম নহে—তাহা অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জয় হইল। এই পাণ্ডবদিগের যিনি বন্ধু, সেই কৃষ্ণ তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন, তাই কবি তাঁহাকে দেবতার আসন প্রদান করিয়াছেন।

আরও আধুনিক কালে ভারতবর্ষ যখন শাক্তদিগের প্রভাবে হিংসা মদ্যপান প্রভৃতি নানা পাপাচারে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে চৈতন্যদেব অহিংসা-সংগ্রামের, প্রেম-সংগ্রামের উন্মাদক জয়ধ্বনিতে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক সংগ্রামকালের সঙ্গে সঙ্গে এক এক কবিসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের কবিগণ উঠিলেন, দ্বিতীয়োক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের ব্যাসগণ উঠিলেন; শেষোক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় ভারতবর্ষকে, বিশেষত বঙ্গদেশকে, কোমলতার অমৃতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

এইবারে একবার ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানেই বা কি প্রকার নিয়ম। সেখানে শারীরিক সংগ্রাম অনেক হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে অনেক সাময়িক কবিও প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেখানে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বীজ পড়িতেছে মাত্র, সুতরাং সেবিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করিব না। কিন্তু ইউরোপে মানসিক সংগ্রাম বহুদিন যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এলিজেবেথের রাজত্বকালে এক বিরাট মানসিক সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিছু পূর্ব্বে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সমস্ত ইউরোপে এক আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন—সকলেরই মনে নূতন ভাব, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এদিকে আবার স্পেনের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডের শিরায় শিরায় স্বাধীনতার খরস্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; এমন কি, এই স্বাধীনতার উত্তেজনাতেই, যখন

স্পেনের রাজা পোপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক মহতী নৌ-সেনা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, তখন নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ অতি অল্পমাত্র সৈন্যের দ্বারা সেই মহতী নৌসেনাকে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন ; অবশ্য অন্যান্য কারণও তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। এইরূপে তখন সমস্ত ইংরাজ জাতির মধ্যে এক প্রবল মানসিক সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই মানসিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্য সকল প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ডে এমন ঘোরতর মানসিক সংগ্রাম বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই—পরে আর একবার হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় সংগ্রামের ফলেই খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয় হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই তুমুল মানসিক সংগ্রাম সমস্ত ইউরোপকে একেবারে উন্নত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সংগ্রামের সূত্রপাত হয় ফরাসিবিপ্লব হইতে। ফ্রান্সের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা প্রজাদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। সেই অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ উন্মত্ত হইয়া শেষ রাজা ষোড়শ লুইর মস্তকচ্ছেদন করিল। ক্রমে ফরাসিগণ পুরাতন যাহা কিছু তাহাই নষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ভাব নূতন প্রণালী স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। ফরাসিবিপ্লব শারীরিক সংগ্রাম হইতে মানসিক সংগ্রামে পরিণত হইল এবং সেই সংগ্রামের ভাব সমগ্র পৃথিবীতে রোপণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে ফ্রান্সের মানসিক সংগ্রামের তরঙ্গ ইংলণ্ডের উপকূলে অনায়াসে পৌঁছিতে পারে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান থাকাতে ফ্রান্সের শারীরিক সংগ্রাম ইংলণ্ডকে ততটা স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু মানসিক সংগ্রামের ভাব মুদ্রাযন্ত্র থাকিতে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা বৃথা। যাই হউক, এই দ্বিতীয় মানসিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে অনেকগুলি কবির উদয় হইয়াছে—ষেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি। ইহাঁদিগের সকলেরই কবিতার মধ্যে এক প্রকার বিশেষ সাংগ্রামিক ভাব আছে। এই সাংগ্রামিক কবিদিগের মধ্যে বায়রণ কিছু অতিরিক্ত ধ্বংসপ্রিয়, ষেলি অপেক্ষাকৃত মধ্যপথাবলম্বী এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ রক্ষণশীল।

এখন আমরা প্রথমে বায়রণকেই সম্মুখে আনয়ন করি। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বায়রণ সাংগ্রামিক এবং কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধ্বংসপ্রিয় ছিলেন। ধ্বংস বিষয়ে তিনি একজন মহারথী ছিলেন—একাকীই সমস্ত জাতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান। একাকী সমস্ত জাতির বিপক্ষে—ইহা কম সাহসের কথা নহে। আবার তিনি সাংগ্রামিক কেবল লেখায় নহেন, কথায় নহেন, কার্য্যেও বটে। তিনি আপনার কার্য্যকলাপেও এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কোন কার্য্যেই আইনকানুন মানিয়া চলিতেন না—কোন প্রকার বদ্ধভাব তাঁহার ভাল লাগিত না। বেনিস রাজ্যে সামাজিক বন্ধন কিছু কম বলিয়া তাহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকার ঔদ্ধত্য পরিশেষে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারে লইয়া গিয়া অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল।

বায়রণের সমসাময়িক ইংলণ্ডের অবস্থা তাঁহার সাংগ্রামিক ভাব উত্তেজিত করিবার পক্ষে সহায় হইয়াছিল। সেই সময়ে

বাহির হইতে ফরাসিবিপ্লব নির্বীর্য্যকেও বীর্য্যবান করিয়া তুলিতেছিল; ভিতরেও পিউরিটানদিগের বাঁধাছাঁটা সংযত নিয়মের সঙ্গে যুবরাজ চতুর্থ জর্জের নেতৃত্বে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের অশ্লীল বিলাসিতার তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। বায়রণের সংযম ভাল লাগিল না; তিনি অশ্লীল বিলাসিতার নিতান্ত অশ্লীল ভাগটুকু বাদ দিয়া বিলাসিতাকে খেয়ালের (sentimental) চক্ষে দেখিয়া ভ্রমপূর্ব্বক বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ গতি ভাল লাগিবার কারণ এই যে ইহাতে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্যত অস্ত্রধারণ করা হয়।

যাই হোক, বায়রণের কবিতায় এইরূপ সাংগ্রামিক ভাব থাকাতেই তাঁহার সময়ে তিনি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন—তখন কেবল ইংলণ্ডে নহে, সমস্ত ইউরোপে যে এক বিরাট বিধ্বংসিভাব রাজত্ব করিতেছিল। বায়রণ তাঁহার 'ডন জুয়ান'এর (Don Juan) প্রথম দুই সর্গ যখন প্রকাশিত করিলেন, তখন তাঁহার যশ দিগ্বিদিকে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া চলিল; এমন কি, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে "আমি একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গেই দেখি যে আমি বিখ্যাত হইয়াছি।" শোনা যায় যে কয়েক মাসের মধ্যে ন্যূনাধিক লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে বায়রণের কবিতা অশ্লীলতাপূর্ণ এবং ছেলেমানুষী রকমের—তাহা কবিতাই নহে। আমরা অবশ্য তাঁহার দোষ সমর্থন করিব না; কিন্তু এত অল্প সময়ে এত অধিক পুস্তক মুদ্রিত হইতে দেখিলে হৃদয়ে কি এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না যে, লক্ষাধিক লোকে বায়রণের কবিতার কোন্ গুণে মুগ্ধ হইল? ইহাও কি সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, এতগুলি লোক হৃদয়ে অশ্লী-

লতাসর্পকে পোষণ করিবার জন্য বায়রণ পড়িত? তাহারা নিশ্চয়ই বায়রণের কবিতার মধ্যে মুগ্ধ করিবার মত কোন কিছু পাইয়াছিল। তাহা কবিত্ব—সরলতার কবিত্ব ও সবলতার কবিত্ব।

সরলতারই বা কবিত্ব কি, আর সবলতারই বা কবিত্ব কি? একজন লোকের সরলতা দেখিয়া আমাদের হৃদয় কেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সরলতার মধ্যে এক বিশেষ মাধুরী—কবিত্ব আছে, যাহার জন্য আমরা সরলতাকে এত ভালবাসি। এই কারণে আমি পল্লীগ্রামবাসীদিগকে এত ভালবাসি; এই কারণে আমি বসন্তের প্রভাতে কোকিলকুহরিত মুক্তগগন ও সুগন্ধসেবী মুক্ত মলয়বায়ুকে এত ভালবাসি। সেইরূপ সবলতার মধ্যেও এক অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে। সেই কবিত্ব আছে বলিয়াই সেই মার্কিন সৈনিককবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে আমি এত ভালবাসি। যদিও প্রবল ঝটিকা বৃক্ষ অট্টালিকা প্রভৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়, তথাপি সেই কবিত্ব আছে বলিয়াই ঝটিকার সবল স্পর্শলাভ করিতে আমি এত ভালবাসি। যদিও ভূমিকম্প অভাবনীয় দারুণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে থাকে, তথাপি সেই সবলতার কবিত্ব আছে বলিয়াই ভূমিকম্পের মধ্যেও এক সভয় আনন্দনৃত্য অনুভব করি।

মাথু আর্ণল্ড (Mathew Arnold) বলেন যে কবিতার কার্য্যক্ষেত্র দুই—বহির্জগত ও অন্তর্জগত। কোন কবিতা বহির্জগতের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে সপ্রয়াস; কোন কবিতা বা অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে সপ্রয়াস। এখানে একটী কথা এই যে অন্তর্জগতের যে কোন ভাব কবিতায় একটু স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিলেই তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়—তাহার কারণ, অনেকেরই কাছে অন্তর্জগতের ভাবসকল এক রহস্যময়। বায়-

রণের কবিতা বহির্জগত সম্বন্ধেও আছে, অন্তর্জগত সম্বন্ধেও আছে। তাঁহার বহির্জগতের কবিতায় সবলতা আছে। তাঁহার অন্তর্জগতের কবিতায় সরলতা আছে এবং সরলতায় সবলতা আছে।

প্রথম প্রকারের কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি। বায়রণ গ্রীসের দুরবস্থা এবং গ্রীকদিগের স্বাধীনতালাভের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়া গ্রীকদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন —কেমন বলিষ্ঠ ভাষায়—

Approach, thou craven crouching slave
Say, is not this Thermopylœ ?
These waters blue that round you have,
Oh servile offspring of the free—
Pronounce, what sea, what shore is this ?
The gulf, the rock of Salamis ?
These scenes, their story not unknown,
Arise, and make again your own ;
Snatch from the ashes of your sires
The embers of their former fires ;
And he who in the strife expires
Will add to theirs a name of fear,
That Tyranny shall quake to hear,
And leave his sons a hope, a fame,
They too will rather die than shame ;
For freedom's battle once begun

Bequeath'd by bleeding sire to son,
Though bafled oft, is ever won.

ইহার প্রত্যেক কথা কি গ্রীকদিগের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় গিয়া বিদ্ধ হইবে না? বায়রণ একটী হ্রদে ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া কেমন সুন্দর বলিয়াছেন—

* * * let me be
A sharer in thy fierce and far delight,
A portion of the tempest and of thee!

এই দুইটী ছত্র পড়িয়া আমরা ঝড়ের উন্মত্ত নৃত্য কেমন উপলব্ধি করিতেছি এবং ঝড় দেখিয়া কবির ঝড়ের অংশ হইবার ইচ্ছা কেমন সুন্দররূপে অনুভব করিতেছি—ইহাতে কেমন সবল ভাব!

দ্বিতীয় প্রকারের—অন্তর্জগতের কবিতা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার কবিতার অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আপনার অত্যাচার অনাচারের কথা কিম্বা সেই অনাচারজনিত কুফলের কথা, কোন বিষয়ই লুকাইয়া রাখিতে যান নাই। দু একটী ছত্র উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ যে তাঁহার সরলতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন,তাহার আশা করি না, এই কারণে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। বায়রণের কবিতা যে এই সরলতা ও সবলতার কবিত্বগুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

বায়রণের কবিতা তাঁহার সমসাময়িক লোকের ভাল লাগিবার আরও একটী কারণ ছিল। বায়রণ একজন ধনীসন্তান হইয়া যে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে লিখিতেন এবং কার্য্যও করিতেন, তাহাও

তাঁহার খ্যাতির অন্যতম কারণ। তখন সকলেই প্রচলিত বাঁধা-ছাঁটা নিয়মের অধীনে থাকিয়া মৃতপ্রায় হইতেছিল, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কেহই কথা কহিতে সাহস করে নাই; সেই চলিত প্রথার বিরুদ্ধে কথা উঠিয়াছে এবং কার্য্য হইতেছে এবং সেই সকল বিষয়ে নেতা হইয়াছেন লর্ডদিগের একজন—এই কারণেও সকলেই উৎসুক হইয়া বায়রণের কবিতা পড়িতে লাগিল।

এইবারে বায়রণের কবিতার দোষের কথা দু একটী বলা যাউক। তাঁহার কবিতার প্রধান দোষ দুইটী—কোমলতার অভাব এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলতা। এই দুইটীরই মূল কারণ বলিতে গেলে একই—গৃহে অশান্তি। বায়রণ শৈশবকালাবধি কাহারও নিকট প্রকৃত ভালবাসা প্রাপ্ত হন নাই। শৈশব কালে তাঁহাকে মাতার নিকট বিশেষ অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। পরে যৌবনকালে তিনি যাঁহাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার সহিত মনের মিল হইল না। এদিকে আবার যখন তাঁহার প্রথম রচনা (Hours of Idleness) প্রকাশ করিলেন, তখন কোন সমালোচক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এক পত্রিকায় রচনার গুণের দিকে মোটেই লক্ষ্য না রাখিয়া দোষের ভাগ লইয়াই এক তীব্র সমালোচনা বাহির করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার মন যে বিকৃত ভাব ধারণ করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ইহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ঘৃণা না হইয়া বরং তাঁহার জন্য দুঃখ হওয়া উচিত। এই সকল কারণে তাঁহার প্রীতি কোমলতাশূন্য হইয়া অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইল; তাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল গৃহমুখী না হইয়া কিছু অতিমাত্রায় বহির্মুখী হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারে চলিয়া অনেক দিন পরে বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-

সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে এবং চঞ্চলতায় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় মানবের প্রেম চরিতার্থ হয় না। তাই তিনি বড়ই অবসন্ন স্বরে বলিতেছেন—

Alas ! our young affections run to waste,
Or water but the desert ; whence arise
But weeds of dark luxuriance, tares of haste
Rank at the core, though tempting to the eyes,
Flowers whose wild odours breathe but agonies,
And trees whose gums are poison ; such the plants
Which spring beneath her steps as passion flies
O'er the world's wilderness,and vainly pants
For some celestial fruit forbidden to our wants·

শেলি, বায়রণ এবং ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, এই তিন কবির কবিতায় সাধারণ ভাবে যেমন সাংগ্রামিক ভাব বিগুমান দেখি, সেইরূপ ব্যক্তিগত ভাবও দেখিতে পাই। এই তিন কবিই আপনাদিগের কবিতায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন; আপনাদিগেরই কথা, আপনাদিগেরই প্রেম, আপনাদিগেরই অতৃপ্তি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক কথায়, তাঁহারা স্বয়ংই কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই কবিগণের মধ্যে বায়রণ সর্ব্বাপেক্ষা আত্ম-

হায়া। এই কারণে বায়রণের কবিতা সারল্যপূর্ণ, এবং এই কারণেই তাঁহার কবিতায় আমরা অনেক স্থলে চঞ্চল বিলাসভাব, অনেক স্থলে বীরত্বের উচ্ছ্বাস এবং (দুঃখের বিষয়) দু একটী স্থলে অশ্লীলতা দোষও দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,বায়রণ স্বাধীনতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাক্রমে স্বেচ্ছাচারের পথে গিয়াছিলেন; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, স্বেচ্ছাচার অনাচার করিতে করিতে অতৃপ্তিও অনুভব করিয়াছিলেন। এইরূপ অতৃপ্ত হইয়া, অতৃপ্তির উপাদান কারণ স্ত্রীলোকের প্রতিও যে বায়রণ দুএকটা কটুকথা বলিতে বিরত হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি বলিতেছেন—

Yea ! none did love—not his lemans dear—
But pomp and power alone are woman's care,
* * * *
Maidens, like moths,are ever caught by glare
And Mammon wins his ways where seraphs
might despair.

তিনি বলিতেছেন যে তাঁহাকে কেহই ভাল বাসে নাই; তিনি নিজে যখন কাহাকেও স্থির প্রেম দিতে পারিলেন না, তখন অন্যের নিকটে কিরূপে স্থির প্রেমের আশা করিলেন, তাহা বুঝি না।

যাহাই হউক, বায়রণ যদি তাঁহার ক্ষমতা কেবল ভাঙ্গনের কাজে না লাগাইয়া গঠন কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে জগতের কত উপকার হইত! কেবল ভাঙ্গনের দিকে গিয়া অবশেষে আপনিই অকালে ভাঙ্গনের স্রোতে পড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বায়রণের দোষ প্রদর্শন বা তাহার সমর্থন আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে মোটের উপর বায়রণ একজন যথার্থ কবি ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতার মধ্য হইতে অশ্লীল অংশ পরিত্যাগ করিলেও অতি উচ্চ অঙ্গের অনেক কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। সজ্জনের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ভাল-মন্দে মিশ্রিত বস্তু হইতে মন্দভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভালটুকু গ্রহণ করেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
লর্ড বায়রণ বিষয়ক উনবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

বিংশ আলাপ—বাল্মীকির বিষাদোচ্ছ্বাস। *

অমাবস্যা তিথি। রক্তবসনা সন্ধ্যা দিবসের সমুদয় পাপ বহন করিয়া পবিত্র হইবার ইচ্ছায় সাগরে অবগাহন করিতেছে। সন্ধ্যার বিরহে দিগঙ্গনাগণ পূরবী রাগিণীতে বিরহের গীত গাহিয়া জগতের অশ্রু ঝরাইতেছে এবং দুএকটী নক্ষত্র সেই সুমধুর গীত শুনিবার নিমিত্ত এধারে ওধারে মিটিমিটি চাহিতেছে। এই গীত শুনিয়া সমস্ত বিহগ শান্তিলাভের প্রত্যাশায় আপন আপন কুলায় অন্বেষণ করিতে চলিয়াছে; কেবল একটী সুবিস্তীর্ণ গহনকাননের অভ্যন্তরে এক ক্রৌঞ্চমিথুন এখনও সোহাগের মায়ায় ভুলিয়া আছে। এতটা ভ্রমের ফল শোক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঘর্ম্মাক্তকলেবর কৃতান্তসদৃশ দুই শবর চুপে চুপে—অতিচুপে—নিকটে আসিয়া সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি দুই নিষ্ঠুর শর হানিল। গহন কানন ক্রৌঞ্চপত্নীর শোকের করুণতানে প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল। একটা শর ক্রৌঞ্চের প্রেমপূর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে, অপরটী লক্ষ্য অতিক্রম করিয়াছে। কেন সেই শরটা ক্রৌঞ্চীকেও ভেদ করিল না? কেন তাহারা একটীকে ইহজগত হইতে বিদায় দিয়া অপরটীকেও দিল না? আহা! ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কত না কাঁদিতেছে! বাতাস তরুলতার নিকট ক্রৌঞ্চীর বিরহের কথা বলিয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছে। সূর্য্যদেবও এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখিবার ভয়ে অগ্র হইতেই অদৃশ্য

* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত।

হইয়াছেন। ফুলেরা তরুলতার নিকট শোকের সেই কাহিনী শুনিয়া অবনতমস্তক হইয়া অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। চন্দ্রমাও আজ রক্তপাত দেখিবার ভয়ে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন। প্রকৃতি যখন হিংসার বিপক্ষে এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারে, তখন মনুষ্যের হৃদয় হিংসাতে না জানি আরো কত কষ্ট অনুভব করিবে!

দূরেতে—সেই কাননের দূর অভ্যন্তরে—দস্যুদলপতি বাল্মীকি সঙ্গীবিহীন হইয়া আনমনে ঘুরিতেছিলেন। আজ এই নিস্তব্ধ অমাবস্যা রাত্রে সহসা তিনি আপনার হৃদয়ের কলুষিতভাব অস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া পাগলের মত চঞ্চল হইয়া ঘুরিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে ক্রৌঞ্চীর করুণতান প্রবেশ করিল; তাঁহার হৃদয় আরো চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন দিন কোন শব্দ তাঁহার হৃদয় টলাইতে পারে নাই, কিন্তু আজ তাঁহার পাষাণ হৃদয় সামান্য এক ক্রৌঞ্চীর বিলাপে গলিয়া গেল কিরূপে? অবশেষে সেই শব্দ অনুসারে আসিতে আসিতে বাল্মীকি শবরদিগের নিকটে পৌঁছিলেন। সেথায় শবরদিগের রক্তাক্তহস্তে মৃত ক্রৌঞ্চ দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চীর সেই আর্ত্তস্বর কানের কাছে শুনিয়া একেবারে জল হইয়া গেলেন—"অশনি গলিয়া গিয়া হইল অশ্রুজল।" তিনি আজ প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন; তিনি আজ প্রেমের বিরহে যাতনা অনুভব করিয়া বিরহীর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। তাই আজ ক্রৌঞ্চীর বিরহে আপনাকেও বিরহী বোধ করিয়া তাহার যাতনা অনুভব করিতেছেন, মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছেন। এই দারুণ বেদনা সহ্য করিতে করিতে সহসা তাঁহার হৃদয় হইতে দেববাক্য বাহির হইল

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥"

শোকের দারুণ উচ্ছ্বাস তাঁহার মুখে শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, "একি ভাষা বলিলাম; কোথায় ইহা শিখিলাম?" তিনি একটা অপরিচিত ভাষায় আপনার হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু জানেন না যে কি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলেন! এই শোকোচ্ছ্বাস হইতেই তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। এই সময় তাঁহার জ্ঞান হইল যে এতদিন তিনি দস্যুদলপতি হইয়া আপনার কি অহিতসাধন করিয়াছেন। তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই তপস্যার বলে, যিনি এককালে দস্যুদলপতি ছিলেন, আজ তিনি মহামুনিপদে বরিত হইয়াছেন এবং "যতদিন আছে রবি, যতদিন আছে শশি" ততদিন জগত এই মহামুনির পদতলে অবনতমস্তক হইবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
বাল্মীকির বিষাদোচ্ছ্বাস বিষয়ক বিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

একবিংশ আলাপ—বিলাপ।*

"Go where glory waits thee
Go where fame elates thee
O still remember me!"

আয়র্লণ্ডসন্তানের হৃদয় হইতে কি গভীর ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিয়াছে! ইংরাজদিগের অত্যাচারে আইরিষগণ জর্জ্জরিত হইয়া, ইংরাজদিগের কঠোর দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হইয়া এবং স্বদেশে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালযাপন করিয়া সাশ্রুনয়নে মর্ম্মবিদারক গানে মাতৃভূমি আয়র্লণ্ডের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। মাতাও সন্তানগণের এরূপ যন্ত্রণা দেখিয়া মরমে কাঁদিয়া বিদায় দিলেন। এই বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন সন্তানগণ আপনাদিগের কষ্টে জননীর ভাবী দুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হইয়া সবর্গে সপরিবারে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাভূমি আমেরিকায় স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত হইতে লাগিল তখন মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার ক্রন্দন তখন আর মরমে বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া উছলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সন্তানগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন "বৎসগণ যথায় তোমরা ধনমান খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিবে, তথায় যাও —শতবার বলি তথায় যাও, কিন্তু তোমাদিগের এই অভাগিনী জননীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও—করিও। যখন অপরের কথা তোমাদের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইবে, তখন একবার এই দুঃখিনী

---

* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত।

মাতাকে স্মরণ করিও—করিও। শত শত মাতা তোমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিতে পারেন, শত শত বন্ধু তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারেন এবং এই দগ্ধ দেশ অপেক্ষা অন্যদেশে তোমরা অধিকতর সুখলাভ করিতে পার; কিন্তু যখন সুহৃদবর্গের নিকট আপনার অন্তর খুলিয়া দিবে, যখন অন্য দেশের সুখ অধিকতর মিষ্ট লাগিবে—হায়! আর কি বলিব? তোমাদের নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? কেবল এইমাত্র মিনতি করিতেছি যে সেই সময়ে আমাকে তোমাদিগের হৃদয়ের কোণে একটীবারও স্থান দিও—আমি তোমাদিগেরই হৃদয়ে থাকিতে ভালবাসি।”

মাতার এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অনেকে ফিরিয়া চাহিল বটে; কিন্তু সকলে সে গান শুনিতে পাইল না। যে শুনিল, সে-ই কাঁদিল এবং মাতার এই ক্রন্দনগীত তাঁহার অপর ভাইদিগকে শুনাইয়া কাঁদাইতে লাগিল। আজ পর্য্যন্ত আইরিষগণ মাতার এই করুণ বিলাপ গাহিতে গাহিতে উত্তপ্ত হৃদয় অশ্রুজলে শীতল করে এবং এই বিলাপসঙ্গীতের বলে মুষ্টিমেয় আইরিষগণ অন্তরের স্বাধীনতা-রক্ষণে সমর্থ হইয়াছে। মর্ম্মস্থান হইতে যে ক্রন্দনগীত উঠে, তাহার এইরূপই ফল হয়—তাহার এইরূপই ফল হয়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
বিলাপ বিষয়ক একবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

বিরহ। *

(বিদেশী কবিতা অবলম্বনে)

অত্যুচ্চ পর্ব্বত হতে স্রোতস্বিনী যথা
সাগরের পানে ছুটে চলে যায়।
আমার পরাণ তথা চিরকাল তরে
তব অভিমুখে উছলিয়া ধায়॥
যেথায় থাক না তুমি সেথা আমি আছি;
কাছে আছি জেনো, দূরে যদি থাকি।
সুদূর প্রবাসে যবে, তব বক্ষতীরে
আমার বুকের বাজে ধুকধুকি॥
নয়ন তুলিয়া দেখ আমি তব কাছে;
প্রাণ ভরে দেখি তব মুখচ্ছবি।
তোমায় সদাই হেরি, তব কথা শুনি;
তব আলিঙ্গন সদা অনুভবি॥
চুম্বকে যেমন টানি' লৌহে নিজ পানে
বিছায় আপন ধর্ম্ম লৌহময়।
প্রাণের মাধুরী তব ছায় সেই মত
মম চিন্তারাশি—তব প্রাণময়॥
নয়ন দুখানি যাহা হারাই বিরহে,
মনমাঝে আরো উজলিয়া উঠে।
অধরের চুমুটুকু লভিতাম কাছে,
বিরহে মাধুরী আরো তার ফুটে॥

---

* ১৯১০ খৃঃ অঃ ৮ই জুলাই লিখিত।

কর্ত্তব্য যদি বা থাকে—   করিতে হইবে
বলি', দিবানিশি পূজি না তোমায়।
সৌন্দর্য্য যদি বা তুমি   বিলাও চৌদিকে—
পূজা তারি হেতু দিই না তোমায়॥
আমার প্রাণের কথা—   যাহা আমি চাই,
আমি যাহা শুধু হৃদি মাঝে জানি—
জানিনাক কি কারণে   তোমায় অন্তরে
দেবী বলে সদা পূজি বহু মানি'॥
পাথরের বাঁধ ভাঙ্গি'   আলো দেখিবারে
তৃণগাছিখানি জেগে উঠে যথা।
সুখের স্বপন দেখি   ঘুমন্ত মানুষ
দুঃখ দিবসের ভুলে যায় যথা॥
আমার পরাণ তথা   আকুলিয়া ধায়
শুধু তোমা পানে—তোমা পানে শুধু।
দুঃখীর স্বপন তুমি   সুখভরা ওগো,
জীবনের আলো তুমি প্রাণবঁধু॥
যেথায় থাকনা তুমি   সেথা আমি আছি;
কাছে আছি জেনো, যদি দূরে থাকি।
মন দিয়া শোন তুমি--   শুনিবারে পাবে
সুদূর পরাণে বাজে ধুকধুকি॥

—:ঔঁ:—

ত্রয়োবিংশ আলাপ—বুদ্ধদেবের জীবনী। *

সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে লোকান্তরিত ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেবের জীবনী সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। রামদাস সেনের ইহাই শেষ পুস্তক। তিনি "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন, জগতকে দেখাইয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি কঠোর আয়াসসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু রামদাস সেনের পরে এ বিষয়ে আর কাহাকেও অনুসন্ধিৎসু দেখি না। লোকান্তরগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সাহিত্যের এই বিভাগে যদিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বঙ্গভাষায় তেমন কিছুই লিখিয়া যান নাই। রামদাস সেনের এই শেষ পুস্তক দেখিয়া আমাদের হৃদয় পুনরায় শোকপরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকাটী গ্রন্থের উপযুক্তই হইয়াছে। মূল গ্রন্থে যেমন গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, ভূমিকাতেও সেইরূপ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমিকাতে বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিতেছেন—"এ গ্রন্থ কোন ইংরাজী পুস্তকেরও অনুবাদ নহে, প্রবাদ বাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। * * ইহা ভূরি ভূরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হইয়াছে।

---

* ১৮১৩ শক অগ্রহায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত।

ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা অবিকৃত জীবন ও ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই জন্য অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা এই পুস্তক আমাদের অধিক আদরের বস্তু।" প্রকৃতই আমরা ইহা পড়িয়া এই কারণে সুখী হইলাম যে ইহা বুদ্ধের অপরাপর জীবনচরিতের ন্যায় কোন বিদেশীয় লেখকের অনুকরণে লিখিত নহে। এই পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের সত্যানুসন্ধিৎসার পুনঃ-পুনঃ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের আরম্ভেই গ্রন্থকার শাক্যসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্রের দিক হইতে সুন্দর যুক্তি সকল দেখাইয়াছেন। ইউরোপীয়গণ বলেন যে বুদ্ধ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামদাস সেন রাজতরঙ্গিনী হইতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন। এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধদেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। তবে টিপ্পনীতে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে কেহ কেহ বলেন রাজতরঙ্গিনীর এই নির্ণয় সম্যক শুদ্ধ না হইতেও পারে। কেননা অন্যান্য প্রমাণের সহিত এই নির্ণয়ের মিল হয় না; এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্গিনী পুস্তকখানিও বিশেষ শুদ্ধ নহে, ইহাতে অনেক ভুল আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে, এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীয় স্বীয় মতের পরিপোষক যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে "ইংরাজগণের এ নির্ণয় (খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসর

পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে) কিংমূলক তাহা আমরা জানি না"। আরও দুইএক স্থানে এই জীবনচরিতের বিশেষ নূতনত্ব দেখিতেছি। বৌদ্ধ মতের যেরূপ সুন্দর সমালোচনা হইয়াছে আশা করি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
বুদ্ধদেবের জীবনী বিষয়ক ত্রয়োবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—:ও:—

চতুর্ব্বিংশ আলাপ—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ধর্ম্মভাব।*

বর্ত্তমান কালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম অনেকেই অবগত আছেন। কাচ ও রেসম প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু সকলের সংঘর্ষণে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহা যে বিদ্যুতের সহিত একই পদার্থ, এই সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহারই অনুসন্ধানের ফলে উচ্চ অট্টালিকার যথাতথা স্থানে বজ্র পড়িয়া অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে মাটীতে নামাইয়া আনিবার জন্য গৃহে গৃহে লৌহপত্র সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান তাঁহার নিকটে অনেক ঋণী। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের (যাহা এক্ষণে যুক্তরাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ) যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা সেই সকল বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ করিতে যাইতেছি না। আমরা তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবের দু-একটী কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—তিনি যদিও পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রেসবিটীরিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাইবেলোল্লিখিত অনেক বিষয়ে তিনি সংশয়বিশিষ্ট ছিলেন। ঈশ্বর যে তাঁহাতে অভক্তিমান মানবকে অনন্ত নরকে ফেলিবেন, কিম্বা তিনি যে ব্যক্তিবিশেষকে বা জাতিবিশেষকে স্বীয় প্রিয়পাত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, এই সকল বিষয়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি রবিবারে প্রায়ই গির্জায় যাইতে পারিতেন না, কারণ সেই দিন তিনি পড়িবার অবসর পাইতেন। বলা বাহুল্য

---

* ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

যে রবিবারে গির্জায় যাওয়া প্রেসবিটীরিয়দের মতে অত্যন্ত কর্ত্তব্য। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সপ্তাহের অন্যান্য দিবসে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কেবল একমাত্র রবিবারে তিনি কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বিরোধী নানা কার্য্য করিলেও ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁহার স্রষ্টৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব ও পালকত্ব; মনুষ্যের হিতসাধনেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা; আত্মার অবিনশ্বরত্ব; ইহলোকে বা পরলোকে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের অবশ্যম্ভাবিত্ব, এই সকল বিষয়ে তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মতে এই গুলিই সকল ধর্ম্মেরই মূল কেন্দ্র। এই মতের কারণে তিনি সকল ধর্ম্মেরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতেন না—কারণ সকল ধর্ম্মেই অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের সহিত এই মূলমন্ত্রগুলির অস্তিত্ব নিশ্চিত।

সাধারণ উপাসনাস্থলে প্রায়ই যাইতে অক্ষম হইলেও তিনি তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করিতেন না। তাঁহার গির্জায় না যাইবার আরো এক কারণ ছিল। তিনি যে গির্জায় যাইতেন, সেই গির্জার আচার্য্য একদিনও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন না; কেবল স্বীয় সম্প্রদায়ের অবলম্বিত মতামত ব্যাখ্যা করিতেন, এবং বিসম্বাদী তর্কপূর্ণ বক্তৃতা করিতেন। একদিন উক্ত আচার্য্য ঘোষণা করিলেন যে পরবর্ত্তী রবিবারে বক্তৃতার জন্য বাইবেলের এই পদ অবলম্বন করিবেন—"অবশেষে ভ্রাতৃগণ! যে সকল বিষয় সত্য, ন্যায়, পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গল, সেই সকল বিষয়ের ধ্যান কর।" এই পদের উপর বক্তৃতা করিতে গেলে

আচার্য্য নিশ্চয়ই নীতিবিষয়ক নানা কথা বলিবেন ভাবিয়া ফ্রাঙ্কলিন সেই রবিবারে গির্জায় গেলেন। আচার্য্য নীতিবিষয়ক কোন কথা বলিবার পরিবর্ত্তে বলিলেন যে (১) রবিবারে কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে; (২) বাইবেল নিয়মিত পাঠ করা কর্ত্তব্য; (৩) গির্জায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক; (৪) Sacrament অনুষ্ঠান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং (৫) আচার্য্যদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ইহার পর ফ্রাঙ্কলিন আর কখনো উক্ত আচার্য্যের বক্তৃতায় উপস্থিত হন নাই।

তাঁহার মনে যখন ধর্ম্মবিষয়ক নানা আন্দোলন উপস্থিত হইতেছিল, সেই সময়ে নীতিবিষয়েও উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার দোষ হইতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন এবং প্রবৃত্তি, সামাজিক আচার বা লোকসঙ্গ যে সকল বিষয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত, তিনি সেই সকলের উপরে জয়লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। অন্য পাঁচজনের মত তিনিও প্রথমে ভাবিতেন কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ জানিলেই বুঝি মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করা অনায়াসসাধ্য হয়। ক্রমে তিনি বুঝিলেন যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করা কিরূপ দুরূহ। তিনি দেখিলেন যে একটী মন্দ অতিক্রম করিতে গিয়া আর একটী অনুচিত কার্য্য করিয়া বসেন। এইরূপে তাঁহার ধারণা হইল যে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা করিলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অন্তরে জানিলেই হইল না, সেই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

এই জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত

উপায় অবলম্বন করিতেন। প্রথমত নীতিসমূহকে তেরো ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটী নীতির সহিত এক একটী পদ লিখিয়া রাখিতেন ; যথা—

১। মিতাহার—এরূপ আহার করিবে না যাহাতে আলস্য আনয়ন করে ; এরূপ পান করিবে না যাহাতে উত্তেজনা আনয়ন করে।

২। নীরবতা—যে কথায় তোমার বা অপরের উপকার হইবে সেই কথাই কহিও ; মিথ্যা প্রলাপ পরিত্যাগ কর।

৩। নিয়ম (order)—প্রত্যেক বস্তু যথাস্থানে রাখিবে ; প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত সময় রাখিবে।

৪। প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবার প্রতিজ্ঞা করিবে এবং যাহা করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে তাহা সাধনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

৫। মিতব্যয়িতা (frugality)—অপরের বা নিজের মঙ্গলসাধনেই ব্যয় করিবে ; কোন কিছু বৃথা নষ্ট করিবে না।

৬। পরিশ্রম—সময় নষ্ট করিও না ; সর্ব্বদা কল্যাণকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে ; বৃথা কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

৭। সরলতা—অনিষ্টকর অসরল ব্যবহার করিও না ; অপরের হানিকর ও অন্যায় কিছু চিন্তা করিও না ; কথা যদি কহিতেই হয় তো সেইরূপই কথা কহিও।

৮। ন্যায়পরতা—কাহারও ক্ষতি করিয়া অথবা স্বীয় কর্ত্তব্য মঙ্গলসাধনে পরাঙ্মুখ থাকিয়া অন্যায় ব্যবহার করিও না।

৯। মিতাচার—অতিরিক্ত যাহা কিছু পরিত্যাগ করিও ;

যতদূর কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তোমার প্রতি আচরিত অনিষ্টের প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকিবে।

১০। পরিচ্ছন্নতা—শরীর, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানে কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা সহ্য করিও না।

১১। শান্তি—সামান্য বিষয়ের জন্য অথবা সাধারণ ও অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার জন্য নিজের শান্তি নষ্ট করিও না।

১২। ব্রহ্মচর্য্য।

১৩। বিনয়—যিশু এবং সক্রেটিসকে অনুকরণ করিবে।

এতগুলি বিষয় একেবারে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে বলিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একটী খাতা খুলিয়া তাহার এক এক পৃষ্ঠা এক একটী নীতির উদ্দেশ্যে রাখিলেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রস্থের দিক সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক ভাগকে প্রতিদিনের জন্য রাখিলেন। প্রতি পৃষ্ঠার দৈর্ঘ্যের দিক পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ নীতির জন্য তেরো ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তেরো পৃষ্ঠাই এই প্রণালীতে বিভক্ত করিলেন। প্রতি পৃষ্ঠার মস্তকে পদসহিত এক একটী নীতি বিশেষভাবে লিখিত থাকিত—তাহার অর্থ এই যে শীর্ষোক্ত নীতির প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অপর নীতিগুলির প্রতি সেই সপ্তাহের জন্য সাধারণভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সপ্তাহের মধ্যে যেদিন যে নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, সেইদিন সেই নীতির ঘরে একটী কৃষ্ণচিহ্ন ফেলিতেন। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাই—

মিতাহার। আলস্য আনিবার মত আহার করিবে না। উত্তেজিত হইবার মত পান করিবে না।

ত্রয়োদশ নীতি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রবি
১ মিতাহার							
২ নীরবতা	×	×		×			
৩ নিয়ম	×	×			×	×	×
৪ প্রতিজ্ঞা		×					
৫ মিতব্যয়		×				×	
৬ পরিশ্রম							
৭ সরলতা			×		×		
৮ ন্যায়পরতা							
৯ মিতাচার							
১০ পরিচ্ছন্নতা							
১১ শান্তি							
১২ ব্রহ্মচর্য্য							
১৩ বিনয়							

তাঁহার এই খাতায় তিনটী মন্ত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথম মন্ত্র—এডিসন লিখিত "কেটো" হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি—

Here will I hold. If there's a power above us,
And that there is, all nature cries aloud
Through all her works, He must delight in virtue;
And that which He delights in must be happy.

দ্বিতীয়টী সিসিরো-রচিত নিম্নলিখিত লাটিন ভাষায় লিখিত পংক্তিগুলি—

O vitae Philosophia dux! O virtutum indagatrix expultrixque vitiorum! Unus dies, bene et ex praeceptis tuis actus, peccanti immortalitati est anteponendus

তৃতীয়টী বাইবেল গ্রন্থের সলোমনের প্রবচন হইতে জ্ঞান অথবা ধর্ম্মবিষয়ক উক্তি :—

"Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honour, Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace."

তিনি ঈশ্বরকেই জ্ঞানের উৎস জানিয়া তাঁহার নিকটেই জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। এই কারণে তিনি একটী প্রার্থনা রচনা করিয়া খাতার প্রথমে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে প্রার্থনাটী এই—

"হে শক্তিমৎ মঙ্গলস্বরূপ! সদাব্রত পিতা! দয়াল নেতা! যে জ্ঞান দ্বারা আমি আমার প্রকৃত উপকার জানিতে পারি, আমার অন্তরে সেই জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া দাও। সেই জ্ঞান আমাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করে, সেই কার্য্য করিবার দৃঢ় ইচ্ছা প্রদান কর। তুমি আমার প্রতি যে অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছ, তাহারই প্রতিদান স্বরূপে আমি তোমার অন্যান্য সন্তানগণের যে কিছু উপকার করিতে পারিতেছি তাহাই গ্রহণ কর।"

তিনি টমসন-রচিত আর একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রায় সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন—

Father of light and life, thou Good Supreme !
O teach me what is good ; teach me Thyself !
Save me from folly, vanity, and vice,
From every low pursuit ; and my soul
With knowledge, conscious peace, and virtue pure ;
Sacred, substantial never-fading bliss !

ফ্রাঙ্কলিনের ন্যায় ধর্ম্মপ্রবণ লোকের দ্বারাই আমেরিকার সাধারণতন্ত্র সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই কারণেই আমেরিকা শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। যুক্তরাজ্যের যাঁহারা প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন তাঁহাদেরও প্রায় সকলেই ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরভক্ত। লিঙ্কলন্, গারফীল্ড, হেরিসন প্রভৃতি প্রেসিডেণ্টগণ যেমন বুদ্ধিবিষয়ে অতি উচ্চদরের লোক ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহারা তেমনি উন্নত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরভক্ত, প্রার্থনাশীল ও প্রগাঢ় নিঃস্বার্থপর ছিলেন। এইরূপ সাধু ব্যক্তি-গণের সমাবেশ না হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ।

অনেকে বলেন যে রাজনীতি পরিচালনাকালে ধর্ম্মকে পশ্চাতে রাখা কর্ত্তব্য। ফরাসিবিপ্লবের দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে যে রাজনীতিকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে। ম্যারাট, ড্যালটন, রোবস্পীয়র প্রভৃতির ন্যায় স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, ঈশ্বরে অবি-শ্বাসী ব্যক্তিগণ ফরাসিবিপ্লবের নেতৃত্বপদে অধিরূঢ় হওয়াতে তথায় প্রকৃত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে কতনা বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

এমন যে বীর নেপোলিয়ন, তিনিও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র সম্যক্ নিরুপদ্রব হয় নাই। এক অধর্ম্মের কারণে ফ্রান্সে আজও কতনা অনিষ্ট হইতেছে। সেখানে অধর্ম্মের কারণে দুর্নীতিসমূহ অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইতেছে এবং তাহারই ফলে লোকসংখ্যার ক্রমাগত হ্রাস হইতেছে। তথাকার রাজমন্ত্রীগণ ভাবিতে বসিয়াছেন যে কি উপায়ে দুর্নীতি দূর হইয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে। যে দেশের (ফ্রান্সের) মিউনিসিপাল আইন এই যে,কোন পুস্তকে ঈশ্বরের নাম থাকিলে তাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হইবে না, সে দেশের শ্রেয় কোথায়? সে দেশ বাহ্য চাকচিক্যে সহস্র মণ্ডিত হউক, কিন্তু যতদিন না ধর্ম্মের পথে ফিরিয়া দাঁড়াইবে, ততদিন সে দেশে শান্তি, মঙ্গল নাই।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
বেঞ্জামিনফ্রাঙ্কলিনের ধর্ম্মভাব বিষয়ক
চতুর্বিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

পঞ্চবিংশ আলাপ—ব্যাকুলতা।*

"কিমাগ আস যৎ জিঘাংসসি স্তোতারং।" হে পরমাত্মন্! হে হৃদয়েশ! এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে তুমি তোমার স্তোতা বন্ধু আমাকে দেখা দিতেছ না? তুমি কেন দিতেছ না, তাহা আমাকে বল। তুমি কি আমাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছ যে আমাকে দেখা দিতেছ না? আমি এত কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতেছ? না জানিয়া, মোহে পড়িয়া, অনেক পাপ করিয়াছি—অন্তর্য্যামিন্ অনেক পাপ করিয়াছি; হে করুণাময়! তোমার অপার করুণা, অনন্ত সলিল দ্বারা আমার হৃদয়ের মলিন পূতিগন্ধবিশিষ্ট পাপ সকল ধৌত করিয়া দাও। আমার আত্মাদর্পণ যেন এরূপ নির্ম্মল পবিত্র হয় যে তাহাতে তোমার—পরম পবিত্রস্বরূপ তোমার প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে; আমি তোমার সেই অপরূপ প্রতিবিম্ব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি।

আমরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী; শতবার তোমার আদেশ ভুলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পাপপথে চলি এবং দণ্ডভোগ করিয়া পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার ক্রোড়ের দিকে ফিরিয়া আসি; তুমি প্রেমের বাহু বিস্তারিত করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর। দেবদেব! রাজ রাজ! আজ তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; আমি জানি যে আমার পাপবশতই তোমার সাক্ষাৎলাভ পাইতেছি না; কিন্তু তোমার নিকট আমি অন্তর হইতে হৃদয়ের ক্রন্দনের সহিত এই

* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত।

প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার সেই পাপ সকল তোমার বজ্রদণ্ড দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া, শান্তিপ্রদানে আত্মাকে শুদ্ধ ও পাপমুক্ত করিয়া তোমার ক্রোড়ের দিকে অগ্রসর করিয়া লও। হে শান্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম! আমার হৃদয় হইতে অশান্তি দূর করিয়া দাও, যাহাতে সেথায় শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি এবং সেই শান্তি হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া এই সংসারের ঘোর কোলাহল দারুণ অশান্তির মাঝে তোমারি মঙ্গলস্বরূপ এবং অনন্ত মহিমা অবিশ্রান্ত ধ্যান করিতে পারি।

অবসানে তোমার নিকট এই রোদন করিতেছি যে আমি অতিক্ষুদ্র; কখন যে মোহে পড়িয়া নানা জনের প্রলোভনে ভুলিয়া বিপথে চলি তাহা বুঝিতে পারি না; তুমি সেই সময় তোমার বজ্র-দণ্ডের দ্বারা আমাকে সাবধান করিয়া দিও এবং এতদূর প্রলো-ভনে আমাকে ফেলিও না যাহাতে আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাই এবং কর্ণধারবিহীন তরীর ন্যায় অকূলপাথারে ভাসিয়া চলি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ব্যাকুলতা বিষয়ক পঞ্চবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

বৈরাগ্য।*

তুইরে কঠোর সংসারের মায়া
আমায় ছেড়ে দে ছেড়ে দে রে।
ভেসে যাব সেথা প্রাণ যেথা চায়
আমায় যেতে দে যেতে দে রে॥
দূর দূরান্তরে প্রান্তরের ধারে
বসিয়া রহিব একা একা।
স্নিগধ শ্যামল তরুবরতলে—
কারেও আর দিব না দেখা॥
প্রভাতে শুনিব পাখীদের গান—
পরমদেবের স্তুতিগান।
আকাশের পানে রহিব চাহিয়া—
অসীম ঢালিবে মহাপ্রাণ॥
ক্ষুদ্র কোলাহলে রহিব না আর
করিব না আর কানাকানি।
হৃদয়ে গাঁথিব—অসীমের মাঝে
ক্ষুদ্র প্রাণী—সদা এই বাণী॥
মধ্যাহ্নেও সেথা রহিব বসিয়া
আপনারই ভাবের মাঝে।
আপনি হাসিব আপনি কাঁদিব
আপনি থাকি আপন কাছে॥

---

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত।

সন্ধ্যায় দেখিব চাহি এক মনে
ডুবিবে তপন অস্তাচলে।
নিভিবে আলোক আসিবে আঁধার
অসীম নীল গগনতলে॥
দুএকটী করি ফুটিবে তারকা
অতুলন এ জগত মাঝে।
তাহাই দেখিব ফিরিব না আর
নিদারুণ সংসারের কাছে॥
পরম পিতার সঁপি প্রেমহাতে
নির্ভয়ে ভ্রমিব যথা তথা।
কাহারেও কাছে ডাকিব না আর
শুনিবনা আর কারো কথা॥
এর কাছে গিয়ে ওর কাছে গিয়ে
করিব না আর কানাকানি।
আপনি হাসিব আপনি কাঁদিব
সুখ দুখ বহিব আপনি॥

—:ওঁ:—

সপ্তবিংশ আলাপ—আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।*

ব্রাহ্মসমাজ আজকাল কেবল কলিকাতাবাসীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের ; কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র জগতের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে জগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন আছে। যে কোন সমাজের আচারপ্রণালী আমরা বিচার পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহারই কার্য্যকলাপ আমরা অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করি এবং তৎসম্বন্ধে নানা আলোচনা করি। তবেই, যখন ব্রাহ্মসমাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তখনই ইহার প্রয়োজন যে আছে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতকগুলি অভাব যে মোচন হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার জগতরচনার এমনই শৃঙ্খলা যে, এখানে অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু থাকিতে পায় না ; ব্রাহ্মসমাজের যদি প্রয়োজন না থাকিত তাহা হইলে ইহা এরূপভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দূরে থাক্, ইহা আপনাপনিই লোকের মন হইতে এবং তৎসঙ্গে জগত হইতেও অন্তর্হিত হইত।

যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন রহিয়াছে দেখিতেছি, তখন আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে এই প্রয়োজনটী কি এবং কি উপায়ে এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ

---

* আন্দুল আত্মোন্নতি সভার দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১৮১৭ শকে ১২ পৌষ দিবসে পঠিত।

চিরন্তন সত্য প্রচার করাই ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ কার্য্য। সত্যই সূর্য্যচন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, সত্যের বলেই জীবজন্তু সকল অন্নপান লাভ করিতেছে এবং সত্যের দ্বারাই আত্মা জ্ঞানে পরিতৃপ্ত ও প্রেমে পরিপুষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মোপাসকদিগের কর্ত্তব্য যে, সকল বিষয়ে তাঁহারা সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং সাধু উপায় সমূহ দ্বারা সত্যই প্রচার করিতে থাকেন। ব্রহ্মোপাসকদিগের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য যেন এই থাকে যে, তাঁহাদের আলাপে, চিন্তায় বা কর্ম্মে ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র হানি না হয়। ধর্ম্মধনকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলে সংসার সুখেরই নিলয় হয় এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে ধনমান সকলি অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। আমরা সমাজসংস্কারই করিতে যাই, বা অন্য যে কোন বিষয়েরই সংস্কার করিতে যাই, ধর্ম্মকে সকলের কেন্দ্র করিয়া সেই সকল সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতে হইবে যে, তাহাতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি অথবা হানি হয়। ধর্ম্মের হানি হইলে সেই কার্য্য তৎক্ষণাৎ বিষবৎ পরিত্যজ্য এবং ধর্ম্মের পরিপুষ্টি হইলে সেই কার্য্য যথাসত্বর অমৃতবৎ সেবনীয়। যে বীর পুরুষ অটলভাবে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সমস্ত জগৎ একত্রিত হইলেও তাঁহাকে সৌভাগ্যবঞ্চিত করিতে পারে না, মৃত্যুও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। সেই পুরাতন রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা, বোধ করি, এখানে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; সেই পুরাতন সাবিত্রীকথা কোন্ হিন্দু পরিবার অবগত না আছেন?

সত্যেরই জয় হয়, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন, এই সত্যের

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুরাতন উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ব্রাহ্মসমাজেরই ইতিহাসে কেমন সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজ যথন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তথন তাহার না ছিল অর্থবল, না ছিল লোকবল। তাহার বিরুদ্ধে যে"ধর্ম্মসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার মূলধন উঠিয়াছিল এক লক্ষ টাকা এবং কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক তাহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় সেই লক্ষ টাকা এবং কোথায় সেই ধর্ম্মসভা?

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা॥"

ব্রাহ্মসমাজ ইতিমধ্যে কত অভাবনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তাস্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন; ভারতবাসীর মর্ম্মগত ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এরূপ গুরুতর কার্য্যসাধনে সমর্থ হইবার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজে যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের না হউক, অন্ততঃ কয়েকজনের অটল সত্যনিষ্ঠা ছিল; অন্ততঃ সেই কয়েকজন সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই কয়েকজনের যেমন সত্যনিষ্ঠা ছিল, তেমনি তাঁহাদের হৃদয়ে উদার ভ্রাতৃভাব এবং প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদিগেরই অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত ব্রতরক্ষার ফলে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ চিরন্তন সত্য প্রচারই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পদার্থটী কি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। দেশনির্ব্বি-

শেষে, কালনির্ব্বিশেষে ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্তরে যে সরল সহজ ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা ও পরিপুষ্টি বিষয়ে যে ধর্ম্ম সহায়তা করে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আজিকার প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা মানব-জাতির অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। তবে এই ধর্ম্ম নানাজাতির মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে যত পরিস্ফুট হইয়াছিল, এমন আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। হিন্দু জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অপর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া উক্ত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই উন্নতি ও অবনতি আছে, ইহা জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই। হিন্দু জাতিও ইহার ব্যতি-রেকস্থল হয় নাই। হিন্দু জাতির এক অবস্থায় ঋষিরা ঋক্ সকল দেখিতে পাইলেন; ভারতের ধর্ম্মোদ্দীপনার সেই প্রাতঃ-কালে ব্রহ্মসূর্য্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অরুণকিরণরঞ্জিত ঋক্‌সকল কত-না শোভাই বিকীর্ণ করিয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রথম উন্মেষের পর অবনতি আসিয়া পড়িল; বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। তখন ঋষিরা পুনরায় জাগ্রত হইয়া উপনিষদনিহিত সত্য সকল তেজের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে উপনিষদের পর উপনিষদ প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহার জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানীজনেরাও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। উপনিষদে আছে যে, যে বংশে ব্রহ্মজ্ঞান একবার প্রবেশলাভ করিয়াছে সে বংশে অব্রহ্মবিৎ থাকে না "নাস্য কুলেঽব্রহ্মবিৎ ভবতি"। যখন বৈদিক ঋষিরা একবার ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত আনয়ন করিতে পারি-

লেন, তখন তাহা কি আর এই দীনহীন ভারতভূমিকে পরিত্যাগ করিতে পারে? এই ভারতবর্ষ অহর্নিশি এই প্রার্থনাই করিতেছে "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। ভারতের এই প্রার্থনার ফলে হিন্দুজাতি কখনই ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় নাই। সময়ে সময়ে আমাদের পাপে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচ্ছন্নদশা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য। এইরূপ সময়ে মহাত্মাগণ অবতীর্ণ হইয়া পাপ আবর্জ্জনারাশি মনুষ্যের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া ব্রহ্মপ্রকাশকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলেন। এবং এইরূপে ঋষিদিগের পরিপুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত আজ পর্য্যন্ত ভারতে অব্যাহত চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদের বহুকাল পরে হিন্দুজাতি যখন অধর্ম্মে পাপে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মকে একেবারেই হারাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় তন্ত্র প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক মুনিগণ যে ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে তাঁহাদের সেই ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। উপনিষদের সময়ে যেমন কর্ম্মকাণ্ডের অতিমাত্রা ধর্ম্মের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ তন্ত্রের পৌত্তলিকতারূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সোপানব্যবস্থা প্রথম প্রচলনের সময়ে সম্ভবতঃ যথেষ্ট উপকার করিলেও উত্তরকালে প্রকৃত ব্রহ্মলাভের অন্তরায় হইয়াছিল। হিন্দুজাতি পৌত্তলিকতা ও তদানুষঙ্গিক অতিমাত্র কর্ম্মাড়ম্বরে ক্রমশই ব্রহ্ম হইতে দূরে পড়িতে লাগিলেন। হিন্দুজাতিকে পুনরায় ব্রহ্মের পথে ফিরাইবার জন্য কত মহাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল। অবশেষে ভারতের বর্ত্তমান নূতন যুগে,

ইংরাজশাসন ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রারম্ভকালে, হিন্দু-জাতির বলিতে গেলে অধোগতির একশেষ হইয়াছিল; এতদূর অধোগতি হইয়াছিল যে লোকে তখন তাহার পুনরুত্থানের আশা করিতে পারে নাই। এই দারুণ অধোগতির সময়ে সেই বৈদিক-কাল হইতে প্রবাহিত কিন্তু প্রচ্ছন্নপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত দীন-হীন পতিত হিন্দুজাতির মধ্যে পুনঃপ্রবর্ত্তন করিবার জন্য করুণাময় পরমেশ্বর দুই একজন মহাত্মা পুরুষকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানের স্রোত বঙ্গদেশে পুনরায় ভালরূপে প্রবাহিত হইবার উপায় বিধান করিলেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম যাহা, তাহা হীরকের ন্যায় কত উজ্জ্বল। সেই যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার ও মধ্যবিন্দু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম নহে; ঋষিসেবিত সনাতন ধর্ম্মেরই বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী বাহ্যিক রূপান্তর মাত্র। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের দুইটী কাণ্ড আছে—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানে যাহা সত্য পাওয়া যায়, তাহার আর পরিবর্ত্তন নাই, বিনাশ নাই; এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ডের এত অনুরাগী এবং সকলকে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে গ্রাহ্য হইতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে তাহা পরি-

বর্ত্তন-সহকৃত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ভাবের কথা আজিকার নূতন কথা নহে; পুরাকালের ঋষিদিগেরও ইহা প্রাণের কথা। তাই বৈদিককালের আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রেও দেখা যায় যে কতকগুলি ঋষিমুনি যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার হোম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন "একে আচার্য্যাঃ কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি"। মনুও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশের সাধুলোকদিগের সদাচারও ধর্ম্মের অন্যতম প্রমাণ। ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহারই অনুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডকেও গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজ বৈদিক ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া প্রচলিত জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি হইতে যাগযজ্ঞের আড়ম্বর এবং পৌত্তলিকতার মোহ-আবরণ কেমন সুন্দররূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার অতিরিক্ত কোন বিদেশীয় আচার প্রণালী গ্রহণ করেন নাই।

আমরা হিন্দু এবং হিন্দুধর্ম্মেরই সারভাগ প্রচার করাই যখন আমাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া স্থির হইল, তখন আমাদিগের ইহাও দেখিতে হইবে যে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্বান মূর্খ, ধনীদরিদ্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে এই ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে। আমার বোধ হয় যে, আদিব্রাহ্মসমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। সুখের বিষয় অপরাপর ব্রাহ্মসমাজও আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতিধীরে অজ্ঞাতপ্রায়ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজেরই প্রদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার

দিন অবধি এযাবৎ এই লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, আপামর সাধারণ হিন্দুমাত্রেই যাহাতে আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহাই অবলম্বন করে এবং সেই লক্ষ্য চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহা প্রচারের জাতীয় উপায় সকলই অবলম্বন করিতেছে। উপকারের প্রথম পাত্র দুঃস্থ স্বজন; ভক্তির প্রথম পাত্র পিতা মাতা; স্নেহের প্রথম পাত্র আপনার স্ত্রী পুত্রাদি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই নহে, এবং ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন নহে, তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কর্ত্তব্য হিন্দুসমাজের কল্যাণ কামনা করা। ভারতের হিন্দুজাতির ক্রিয়াকলাপে যখন পরিমিত দেবগণের পরিবর্ত্তে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিবেন এবং যাগযজ্ঞের বহুল আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে সুমধুর ব্রহ্মনাম গীত হইবে, তখনই জানিব যে ব্রাহ্মসমাজ সিদ্ধকাম হইয়াছে। আবার সেই উন্নতিরই তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে সমগ্র জগতকে আপনার বিশাল ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

পক্ষান্তরে আত্মীয়স্বজন দুরবস্থায় পতিত থাকিতে যদি যশোলালসায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া অপরাপরকে সাহায্য করিতে উদ্যত হই, তবে তাহা যেমন "বিষাস্বাদ ধর্ম্মপ্রতিরূপ" মাত্র হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বীয় জন্মভূমির মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, স্বজাতির প্রতি স্নেহপ্রীতি বিস্মৃত হয় এবং হিন্দুসমাজের উপকারসাধনে বিমুখ হইয়া দেশবিদেশের উন্নতিকল্পে মনোযোগ প্রদান করে, তাহা বিষাস্বাদ ধর্ম্মপ্রতিরূপমাত্র হইবে; তাহাতে আত্মাভিমান স্ফীত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। স্নেহময়ী মাতা স্বীয়

স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষাতে আমাদের ক্রন্দন নিবারণ করিয়াছেন, যে ভাষাতে স্বীয় আনন্দ ব্যক্ত করিয়া আমাদের কত সুখের সময়ে সুখ দ্বিগুণিত করিয়াছেন; যে ভাষাতে ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত আমার সুখ দুঃখের কত কথা কহিয়াছি; যে ভাষাতে পিতামাতা কত স্নেহপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, আজ যদি সেই প্রাণের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাণগত ধর্ম্মের কথা বিদেশীয় ভাষাতে ব্যক্ত করিয়া বিদেশীয় প্রভুজাতির নিকট প্রশংসালাভের নিমিত্ত ধাবমান হই এবং প্রশংসালাভও করি, তাহাতে আমাদিগের অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে না। যে অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথম অন্ন মুখে তুলিয়াছিলেন এবং যে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদির মুখে প্রথম অন্নদান করিয়াছিলেন; পিতৃপুরুষেরা যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে অন্তরের গভীর প্রীতিভক্তি সহকারে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন, আমরা যদি সেই জাতীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় প্রভুজাতির অনুষ্ঠান সকল অবলম্বন করি, তাহাতে সেই প্রভুজাতি অন্তরে আমাদিগকে উপহাস করিলেও বাহ্যিক যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু কয়েকজন বিবেচনাহীন ব্যক্তি ব্যতীত সমগ্র হিন্দুজাতি সেই বিদেশীয় আচারপ্রণালী আন্তরিক ও বাহ্যিক ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে—হিন্দুজাতির সহানুভূতি কখনই সেদিকে যাইবে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্বজাতির স্নেহপ্রীতি ভুলিতে পারে না; পিতৃ পিতামহদিগের সঞ্চিত ধনে ধনী হইয়া এখন তাঁহাদিগের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিতে পারে

না। আদিব্রাহ্মসমাজ জাতীয়তা ও সত্যরক্ষা এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে এবং তদবলম্বনে আপনাকে ব্রহ্মপথে পরিচালিত করিতেছে।

আদিব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি এ যাবৎ কিরূপ জাতীয়ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ বেদান্তসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়া মোহান্ধ তদানীন্তন হিন্দুদিগকে জানিতে দিলেন যে মূর্ত্তিপূজাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে, ব্রহ্মই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। এইরূপে হিন্দুদিগের মনকে অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পরে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উপাসনার দিবস আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রুতিপাঠ হইত। হিন্দুরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হইলেও পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহাদেরই নিজস্ব, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইয়া প্রীতির সঞ্চার হইল।

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহার স্কন্ধে ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার পতিত হইয়াছিল, তাঁহাতেও ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের অতি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ছিল। সেই কারণেই তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব, তাহার জাতীয় প্রকৃতি এযাবৎ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ধর্ম্মালোচনার জন্য স্বীয় বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভার নামেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেই

সময়কার প্রথা অনুসারে তাঁহার সেই সভার কোন fraternity বা কোন club নামে নামকরণ হয় নাই। এই সভার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা। ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লিখিত ছিল যে, এই পত্রিকাতে "পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক।" এই সূত্রে ইহাতে শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, হিন্দুজাতির প্রাচীন মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল। আমরা অতি বৃদ্ধলোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে তখন কেহ গায়ত্রীর অর্থ জানিত না; আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলে তবে সকলে গায়ত্রীর অর্থ শিখিতে পারিল।

ক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রধান প্রতিজ্ঞা ছিল যে "প্রতিদিবস ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণবব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।" কিন্তু অনেকে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে না পারাতে সাধারণভাবে পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রচলিত হইল। এই দীক্ষাপ্রণালী এতদূর দেশীয় ভাবাপন্ন যে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়েও স্মৃতিশাস্ত্রের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহাতে আপত্তিজনক কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রণালীক্রমে কুড়িজন উৎসাহী যুবককে দীক্ষা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক স্বদেশীয় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেছিলেন বটে কিন্তু অপরদিকে তাঁহারা হয় ঘোর নাস্তিকতা অথবা বিদেশীয় পৌত্তলিকতার গ্রাসে পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইল। 'ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা, এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে' ইহার জন্ম হইয়াছিল।

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে অভাব আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে সেই অভাবমোচনের উপায়ও গৃহীত হইতে লাগিল। বেদে কি আছে ইহা জানিবার প্রয়োজন পড়িল অথচ বঙ্গদেশের কেহই বেদ জানিত না; বঙ্গদেশে সেই সময় বেদাধ্যয়ন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজই কাশীতে বেদবেদান্ত অধ্যয়নের নিমিত্ত ছাত্র প্রেরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদাধ্যয়ন প্রবর্ত্তন করে।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল ততই খৃষ্টীয় মিশনরিগণের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে রামমোহন রায়ের হস্তে ছাত্রলাভরূপ এক মহান উপকার পাইয়াছিলেন; তাঁহারা তাহাও ভুলিয়া গিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ বক্তৃতা

দ্বারা, প্রবন্ধের দ্বারা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুসমাজকে বিদেশীয় পৌত্তলিকতার সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া যে উপকার করিয়াছে, আশ্চর্য্য এই যে আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই সেই মহান্ উপকার বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি।

ক্রমে ঋষিবাক্যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রস্তুত হইল এবং শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ উৎপন্ন হইল। ক্রমে বেদবেদান্ত গ্রন্থ সকল শুদ্ধভাষায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের সভাষ্য ঋগ্বেদ প্রকাশিত হওয়াতে তাহা স্থগিত থাকিল।

ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার রামমোহন রায়ের পরে যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই স্বতঃ পরতঃ উৎসাহে ও সাহায্যে যখন এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য হিমালয় প্রবাস করিলেন এবং তিন বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়ের অনুপম শান্তিদায়ক "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বিবৃত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে কয়েকজন যুবক অত্যুৎসাহী ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম-সমাজকে সম্পূর্ণ বিজাতীয়ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া অযথা কারণে বিরোধ উত্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে তাঁহাদের সে প্রকার

বিরোধ উত্থাপন করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল যে উপবীতধারী কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যুবক হইলেও তাঁহাদের প্রতি প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের যথেষ্ট স্নেহপ্রীতি ছিল; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহস্র উপরোধেও, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বিপদে সম্পদে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন না। তিনি যুবকদের প্রার্থনার উত্তরে এই উদার বাক্য বলিলেন যে, তিনি উপবীতধারী অথবা উপবীতত্যাগী, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে প্রাচীন ও নব্য, উভয় সম্প্রদায় মিলিতভাবে কার্য্য করিতে থাকিলেই ব্রাহ্মসমাজের শীঘ্র ও অধিকতর উন্নতি হইতে পারিবে। কিন্তু সে উপদেশ তাঁহাদের মনে ধরিল না। অবশেষে তাঁহাদের সেই অযথা প্রার্থনা ব্রাহ্মসমাজ অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া অপর একটী ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন। এই সময় অবধি রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের আদিব্রাহ্মসমাজ নামকরণ হইল। এই বিরোধাগ্নিতে আদিব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরীক্ষিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল।

অবশেষে নব্যসম্প্রদায় ব্রাহ্মেরা নানা প্রকারে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে যখন অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিবাহবিষয়ক একটী আইনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই ভীষণ পাশবন্ধন হইতে প্রধানত আদিব্রাহ্মসমাজই রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধ বিবাদের পর আরও কয়েকটী কার্য্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম, ১৭৯৪ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই একটী কারণ নির্দ্দেশ করেন যে হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বক্তৃতা একদিকে তদানীন্তন "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" সভাপতি মান্যা-গ্রগণ্য ৺ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম-র্থিত হয়। অপরদিকে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ "টাইম্‌স্‌" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে খৃষ্টীয় মিশনরি প্রভৃতির হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল। এমন কি, অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত তাঁহার "ধর্ম্মবিজ্ঞানভূমিকা" নামক পুস্তকে এই বিবরণের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভীতি-ভাবের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিশিষ্টসূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই বক্তৃতার পর অবধি হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধুয়া উঠিতে লাগিল। আদিব্রাহ্মসমাজ আর্য্যঋষিপ্রচারিত স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কোন্ পথে গিয়া পড়িতেন তাহা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, বোলপুর গ্রামের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে 'শান্তি-নিকেতন' আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা। হিন্দু প্রকৃতি নির্জ্জন ধ্যানের বড়ই পক্ষপাতী। এই নির্জ্জন ধ্যানের জন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশে উন্মুক্ত হইয়াছে। আশ্রমের

ভিতর কেহ অনাচার আনয়ন করিতে পারিবেন না—শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে পারিবেন।

তৃতীয়ত, তাৎপর্য্যসমেত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দেশ বিদেশে সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছেন।

আমি এ পর্য্যন্ত আদিব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া দেখাইলাম যে আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে কিরূপ অভিন্ন; আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের রক্তমাংস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল শত বাধাবিঘ্নের সম্মুখেও কেমন অটল ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় জাতীয় প্রকৃতি পোষণ করিয়া আসিতেছে। বলিলে একটু গর্ব্বের মত শুনাইবে বটে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি—এই কলিকাতা নগরীতে, এই বঙ্গদেশে শাস্ত্রের হস্তলিপি সংগ্রহ কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করে আদি-ব্রাহ্মসমাজ; উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত করে আদিব্রাহ্মসমাজ; প্রথম বিশুদ্ধ সটীক ও সানুবাদ গীতা প্রকাশ করে আদিব্রাহ্মসমাজ; ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আদিব্রাহ্মসমাজ; মহা-ভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে আদিব্রাহ্মসমাজ এবং রামায়ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন আদিব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

অল্পদিন হইল, কোন সুবিখ্যাত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লেখক আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ হিন্দুরা কেন ততটা প্রকাশ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করেন না। আমরা আরও আশ্চর্য্য হই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই না হইলেও অনভিজ্ঞ হিন্দুরা বিবেচনা না করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক বিজাতীয় "আশমানী" ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সময়ে সময়ে তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তবে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাহার প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে জনসাধারণের নয়নে নিপতিত হইয়াছিল, এখন ঠিক সেরূপ হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অনেকটা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। যখন নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রভাত-সূর্য্য গগনতলকে প্রথম আলোকিত করিতে থাকে, তাহা লোকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখে অথবা যখন সেই সূর্য্যের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত ও প্রভান্বিত হয়, সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্য লোকদিগের সাগ্রহ নেত্রপাতের বিষয় হয়? ব্রাহ্মসমাজ বা অপৌত্তলিক হিন্দু-সমাজ যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ তাহাদের অনেকগুলি অনায়াসে গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছে। সেই সকল কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ যে সম্পূর্ণ নূতন অবতারণা করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে লুপ্তপ্রায় সেই সকল কার্য্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিল মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় বঙ্গভাষায় একখানিও ধর্ম্মসংপৃক্ত সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা ছিল না; সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা স্বীয় সুবিমল দীপ্তি লইয়া নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। এই পত্রিকায় এ যাবৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এখন তাহার অনুকরণে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াও অনেকগুলি ধর্ম্মসংপৃক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে আপনাপন সাম্প্রদায়িক পত্রিকার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাধারণে মিলিত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান একটীও ছিল না; এখন ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে হরিসভা প্রভৃতি নামে নানা উপাসনাসভা উত্থিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে ধর্ম্মসংপৃক্ত বিদ্যালয়ের অভাব ছিল; পর্ব্বত-সমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মসংপৃক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সেগুলি চিরস্থায়ী হইল না। এখন ব্রাহ্মসমাজেরই ভাবচ্ছায়াতে নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অভাব ছিল। তখন লোকে মনে করিত যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে শীঘ্রই বিধবা হয়। এখন আমরা আশ্চর্য্য হই বটে যে, তখনকার লোকে এই প্রত্যক্ষ ভ্রান্তি কেমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। যাহা হউক্ ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই বিশ্বাস

প্রথম দূরীভূত হইতে থাকে। এখন পৌত্তলিক হিন্দুসমাজেও এই বিশ্বাস অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে আজও যায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম বেদবেদান্তাদি শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সকলেরই জন্য প্রকাশ করিয়াছিল; আজ তাহারই অনুকরণে কত শাস্ত্রানুবাদ সকল প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে যুক্তিমতে ও শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই পঠনপাঠনে অধিকার আছে, ব্রাহ্মসমাজই এই মত প্রথম ব্যক্ত করে এবং এখন পৌত্তলিক হিন্দুরাও অবিচারিতভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছে।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্যই পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ আপনাদেরই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মসমাজের দীপ্তি সহজে অনুভূত হয় না—অনুভব করিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যই যে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এখনও অনেক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিই। গৃহসংগঠন একটী প্রধান কার্য্য পড়িয়া আছে। এই গৃহসংগঠন স্ত্রীশিক্ষারই একটী অঙ্গ বলিয়া ধরিতে পারি। যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" তাঁহাদের মধ্যে গৃহ বলিয়া গার্হস্থ্য জীবন বলিয়া একটী পদার্থ ছিল অনুভব করিতে পারি এবং তাহা যে বাস্তবিকই ছিল, তাহারও পরিচয় এই ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস কাব্যাদিতে দেখা যায়। কিন্তু এখন শিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষাবশতঃ ভারতের গৃহ জীর্ণ হইয়া ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে

ও হইতেছে। বর্ত্তমানকালে গৃহের সন্তানেরা গৃহে একত্র মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ পর্য্যন্ত করিবার অধিকার না পাইয়া অনেক সময়েই কুপথে গিয়া সেই আমোদস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে এবং এই কারণে যে কত গৃহ ছারখার হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? ব্রাহ্মসমাজের ইহা প্রচার করা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন ঋষিরা যেরূপ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিতেন, এখনও সকলে সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করুন; এবং সকলে পুত্রকন্যাকে নির্ব্বিশেষে আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং সৎসাহিত্য, ধর্ম্ম সঙ্গীত প্রভৃতি চর্চ্চা করিবার শিক্ষা দিতে থাকুন এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মবিদ্যা আপনাদের উপদেশ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের সুকোমল মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিউন। এইরূপ করিতে থাকিলে, তবে গৃহ পুনরায় সংগঠিত হইবে, ভারতের গার্হস্থ্যজীবন ফিরিয়া আসিবে, জাতির উন্নতি হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে। ইহাতে পুত্রকন্যাদিগের চরিত্রবল কত না বর্দ্ধিত হইবে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিয়া আসিলাম। এখন আমরা চাই যে, পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজকে আপনারই উন্নত অঙ্গ বিবেচনা করিয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত না হয়। একটী তৃণের দ্বারা না হইলেও তৃণসংহতির দ্বারাই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ জন্তুও আবদ্ধ হইতে পারে। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ হইলে যে কুফলই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আশ্চর্য্য এই যে আমরা প্রায় সকলেই মুখে বলিতেছি যে গীতাকে অতিশয় মান্য করি, বেদকে অতিশয় মান্য করি, গীতার নিত্য পঠন পাঠন করিতেছি এবং তাহাতে নিত্যই

গৃহবিবাদের কুফল জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত দেখিতেছি, তথাপি সে সকল কথা অবহেলা করিয়া গৃহবিবাদেই নিমগ্ন থাকিতেছি। তবে কি সত্যই আমাদের গীতার প্রতি শ্রদ্ধা, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলই মুখের কথা মাত্র—অন্তরের কথা নহে? একদিকে গীতা কাতরস্বরে অর্জ্জুনের মুখে গৃহবিবাদের ফল বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে কহিতেছেন—

যদপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥
কথং ন জ্ঞেয় মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥

যদিচ ইহাঁরা লোভে বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়কৃত দোষ জানিয়াও এই মহাপাপ হইতে কেন না ক্ষান্ত হইব?

অপরদিকে বেদ জলদগম্ভীরস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া এই মহান উপদেশ দিতেছেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমান মস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমা-

দের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

হে ভ্রাতৃগণ! এস, আমরাও বেদের এই উপদেশ, এই আদেশ, এই অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া পূর্ণহৃদয়ে গৃহে প্রত্যা-গমন করি এবং এখনই ও এখানেই এই মহান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে আর কদাপি গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিব না। ঈশ্বর আমাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার বল প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
আদিব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য বিষয়ক
সপ্তবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

অষ্টাবিংশ আলাপ—ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্মচর্য্য।*

জননী ও জন্মভূমি যাঁহার ছায়া সেই ভগবানকে স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আজ চারিদিকেই জীবনের লক্ষণ দেখিয়া যে কি আনন্দ হইতেছে তাহা একমুখে বলা যায় না। বঙ্গবাসীর একটা বাঁচিবার উদ্যোগ হইয়াছে, ইহা দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? আজই জীবনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে যে বলা হইল, তবে কি ইহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জীবন ছিল না? আমাদের বিশ্বাস যে জীবনের দেশব্যাপী সাড়া বঙ্গদেশে এমনভাবে এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। গঙ্গাঘাটে অথবা শ্মশানঘাটে আনীত আত্মীয়স্বজনের জীবনের লক্ষণ দেখিলে যে রকম আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ দেশব্যাপী জীবনের সাড়া পাইয়া সেই রকম আনন্দ হইতেছে।

কিন্তু এই আনন্দেরও মধ্যে আশঙ্কা স্থান পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিকট চীৎকার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহাতে সময়ে সময়ে আনন্দেরও মধ্যে চমকাইয়া উঠি, আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠি এবং ভাবি যে ইহা কি সত্যই জীবনের লক্ষণ অথবা বিকারের লক্ষণ? যে ভাবে সভাসমিতি আহ্বান পূর্ব্বক চীৎকারের ধুম পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের ভয় হয়, বঙ্গদেশের রোগ বুঝি বা বর্ত্তমানে বিকারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ের একটা সুদৃঢ় আশ্রয়বল না থাকিলে, ভগবানের উপর হৃদয়কে

---

* ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বরের বসুমতীতে প্রকাশিত।

ঢালিয়া দিতে না পারিলে এই বিকারের হাত এড়ায় কাহার সাধ্য? বিকারের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাঁহারা দিবানিশি ঘুরিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকেই স্থিরমস্তিষ্ক ভাবিতেছেন এবং যে কেহ সেই ঘূর্ণীপাকে পা দিতে অস্বীকার করেন, তাঁহা-কেই বিকারগ্রস্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি।

এইস্থলে সম্পাদক মহাশয় এবং পাঠকবর্গের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া দুই চারিটী ব্যক্তিগত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমি বৃথা চীৎকার, বৃথা হৈ চৈ একটুও ভালবাসি না এবং সেই কারণে বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধীয় সভাসমিতিতে বেশী যোগদান করিতে সক্ষম হই নাই। এই দুর্ভাগ্যের কারণে, আমার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, ও যাঁহারা আমার স্বাধীনভাবের বহুল পরিচয় পাইয়া-ছেন, তাঁহারাও সন্দেহ করেন যে গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মান-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সভাসমিতিতে যোগদান করি না। যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া সে বিষয়ে কণামাত্র চিন্তাও হৃদয়ে স্থান দিতে প্রস্তুত নহি।

হৈ চৈ ভাল না বাসিবার, বর্ত্তমান আন্দোলনের কোলাহল-স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিবার কারণ নিম্নে বলিতেছি। আমার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বর্গীয় পিতৃদেবের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সেই অবধি প্রায় ষোল বৎসর কাল অবসর পাইলেই সভাসমিতিতে যোগদান করিয়াছি; অমুকস্থানে বক্তৃতা হইবে, অমুকস্থানে বিরাট সভা হইবে শুনিলেই ছুটিয়া গিয়াছি। সেই সময়ে হল্লার একটা নেশায় মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যখন সেই মত্ততার, সেই public spirit এর ফলাফল আলো-

চনা করিয়া দেখিতে লাগিলাম, তখনই এক ঘোর অবসাদ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। দেখিলাম যে, যে পরিমাণে মত্ততায় মগ্ন হইয়াছিলাম, তাহার ফলে শতাংশের একাংশও তো জীবন লাভ করিতে পারি নাই; বরঞ্চ বিপরীতে প্রচুর সময় নষ্ট করিবার কারণে অবসাদের ছায়াতে জগতকে অন্ধকারপূর্ণ এবং বিষবৎ তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেই শিক্ষারই ফলে কলরবে আর যোগদান করিতে প্রবৃত্তি হয় না—সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যে, সময় চলিয়া গেলে ফিরে নাহি আসে।

দুইটী বিষয় লইয়া বর্ত্তমান আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছে—একটি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং দ্বিতীয়টি স্বদেশীপ্রিয়তা। প্রথমটির বিষয়ে এতই আন্দোলন, এতই সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে যে, সে বিষয়ে আর একটীও কথা কহা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে। বিশেষতঃ বিষয়টী রাজনৈতিক। রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আমাদের আন্দোলন ও চীৎকার বৃথা ও নিষ্ফল। এই যে সেদিন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিরূপে বলিলেন "দাসের রাজনৈতিক আলোচনা করিবার (অর্থাৎ রাজনীতি সম্বন্ধে লম্বাচৌড়া কথা বলিবার) অধিকারই নাই—A slave has no right to talk of politics—এই কথা অক্ষরে অক্ষরে অণুতে অণুতে সত্য। দাস তুমি; তুমি তোমার চারিপার্শ্বে কোথায় কি হইতেছে তাহারই সংবাদ রাখিতে পার না; আর দেশবিদেশের কোথায় কি হইতেছে, কোথাকার কোন্ ঘটনায় তোমার কি শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাহার সংবাদ রাখিবার স্পর্দ্ধা কর! তুমি দাস;

মনিবের মন যোগাইতে এবং দগ্ধোদরের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে তোমার সমস্ত সময় সমস্ত মনোযোগ অর্পিত হইয়া থাকে, তুমি দেশবিদেশের শুভাশুভ স্থিরচিত্তে ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? আর যদিবা ভাবিবার সময় পাও এবং তোমার বহু চিন্তার ফলে যদি বা সত্যতত্ত্বে উপনীত হও, তাহা হইলেও এমনই কি কথা আছে যে দাসের কথা মনিবে সমস্তই নির্ব্বিচারে শুনিয়া চলিতে বাধ্য হইবে! আমরা দাস জাতি, এবং প্রকৃত রাজনীতির অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অর্জ্জুন যখন সেই মহাসংগ্রামের মধ্যে গুরুজন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া, কিরূপে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন ভাবিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়রূপে রথের উপান্তে বসিয়া পড়িলেন, সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের মর্য্যাদা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে এমন কি আত্মীয় প্রভৃতির হত্যাকার্য্যে প্রণোদিত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" হে অর্জ্জুন, ইহাঁরা আমা কর্ত্তৃকই পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া রহিয়াছেন, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। কথাটি বড়ই সারগর্ভ। কৌরবগণ পাপে জর্জ্জরিতপ্রায় হইয়া নিজেদের দোষে নিজেরাই নিহত হইয়াছিলেন—অর্জ্জুনের রূপার কাঠি ছোঁয়ানো উপলক্ষ মাত্র। পর্ব্বতের অরণ্যানী যখন গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া একেবারে খটখট করিতে থাকে, তখনই সামান্য কারণ উপলক্ষ করিয়া ভীষণ দাবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে অবস্থাচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে বঙ্গদেশকেও মৃত্যুমুখে আনয়ন করিয়াছে। ঈর্ষাবিষ,

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও দ্বেষহিংসা, পরস্পরকে প্রবঞ্চনা প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গবাসীগণ আপনা হইতেই পূর্ব্বাবধি বিভক্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কার্য্যে হাত দিবে, তাহাতেই রেষা-রেষি দলাদলি; পাঁচজন মিলিয়া যে কার্য্যে অগ্রসর হইবে, অবি-শ্বাসকীট আসিয়া তাহারই মূল ছিন্ন করিয়া দিবে। সূক্ষ্মচর্ম্মিতার কারণে কেহই অপর কাহারও স্বাধীন মতামত শুনিতে পারেন না। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিবার জন্য লর্ড কার্জ্জনই বল, আর ব্রডরিকই বল, সকলেই উপলক্ষ মাত্র। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

এখন বাঁচিবার উপায় কি? উপযুক্ত চিকিৎসক ইহার ব্যবস্থা দিতে পারেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যাহা লাভ করি-য়াছি, তাহা ব্যক্ত করিলে বোধ করি কেহ দোষ গ্রহণ করিবেন না। বর্ত্তমান আন্দোলনের দ্বিতীয় বিষয় স্বদেশীপ্রিয়তাই আমার মতে সেই ঔষধ। এই বিষয়েও যদিও বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, সভাসমিতিও বিস্তর হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে বটে, কিন্তু তবু যেন সে কথার, সে আন্দোলনের শেষ হয় না—আর বাস্তবিকও কোন্ ভাইবোন আপনাদের মধ্যে স্বীয় মাতার গুণগান করিতে করিতে বিতৃষ্ণ হয়? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া যেমন এই দাস জাতির তাহাতে অধিকার নাই, স্বদেশীপ্রিয়তা সেইরূপ সামাজিক ব্যাপার বলিয়া তদ্বিষয়ক আন্দোলন ও আলোচনায় এই দাস জাতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা আপনাকে উন্নত করিব, নিজেদের প্রস্তুত মোটা কাপড় মোটা চালে শরীর রক্ষা করিব, ইহাতে সহজে কেহ কোন কথা বলিতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যাপারে

নীরব থাকিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত তেজ সংহত আকারে সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিলেই বর্ত্তমানে আমাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক বলিয়া আমার বিশ্বাস। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারে অনেক মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কাহারও মতে বর্ত্তমান বিভাগই ভাল, কাহারও মতে বিভিন্ন প্রকার বিভাগই ভাল, আবার কাহারও বা মতে কোন প্রকার বিভাগই ভাল নহে। কিন্তু স্বদেশীপ্রিয়তা সম্বন্ধে আশা করি মতদ্বৈধ নাই।

স্বদেশীপ্রিয়তা যে জিনিষটা ভাল এবং প্রত্যেক মাতৃভক্ত সন্তানের এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে মতভেদ নাই বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োগপ্রণালী সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে এবং ইহাকে ইংরাজ বণিক অথবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ভয়প্রদর্শনের অস্ত্র করিবার বিষয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ আছে। আমরা সকলেই জানি যে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে ভারতে স্বদেশীয় দ্রব্যের প্রচলন হউক। যখন বিগত দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে শতসহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন লর্ড কার্জ্জনের হৃদয়ে দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন যে কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলেই এইরূপ দুর্ভিক্ষ ও তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু অপরিহার্য্য; কিন্তু যদি এখানে স্বদেশীয়-দ্রব্যের কাটতি হয় এবং তাহার ফলে বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অন্তত ভারতবাসীর কতকাংশ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে। এই সকল ভাবিয়া তিনি খনিজ প্রভৃতি অর্থকরী বৈজ্ঞানিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপিত করিলেন। হইতে পারে যে ইহা যথেষ্ট নহে, কিন্তু ইহা মূলসূত্র ধরাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট বোধ করি।

আমার মতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং স্বদেশীপ্রচার, পরস্পরকে কিছুতেই মিলিত করা উচিত নহে—রাজনৈতিক ব্যাপার ও সামাজিক ব্যাপার, উভয়কে সম্পূর্ণ পৃথক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সভাসমিতিতে যাও, দেখিবে সর্ব্বত্রই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ এবং স্বদেশীপ্রিয়তা সংযুক্তভাবে আলোচিত হইতেছে। আজকাল প্রস্তাব উঠিয়াছে বটে যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হউক বা না হউক, স্বদেশীপ্রিয়তাকে পোষণ করিতে হইবে এবং শেষোক্ত বিষয়ের সহিত অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার আলোচনা করিবারই প্রয়োজন নাই। কার্য্যত কিন্তু ইহা রক্ষিত হইতেছে না। প্রায় সর্ব্বত্র দেখি, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বদেশীপ্রিয়তা গবর্ণমেণ্টকে ভয়প্রদর্শনের অস্ত্রস্বরূপে আলোচিত হইয়া থাকে।

পূজার পূর্ব্বে কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে প্রথম প্রস্তাব হইল যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সহিত স্বদেশীপ্রিয়তার কোনই সম্পর্ক রাখা হইবে না। প্রস্তাবও গৃহীত হইল বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা কার্য্যে দাঁড়াইতে পারিল না। অধিবেশনের উপসংহারে কয়েকজন নেতার স্বাক্ষরিত ৩০শে আশ্বিন তারিখে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে রাখীবন্ধনের প্রস্তাবসম্বলিত এক পত্রী বিতরিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা পরে বলিব ; কিন্তু এখন আমার বক্তব্য এই যে, স্বদেশীপ্রিয়তা বিষয়ক আন্দোলনে ভবিষ্যতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদবিষয়ক কোন কথা একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ করা আমাদের কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, তেজ সংহত করিবার এবং সুতরাং মঙ্গল সাধনের সহায় হইবে। আরও দেখিতেছি যে, রাজনীতির সহিত সামাজিক (বিস্তৃতঅর্থে) কার্য্যের সম্মিলন না রাখিলে গবর্ণমেণ্টও

সহায়তা করেন। জাতীয় মহাসম্মিলনীতে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি না থকিতে পারে, কিন্তু তৎসংযুক্ত শিল্পপ্রদর্শনীতে কি তাঁহারা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন না? আর তাহাতে কি যথার্থ উপকার হইতেছে না?

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে বর্ত্তমান আন্দোলনবিকারের প্রকৃত ঔষধ স্বদেশীপ্রিয়তা। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" পত্রে এতৎসম্বন্ধীয় কোন সারগর্ভ প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে স্বদেশীপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে হিন্দুয়ানী রক্ষা করা চাই। আমিও সেই কথার অনুমোদন করি, কিন্তু আমি দুই একটি অক্ষর পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই কথাই বলিব,—"হিন্দুয়ানীর" পরিবর্ত্তে "হিন্দুত্ব" চাই। ইহার ভাব এই যে, তুমি আমি যে কার্য্যকে হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিব, তাহাই যে কর্ত্তব্য হইবে তাহা নহে, মনু প্রভৃতি পুরাতন ঋষিদিগেরই আদেশ হিন্দুর কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হইবে। আমি যতই আলোচনা করিতেছি এবং অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধত্ব লাভ করিতেছি, ততই আমার মনে এই ভাব দৃঢ়তর হইতেছে যে, হিন্দুত্ব কেবল স্বদেশীপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠাভূমি নহে, কিন্তু হিন্দুত্ব ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতের মঙ্গল নাই। "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" বিষয়ক গ্রন্থে আজ প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, "হে ভারতের পুত্রকন্যাগণ! তোমরা এই সকল শাস্ত্রোপদিষ্ট ও সমাজপ্রচলিত হৃদয়াভ্যনুজ্ঞাত সুন্দর আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সুসন্তান সকল প্রসব কর, তোমরা নিজেদের জীবনে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক নিশ্বাসে, ভারতের গৌরব জগতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে বিকীর্ণ কর।" যে সময়ে এই কথা-

গুলি লিখিত হইয়াছিল সেই সময়ে অগ্রসর সম্প্রদায় বিলাতী সভ্যতাভবাতার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। আজ কি সুখের বিষয় যে, সেই অগ্রসর সম্প্রদায়কে স্বদেশীপ্রিয়তার আন্দোলনে অগ্রসর দেখিতেছি। এই হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্য, এই সামাজিক ব্যাপারের জন্য আমাদিগকে রাজদ্বারে আবেদন নিবেদন করিতে হইবে না। আমাদিগের প্রত্যেকের নিজের উপরে ইহা নির্ভর করিতেছে। শতবৎসরের নির্ম্মিত সৌধরাজি একদিনে ভূমিসাৎ হইতে পারে না; আর শত বৎসরের গঠিত মানসিক ভাব একদিনে নির্ম্মূল করা কি সম্ভব? আমরা আমাদিগের জীবনে বর্ত্তমান স্বদেশীপ্রিয়তার ফলাফল নাই বা দেখিলাম, আমরা আমাদিগের সন্তানগণকে হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে শিক্ষা দিব, তাহা হইলে অন্ততঃ আর শতবৎসর পরেও ভারতমাতা সেই পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এই আশাতেও কি সুখে মরিতে পারিব না?

এই হিন্দুত্বের মূল কি? ইহার কেন্দ্রভূমি কি? কোন্ বস্তুটীকে রক্ষা করিতে পারিলে এক প্রকারে সমগ্র হিন্দুত্ব রক্ষিত হয়? অনেকস্থানে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে মনুপ্রচারিত ব্রহ্মচর্য্য হিন্দুত্বের পত্তনভূমি। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় হিন্দুত্বরক্ষার সকল চেষ্টাই বৃথা ও নিষ্ফল। এপর্য্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে যত সভাসমিতি হইয়াছে, সংবাদপত্র সমূহে যত প্রবন্ধ রাশি নির্গত হইয়াছে, কোথায়ও একথা বলিতে শুনিলাম না যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, নইলে মৃত্যু দ্বারে উপস্থিত। একবার সকলে অন্তরে হাত দিয়া বল দেখি, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমরা

এবং আমাদের পুত্রকন্যাগণ মরিয়া আছে কি না? যখন দেখি, পাঁচ বৎসর বয়স হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া বীরত্ব অনুভব করে; যখন দেখি; যৌবনে পদার্পণের বহু পূর্ব্বাবধি ছাত্রগণ বাল্যের অনুপযুক্ত অসার কার্য্য সমূহে অভ্যস্ত হইয়া উঠে; যখন দেখি, কি সম্ভ্রান্ত, কি অসম্ভ্রান্ত অধিকাংশ যুবক বিলাতী বা দেশী মদ্যের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন; এবং যখন দেখি, ভদ্র মহিলাবর্গের মধ্যেও সিগারেট ও মদ্য নামক মায়াবী রাক্ষসদ্বয় স্বীয় মায়াজাল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়," তখন কি আর আমাদের জীবনের আশা ভরসার কথা বলিতে সাহস হয়—রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি লাভ করা তো দূরের কথা? আমি যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি, দেখি কেবলই মৃত্যু—দেখি আমরা অসংখ্য প্রেত চারিদিকে বিচরণ করিতেছি। সভাসমিতির ও সংবাদপত্রের আন্দোলনে দেখি যে, সকলেই কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছেন, ও চীৎকারে কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া ফেলিতেছেন, কিন্তু মূলে কেহই পৌছেন নাই, আর মূলে যাইতে কেহই তেমন ইচ্ছুকও নহেন—কারণ মূল সত্য কথা বলিলে অপর পাঁচজনে আমার কথা যদি না শোনেন! চারিদিকে বক্তৃতা হইতেছে এবং প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতেছে যে, আমাদিগের বিলাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, সংযম অভ্যাস করিতে হইবে; কিন্তু সংযমের মূল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার কথা কেহই বলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! অথবা বর্ত্তমান বঙ্গবাসীদিগের চরিত্র অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। লোকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাস আপনা

আপনিই বিদূরিত হইবে। তখন আর চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে না যে "ওগো দেশী বস্ত্র বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা একটু মোটা হইলেও দেশী বস্ত্র পরিধান করিও।" তখন আপনা হইতেই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে আসক্তি জন্মিবে। অর্থনীতি এবং মুক্ত ব্যবসায়ের (free trade) নীতি অনুসারে একদিনে বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করা কত-দূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি অফলপ্রসূ (unproductive) দ্রব্যসমূহের আমদানী সর্ব্বতো-ভাবে বন্ধ করিতে সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলাতী কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্যে স্বভাবতই অভিরুচি থাকিবে না। দেশ হইতে যদি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথমেই সিগা-রেট মদ্য এবং বিলাতী সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতিকে বিদূরিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃত কাজ হয়। এই সকল দ্রব্যের অভাবে বঙ্গবাসী অন্নহীন হইয়া বস্ত্রহীন হইয়া মরিয়া যাইবে না, বরঞ্চ বিপরীতে কিছু পয়সা হাতে সঞ্চিত হইবে—এবং এইগুলি দূর করাই সহজসাধ্য।

আমরা তো এখন মরিতেই বসিয়াছি, কিন্তু আমাদিদের কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে। কোন্ চিকিৎসায় এখন সহজে জীবন ফিরিয়া পাইব? আমার বিশ্বাস যে, এখন বঙ্গদেশের বিকার ডাক্তারী চিকিৎসার উপযোগী অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে—এই অবস্থায় কবিরাজী চিকিৎসাই অবলম্ব-নীয়। ম্যানচেষ্টারকে "বয়কট" কর, সমগ্র বঙ্গবাসী জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, অবস্থানির্ব্বিশেষে এক সুবৃহৎ তন্তুবায়কুলে পরিণত হও, এই প্রকার অসঙ্গত আন্দোলনরূপ ডাক্তারী চিকিৎসায়

আরও কুফল হইবে, বিকারের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে, তখন রক্ষা করা দুর্ঘট হইবে। কবিরাজগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন যে কেবল বহিঃপ্রকাশিত লক্ষণের চিকিৎসা করিলে চলিবে না, মূল কারণের চিকিৎসা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহিঃলক্ষণেরও একে একে উপশম করিতে হইবে। মূল কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব দূর করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আপাততঃ সিগারেট ও মদ্য এই দুই তীব্র বহিঃলক্ষণকে প্রশমিত করিতে হইবে।

যেমন স্বদেশীপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের মূল প্রতিষ্ঠা যিনি, সেই ভগবানকে হৃদয়ে আকুল ভাবে প্রাণপণে ধারণ করিতে হইবে। ভগবানের নাম, হরিস্মরণ বিনা বঙ্গদেশেরই বল, ভারতেরই বল, নবজীবন সঞ্চারের সম্ভাবনাই নাই। এই বঙ্গের বিকারের দুর্দ্দিনেও সেই ভগবৎনামের মৃতসঞ্জীবনী সুধা মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়া দিতে সক্ষম। মতভেদের জন্য বিরক্ত হইবার কারণ নাই। তোমাদের মতে সায় দিতে না পারিলেই কাহাকেও স্বদেশদ্রোহী আখ্যা প্রদান করিয়া স্বয়ং পাপে নিমগ্ন হইও না। লজ্জানিবারণ বিপদকাণ্ডারী ভগবানকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হও। সন্তানগণকে কোলাহলে মত্ত হইতে না দিয়া এই একই ব্রতে ব্রতী কর; দেখিবে, আপনাদের মোহান্ধতা সর্পকঞ্চুকের মত খসিয়া যাইবে; সকলেই শরীরে অপূর্ব্ব বল ও দিব্য কান্তি লাভ করিবে, হৃদয়ে এক অপরিমেয় সাহস লাভ করিবে—কেবল বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতের সত্যকার মহান সম্মিলন পুনঃ

সাধিত হইবে। তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আবার সাধু মহাত্মাগণের সাধু আলাপে, সাধু সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে। তখন সকলেরই চক্ষু নির্নিমেষভাবে সেই ভগবানেরই প্রতি নিবদ্ধ থাকিবে—শতসহস্র মনুষ্যের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সুদূরে পলায়ন করিবে।

সেইদিন শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শেষ শ্লোক সার্থকতা লাভ করিবে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

যথায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথায় পার্থ ধনুর্ধর, তথায়ই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও নিশ্চলা নীতি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ভারতোদ্ধার ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক
অষ্টাবিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

বারতা নব ।*

চলে যা রে—

চলে যা আমার গান
উনমুক্ত শূন্যপথ দিয়া
আদি অন্তে জগত ছাইয়া
চলে যা আমার গান ।
প্রেম দিয়া গলারে পাষাণ
ঢেলে দেরে অসীম পরাণ
হে মহা অনন্ত-গান ॥

মহা বিশ্বে খেলে তা'রা
আপনা-অনন্ত-হারা
লইয়া শিশুর মত
পুত্তলিকা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এনেছি [illegible]
শুনিয়া জাগিবে তারা ;
মোহকারা টুটি সব
ছুটিবে পাগল পারা

---

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত ।

পুত্তলিকা শত রেখে
অনন্তেরি ক্রোড় দেখে।
এনেছি বারতা নব—
অনন্ত প্রেমের বলে
মোহ-আঁধা দলি সব
নূতন অসীম বলে
ধাইবে মায়ের পানে
নূতন জাগ্রত প্রাণে॥

তাই বলি গেয়ে যারে—

গেয়ে যা আমার গান
তপনের সাথে সাথে
গেয়ে যা আমার গান
প্রচণ্ড ঝটিকা সাথে
গেয়ে যা আমার গান
মধুর জোছনা রাতে
গেয়ে যা আমার গান
সুমন্দ দখিনা বাতে—
প্রেমাকরে প্রাণে জানি—
বাধা কোন নাহি মানি—
নূতন আসিবে আলো
কুসুম ফুটিবে ভালো
নূতন হাসিবে চাঁদ
প্রাণ করি উনমাদ॥

তাই বলি চলে যারে—

চলে যা আমার গান

আকাশের মধ্য দিয়া

মরুভূর মধ্য দিয়া

চলে যারে চলে যারে—

অনন্ত প্রেমের গান

অনন্ত প্রাণের গান ॥

—ঃওঁঃ—

ত্রিংশ আলাপ—ভাষা।*

মনুষ্যজাতি পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিবার কালে যত প্রকার চিহ্ন দ্বারা মনের ভাবগুলি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, সে সকলই ভাষার মধ্যে অন্তর্গত হইতে পারে।

প্রথম যখন মানবজাতি সৃষ্ট হইল, তখন তাহারা আপনার আপনার মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে উৎসুক হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রথমতঃ শারীরিক অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অল্পস্বল্প ভাব ব্যক্ত হইতে লাগিল। হয়ত গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিলে ভাবনা বুঝাইত। কিন্তু মানবমণ্ডলী যতই উন্নতিপদে আরোহণ করিতে লাগিল, ভাবের প্রসারতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং তখন কেবলমাত্র শারীরিক চিহ্নের দ্বারা সমস্ত ভাব প্রকাশ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্য লোকে প্রকার চিহ্ন খুঁজিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে চিত্রাত্মক অক্ষর (Hieroglyphic) আবিষ্কৃত হইল। যেরূপ কার্য্য হইত, তাহার আকৃতি আঁকিয়া বুঝান হইত। যদি বন্যা হইত, তাহা হইলে সমস্ত জল, মাঝে মাঝে এক একটী বাড়ীর বা বৃক্ষের শিখরদেশ জলের উপর জাগিয়া আছে এইরূপ প্রতিকৃতি দ্বারা বুঝান হইত। মিসর দেশে এইরূপ অক্ষরের বিশেষরূপ চলন ছিল। অন্যান্য দেশেও ইহার চলন ছিল বটে; কিন্তু মিসরের ন্যায় বিস্তৃতরূপে নহে। একবার দেরায়স নামে পারস্যরাজ সীথিয়া দেশ জয় করিতে গিয়া অধিবাসীদিগের নিকট

---

* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত।

বশ্যতাস্বীকার প্রার্থনা করিলেন; তাহাদের দূত দেরায়সকে এক পক্ষী, এক ইন্দুর এক ভেক এবং পাঁচটী তীর উপহার প্রদান করিল। রাজা মহা আনন্দিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে ইহাই বুঝি সীথিয়দিগের বশ্যতাস্বীকারের চিহ্ন। ইতিমধ্যে এক পারিষদ্ বলিয়া উঠিল—"না, না, মহারাজ ইহার অর্থ বশ্যতা নহে; আমার নিকট শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক; ইহার অর্থ এই যে যদি আপনি পক্ষীর ন্যায় উড়িতে না পারেন, যদি ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তমধ্যে বাস করিতে না পারেন এবং যদি ভেকের ন্যায় সন্তরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে সীথিয়দিগের ধনুর্ব্বাণ হইতে আপনার রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। কালে এইরূপ সঙ্কেত হইতেই চিত্রাত্মক অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমে ভাবের সম্পূর্ণতার সহিত অক্ষরেরও সম্পূর্ণতা হইতে চলিয়াছে।

অক্ষর অসম্পূর্ণ থাকিলে ভাষাও অসম্পূর্ণ থাকে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ। ইহাও একেবারে সম্পূর্ণ নহে। ইংরাজীতে 'ত' একেবারে নাই; ফরাসী ভাষায় 'ট' একেবারে নাই। সংস্কৃত ভাষায় 'ত' ও 'ট' উভয়ই আছে। কিন্তু ইহাতেও 'জেড্'(z) নাই। অন্যান্য ভাষায় অধিক অসম্পূর্ণতা; সংস্কৃত ভাষায় অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষা প্রায় সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ; সুতরাং ইহাতেও অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অপূর্ণতা অল্প বিদ্যমান। ভাষা দ্বারা মানবের ইতিহাস অনেকটা অভ্রান্তরূপে জানিতে পারা যায়।

ভাষাকে যত প্রকারে দেখিবে, নিয়মও তত অধিক হইতে থাকিবে। ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম; উচ্চারণের কতকগুলি; অলঙ্কার শাস্ত্রের কতকগুলি; ন্যায় শাস্ত্রের কতকগুলি;

আর ভাষাতত্ত্বের কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলির প্রত্যেকটীর সহিত মিলাইয়া ভাষার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্টি করা যাইতে পারে।

ব্যাকরণ পড়িলে বুঝা যায় যে কি প্রকারে একটা পংক্তি বিশুদ্ধরূপে রচিত হইতে পারে; শব্দের কিরূপ পরিবর্ত্তনে অর্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে ইত্যাদি। অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে কিরূপে কোন্ কথা বলিলে অথবা লিখিলে লোকের মন সেইদিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়। ন্যায়শাস্ত্রের পক্ষে ভাষা তর্ক প্রকাশ করিবার একটি প্রধান উপায়। ভাষাতত্ত্ব যাবতীয় ভাষার সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া দেয়। এই ভাষাতত্ত্বের ইংরাজী নাম ফাইললজি (philology)।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ভাষা বিষয়ক ত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

একত্রিংশ আলাপ—ভূগোল।*

(সমালোচনা)

১। নূতন ভূগোল প্রবেশ (প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য) শ্রীবগলারঞ্জন দাস প্রণীত।

২। ভূগোল শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রণীত।

আমরা ভূগোলসম্বন্ধীয় উপরোক্ত দুইখানি পুস্তক পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি। প্রথম খানিতে লেখা আছে "প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য", দ্বিতীয় খানিতে ঐ কয়েকটী কথা লিখিত না থাকিলেও রচনাপ্রণালী হইতে বুঝিতে পারি যে এখানিও প্রথম শিক্ষার্থী কোমলমতি বালকদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। বালকদিগের কোমল মস্তিষ্কের মধ্যে কঠিন বিষয় সকল প্রবেশ করাইবার জন্য যে এরূপ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, ইহা কম আশাপ্রদ নহে। বালকবালিকার অভিভাবকদিগের মনে যে কঠিন বিষয় সকল তাহাদের কোমল মস্তিষ্কে সহজসাধ্যরূপে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের ন্যায় গ্রন্থপ্রকাশের চেষ্টা যত্ন তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে সকল গ্রন্থকার যে সেই অভীষ্ট বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না; আশা এইটুকু হয় যে ভবিষ্যতে বালকদিগের মস্তক হইতে অনেকটা গুরুভার নামিয়া যাইবে।

প্রথমোক্ত পুস্তকখানি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য লিখিত হইলেও তাহাদিগের যে সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলিতে

---

* ১৩০৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার পুণ্যে প্রকাশিত।

পারি না। ইহা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ভূগোলশিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে লিখিত। প্রথমেই ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষার সমাবেশ। ছাত্রেরা এইগুলি অক্ষরে অক্ষরে কণ্ঠস্থ করিতে পারে কিন্তু তাহারা যে ইহার এতটুকুও মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইবে, তাহা বলা দুরূহ। দুএকটী পরিভাষা বিষয়ে ছাত্রেরা যে কি ভাব সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, আমরা তাহা আদৌ স্থির করিতে পারিতেছি না। যেমন, "মহাসাগর (Ocean)—লবণাক্ত প্রকাণ্ড জলরাশির নাম মহাসাগর। যথা;—ভারত মহাসাগর এসিয়ার দক্ষিণে।" এইরূপ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত, স্থানাভাবে আমরা তাহাতে অসমর্থ। মহাসাগরের উক্ত সংজ্ঞা হইতে ছাত্রদিগের মনে একটা নুনগোলা জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণীর অধিক যে ভাব আসিতে পারে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এই পুস্তকের আর একটী দোষ, রাশীকৃত নগর নদী প্রভৃতির উল্লেখ। এইগুলি কণ্ঠস্থ করিতে গিয়া ছাত্রদিগের অন্নপরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এবং তাহারই ফলে আমরা যে দুর্ব্বল অস্থিসার ও সুতরাং কাপুরুষ বঙ্গসন্তান দেখিতে পাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এই দোষ গুলি কেহ যেন গ্রন্থকারের বুদ্ধিহীনতার ফল বলিয়া বিবেচনা না করেন—ইহা পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির ফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহদানের অভাবের ফল। বিশ্ববিদ্যালয় যাহা চাহেন, তাহার জন্য প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। প্রশ্নাবলী দিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সহায়তা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে উপরোল্লিখিত দোষসমূহের পরিহারের

জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার যে এবিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও বলা বাহুল্য ; উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু যে বিজ্ঞানশাস্ত্র আপনার অস্থিমজ্জার অংশ করিয়া লইয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থখানিতেই সম্যক প্রকাশ পাইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে বালক-দিগের জন্য ভূগোল প্রণয়ন করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রমের ও বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত। প্রথমেই বালকদিগের মানসিক ভাব, শক্তি প্রভৃতি সম্যক্ বুঝিবার জন্য মনোবিজ্ঞান আলোচনা করা বিশেষ আব-শ্যক এবং আনুষঙ্গিক আলোচনার বিষয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রসায়ন প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া পড়ে। তাহার পরে বিষয়গুলিকে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য সহকারে সজ্জিত করা প্রভৃতি বিষয়ে একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকাও আবশ্যক এবং তজ্জন্য উপযুক্ত যত্ন ও চিন্তা প্রয়োগ আবশ্যক। রামেন্দ্র বাবুর পুস্তকে এই সকলের বিশেষ পরিচয়ই পাওয়া যায়। বালকদিগের তরুণ মস্তকে যে ইষ্টক-কঠিন কতকগুলি নীরস ভৌগোলিক তত্ত্বের পরিবর্ত্তে সরস জ্ঞান প্রবেশ করাইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতাভাজন নিঃসন্দেহ। প্রথম পুস্তক হইতে মহাসাগরের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, এবারে দ্বিতীয় পুস্তক হইতে মহাসাগরের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিতেছি—পাঠকগণ ইহার বিশেষত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে জাহাজে ইংলণ্ডে যাইতে হয়। বাঙ্গালার দক্ষিণেই সমুদ্র। কলিকাতার

গঙ্গায় নৌকা চাপিয়া দক্ষিণমুখে কিছুদূর গেলেই সমুদ্র। সমুদ্র-পথে জাহাজে বিশদিনের মধ্যে ইংলণ্ড পৌঁছান চলে। মহা-সাগরের উপর দিয়া জাহাজ চলে। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ চলিবার সময় ডাহিনে থাকে। উপরে কয়েকটা মহাদেশের নাম করিয়াছি। মহাদেশ কয়টি ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীর আর প্রায় সমস্তই মহাসাগর। মহাদেশ পৃথি-বীর স্থলভাগ, মহাসাগর জলভাগ।” উপরোক্ত বিবরণের একটি স্থলেও মহাসাগরের পরিভাষা বা সংজ্ঞা উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু সমস্তটুকু পড়িলে মহাসাগরের বিশাল জলরাশির ভাব কি সহজেই বালকগণের অন্তরে উদয় হইবে না? যে বিষয় আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী জানে এবং যাহার জন্য বিদ্যালয়ের অনেক ভাল ছাত্রেরা উন্মুখ হইয়া থাকে, সেই বিলাতযাত্রা হইতে রামেন্দ্র বাবু মহাসাগরের কথা আনিয়া বুদ্ধিমান অধ্যা-পকের কার্য্যই করিয়াছেন—ছাত্রদিগের নিকট মহাসাগরকে একটি মনোরঞ্জক জ্ঞাতব্য বিষয় করিতে পারিয়াছেন। আরও দুইটী বিষয় এই বিবরণে সংযুক্ত হইলে ভাল হইত বোধ হয়—সমুদ্রজল যে লবণাক্ত ইহা বলা আবশ্যক; দ্বিতীয়, সাগর-সঙ্গম তীর্থযাত্রার উল্লেখ করিলে বোধ হয় বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সাগরের বিষয় আরও মনোরঞ্জক হইত। রামেন্দ্র বাবুর পুস্ত-কের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসকে ভূগোলের অংশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছেন “দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মনুষ্যের ইতিহাসের সম্বন্ধ দেখানই ভূগোলশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য; ইহাই মূলসূত্র ধরিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।” এশিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক

অংশ ও একস্থলে আমাদের বোধ হয় যে, কিছু সংহত করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় আর একটু বিস্তৃত আকারে অর্থাৎ আর একটু গল্পের ভাবে বলিলে ভাল হয়। অবশ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিবার আশা করি এবং দ্বিতীয় সংস্করণ যে আরও উৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ আছি। এই পুস্তকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কণ্ঠস্থ করিবার জন্য রাশীকৃত নদনদী নগর উপনগর প্রভৃতির নাম পিণ্ডাকারে প্রদত্ত হয় নাই।

এইবার ইহার আর একটী বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব—তাহা জাতীয়তা। ভূগোলে জাতীয়তা নামক অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া অনেকেই যে উপহাস করিতে আসিবেন, তাহা জানি ; কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতে জাতীয় ভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির বিলম্ব হইবে না বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। রামেন্দ্র বাবু ভারতবর্ষের নগর উপনগর উল্লেখ করিতে গিয়া প্রাচীন গৌরবের আশ্রয়স্থল নানাস্থানের যে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই এই জাতীয়তা সম্যক্ প্রকাশ পাইয়াছে—এবং এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের পুস্তকে ও শিক্ষাদান কালে আমাদের রক্তমাংসপরিপোষক বিষয় সকলের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। রামেন্দ্র বাবু বাছিয়া বাছিয়া শান্তিপুর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ প্রভৃতি যে সকল স্থান যে ভাবে আমাদের হৃদয়ে রক্তমাংস আনিয়া দিতে পারে, সেই সকল স্থানের সেই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ; অনেকগুলির প্রাচীন মহিমা সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—ইহাতে ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়কে অতীতের দিকে কতদূর বিস্তৃত

করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ জাতীয়তা রক্ষিত হয় বলিয়া ইংরাজজাতি বাল্যকাল হইতে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

যাই হৌক্, রামেন্দ্র বাবু "প্রকৃতি" পুস্তকের পর এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসন্তানমাত্রকেই উপকৃত করিয়াছেন। তিনি যে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কার্য্য ব্রহ্মচারী বালকদিগের শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি আমরা যে কি পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা একমুখে বলিতে পারি না।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
ভূগোল বিষয়ক একত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

দ্বাত্রিংশ আলাপ—মাকড়সার জাল।*

আমরা দেখি যে মাকড়সা নিজের দেহ হইতে একপ্রকার সূত্র বাহির করিয়া আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার এক একটী সূত্র যেরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হয়, তাহা ভাবিতে গেলে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া পড়িতে হয়। প্রত্যেক মাকড়সার উদরের শেষ ভাগে চারিটী বা ছয়টী সূত্র-নির্ম্মাণ যন্ত্র আছে। প্রত্যেক যন্ত্রে আবার কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিত (Reaumer) বলেন যে, এই এক একটী যন্ত্র এক একটী সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীতে সহস্র করিয়া সূক্ষ্মতর ছিদ্র আছে। ঐ সকল ছিদ্র হইতে সহস্রধারে সূত্র নির্গত হইয়া সূত্রনির্ম্মাণ যন্ত্র হইতে দশ ইঞ্চি দূরে একত্র মিলিত হয়। তখন আমরা জাল নির্ম্মাণ করিবার একটী মাত্র সূত্র প্রস্তুত দেখিতে পাই। চারি হাজার সূত্রে একটী সূত্র প্রস্তুত হইল, অথচ তাহা এত সূক্ষ্ম যে সহজে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। কে এই মহান কৌশ--লের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারে যে ইহার স্রষ্টা নাই—ইহা ঘটনাচক্রে ঘটিয়া গিয়াছে? ইহাও সেই বিশ্বকর্ম্মারই সৃষ্টি, যাঁহার ইচ্ছায় এই দ্যুলোক ভূলোক সমুদয় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

---

* ১৮১৩ শক আশ্বিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
মাকড়সার জাল বিষয়ক দ্বাত্রিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

ত্রয়ত্রিংশ আলাপ—কবি রসসাগর।*

৺ কবি রসসাগরের জীবনচরিত—শ্রীশ্যামাধর রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। রসসাগরের প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। তাঁহার সুরসিকতা প্রভৃতি কারণে নবদ্বীপাধিপতি ৺ গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া "রসসাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভাদুড়ী উপাধিতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের নিকটবর্ত্তী বাঁড়িবাঁকা গ্রামে ১১৯৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ সালে তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহারপরলোকপ্রাপ্তি হয়।

তাঁহার প্রধান গুণ ছিল উপস্থিত রচনা। কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ উপস্থিত রচনা বঙ্গবাসীর বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচালী, কবির লড়াই প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। বর্ত্তমানে থিয়েটারের ন্যায় কিছু পূর্ব্বে পাঁচালী প্রভৃতি ধনীদিগের ততোধিক প্রিয়বস্তু ছিল। অনেক উপস্থিত কবি তাঁহাদিগের পারিষদরূপে নিয়মিত বেতন ভোগ করিতেন। দুঃখের বিষয়, ক্রমে এইরূপ উপস্থিত রচনা পরনিন্দা প্রভৃতি কুৎসিত ও অশ্লীল বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহপ্রাপ্ত না হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

রসসাগর যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শ্লোকগুলি জীবনী সহকারে কতনা নূতন সংস্করণে

---

* ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে লিখিত।

প্রকাশিত হইয়া পুস্তকাগার সমূহের শোভা বর্দ্ধন করিত। শ্যামাধব বাবু যে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুভার সত্ত্বেও এই উপস্থিতবক্তার জীবনীসংগ্রহে যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে বঙ্গবাসীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে নিঃসন্দেহ। সমালোচ্য গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণের ; প্রথম সংস্করণ প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি যে এই দ্বিতীয় সংস্করণে রসসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। প্রকাশক নবদ্বীপাধিপতির অতি নিকট আত্মীয় হইয়াও যখন বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা করিতে যাওয়া দুরাশা মাত্র। তথাপি এই পুস্তকের অতিরিক্ত দুএকটী বিষয় যাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহাও এই স্থলে উল্লেখ করিব। রসসাগরের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের অকালমৃত্যু ঘটে এবং কন্যাটীর শান্তিপুরে বিবাহ হয়। রসসাগর জীবনের শেষভাগ জামাতৃগৃহেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের রাজবংশ বিদ্যার উৎসাহদানে মুক্তহস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহারাজা গিরীশ চন্দ্র রায়ও যে এবিষয়ে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইনিই উৎসাহদানে রসসাগরের রসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাইতে পারিয়াছিলেন। একদা রাজসভায় রসসাগর চারি চরণে একটী সমস্যা পূরণ করিয়া মহারাজার নিকট চারি টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। রসসাগর চরণে চরণে টাকা দেখিয়া কহিলেন "মহারাজ,যদি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করেন, তবে অন্যভাবে ছয় চরণে এই সমস্যা পূরণ করি।" ইহা বলিয়া তিনি ছয় চরণে পাদপূরণ করিয়া ছয় টাকা পুরস্কার পাইলেন।

পুনরায় আট চরণে ঐ সমস্যা পূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রসসাগরের দ্রুতপূরিত শ্লোকগুলিতে যদিও ছন্দোবিষয়ক কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হইত, কিন্তু অবকাশ-রচিত কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইত। তিনি যখন এমন উপস্থিতমত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, তখন তিনি যে রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন, তাহাও বলা বাহুল্য। একদা কোন ভূম্যধিকারীর বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েন। দক্ষিণা প্রদানের গৃহদ্বারটী কিছু ক্ষুদ্র ছিল। প্রবেশ করিবার কালে রসসাগর আঘাত পাওয়াতে সভাস্থ সকলে হাসিয়া কহিলেন "আহা বড় লাগিয়াছে।" রসসাগর তদুত্তরে "কি করি, ছোট দুয়ারেতো কখনো আসা অভ্যাস নাই" বলিয়া সকলকে অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ করিয়া দিলেন।

একবার রাণাঘাটে পালচৌধুরী বাবুদিগের বাটীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছিল—লোকে লোকারণ্য। রসসাগর সেই ভিড় ঠেলিয়া যাইতে পারিতেছেন না—এখন উপায়? দেখিতে দেখিতে যাত্রার বাসুদেব রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখা গেল। রসসাগর এই অবসরে সেই বাসুদেবকে খুব জোরে জড়াইয়া ধরিলেন। বাসুদেবের যত ডাক পড়ে, বাসুদেব ততই চীৎকার করে যে "আমার নড়িবার জো নাই, আমাকে এক বামুনে ধরেছে।" বাবুরা তখন বাহিরে আসিয়া দেখেন যে রসসাগর বাসুদেবকে ছাড়িতেছেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এরূপ না করিলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিব কিরূপে?" বলা বাহুল্য যে তিনি সাদরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন।

সমস্যাপূরণেও রসসাগরের আশ্চর্য্য ক্ষমতার দুএকটী পরিচয় দিয়া এই পুস্তকের সমালোচনার উপসংহার করিব। মহারাজ "টুক্ টুক্ টুক্" বলাতে রসসাগর নিম্নলিখিত চারি প্রকারে পাদপূরণ করিলেন—

১

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতলে স্থিতি॥
অবৈধ দেখিয়া হর পেতে দিলেন বুক।
হরহৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

২

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর-অরি পেতে দিল বুক।
অসুরের কাঁধে পদ টুক টুক টুক॥

৩

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণ পদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্ত নাহি হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কৌতুক।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক টুক টুক॥

৪

পথ মধ্যে দাঁড়াইয়া পরমা সুন্দরী।
ভুবনমোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুখ।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক টুক টুক॥

এইরূপ একটী চরণ হইতে নানাভাবে উপস্থিতমত পাদপূরণ যে ক্ষমতার কাজ, তাহা বলা বাহুল্য।

কঠিন সমস্যাও তিনি সহজে পূরণ করিতেন। একদা প্রশ্ন হইল—"রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।" এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজকালকার ছেলেদের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও চলে। রসসাগর তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া উত্তর দিলেন—

লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে।
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল॥

এখানে লক্ষ্মী শব্দে তণ্ডুল ও নারায়ণ শব্দে জল বুঝাইতেছে। ভাত হইবার সময় যত জ্বাল দেওয়া যায়, ততই জল চালের ভিতর প্রবেশ করে।

আমরা আর দুইটী দৃষ্টান্ত দিব। প্রশ্ন হইল "বড় দুঃখে সুখ"। রসসাগর পূরণ করিলেন—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেন ঘরে॥
চকা কয় চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

কোন সময়ে রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় ডাকহরকরা ঘাটে আসিয়া ডাকিতে থাকায় হঠাৎ উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন রসসাগরের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "মুকুন্দ মুরারে।" রসসাগর উত্তর দিলেন—

পাপের পুলিন্দা বয়ে ভগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

এই কবিতা যে দ্ব্যর্থবোধক, তাহা বিবেচক পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত পাত্রেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত ঠাকুর গোষ্ঠীর যেরূপ সদ্ভাব ও বন্ধুতা আছে, তাহাতে ঠাকুর গোষ্ঠীর মহারাজকুমার (বর্ত্তমানে মহারাজা) শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া প্রকাশক তাঁহার বন্ধুতার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

বহুবৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আমাদেরও এরূপ দীর্ঘ সমালোচনার কারণ এই যে গ্রন্থ খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহার মূল্য আছে এবং ইহা আমাদের সম্মানলাভের উপযুক্ত পাত্র।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
কবি রসসাগর বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—:ও:—

শ্যামল মরুভূমি ।*

মুহূর্ত্তের তরে এসেছি হেথায়
আবার যাইব চলে ।
কে কোথায় তখন রহিব পড়ে
কোন্ লোকলোকান্তরে ॥
তাই যতদিন আছি এ জগতে
ক্ষুদ্র ধরি' এই প্রাণ ।
গাহিব কেবলি তোমারি মহিমা
তোমারি মঙ্গল নাম ॥
ধরণী ছাড়িয়া সে গান চলিবে
অনন্তের মধ্য দিয়া ।
পদতলে তব ভাঙ্গা ভাঙ্গা তানে
শোনাবে দগধ হিয়া ॥
প্রেমবারি দিয়া করিবে শ্যামল
মরমের মরুভূমি ।
আবার হাসিব
নয়ন মুছিয়া
আবার গাহিব
জয় ভগবান তুমি ।
ধন্য হোক মরুভূমি ॥

—:ও:—

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত।

পঞ্চত্রিংশ আলাপ—রাজা রামমোহন রায়।*

কালিদাস রঘুবংশের গুণকীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ"। আমিও আজ মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুণকীর্ত্তনের পূর্ব্বে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি—কোথায় সেই ধর্ম্মের বলে বলীয়ান, স্বার্থের প্রতি নির্ম্মম, অগাধ বুদ্ধিমান রাজা রামমোহন রায়, আর কোথায় আমি! আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, পাছে দীর্ঘকায় ব্যক্তিলভ্য ফলের প্রতি আসক্তচিত্ত বামনের ন্যায় আমার অক্ষমতা বশত উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর নিকট উপহাসভাজন হইয়া পড়ি। কিন্তু এই ভয়ের কারণ সত্ত্বেও যে এখানে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি, তাহার কারণ এই যে, আজ এমন একটী দিন, যে দিন প্রতি বঙ্গবাসীর, কেবল বঙ্গবাসীর কেন, সমস্ত ভারতবাসীর সেই মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যাঁহার রোপিত বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতে আমরা সকলেই বিশ্রাম লাভ করিতেছি এবং যাঁহার ভস্মাবশেষ শতযোজন দূরে থাকিয়া ইংলণ্ডকে আমাদিগের তীর্থস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। যে মহাত্মার সাধনার বলে আমরা বর্ত্তমান সৌষ্ঠবসম্পন্ন বঙ্গভাষার বীজ প্রাপ্ত হইলাম; যাঁহার সাধনার বলে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের উত্থানশীল কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের জন্মদান করিয়াছে; যাঁহার সাধনায় নিষ্ঠুরতম সতীদাহ উঠিয়া যাওয়াতে কত ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা মাতা, পিতার শোকে শোকার্ত্ত পুত্রকন্যাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং যে মহাত্মার যত্ন ও

* রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় ১৮১৩ও ১৮১৪ শকে বিবৃত।

পরিশ্রমের ফলে আমরা আমাদিগের সেই পুরাতন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিয়াছি, এমন হিতৈষী বন্ধুর মৃত্যুতে কোন্ ভারতসন্তান,ভারতরমণী শোকসন্তপ্তচিত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন ? সেই শোক প্রকাশ করিবার জন্য আজই উপযুক্ত দিন ; তাই শত উপহাসের নির্ম্মম কটাক্ষের ভয় সত্ত্বেও আজ এই শোকের দিনে তাঁহার জীবনের দুইচারিটী কথামাত্র, তাঁহার নানাবিধ গুণের মধ্যে দুই চারিটী গুণের বিষয়মাত্র, উপস্থিত বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিয়া আমার জীবনকে শীতল করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত পাঠ করিলে জ্বলন্তভাবে অনুভব করি যে তিনি একজন স্বদেশ-প্রেমিক, উদারহৃদয় নব্যভারতের সংস্কারক ছিলেন। অভাব উপস্থিত হইলেই তাহা দূর করিবার উপায়ও উদ্ভাবিত হয় বলিয়া একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে—ইহা অতি যথার্থ। আমরা তাঁহাকেই তত অধিক মহৎ লোক বলিব, যিনি যত পরিমাণে এই অভাব অন্বেষণ করিয়া আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও অভাব নিরসনের উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, ভারতবর্ষ তান্ত্রিক আচারের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল ; পশুবলি যে কত হইত, তাহার কে সংখ্যা করিবে ?—সময়ে সময়ে নরবলি পর্য্যন্ত হইত শুনা গিয়াছে। ক্রমে দেবতার পূজার জন্য যত হউক বা না হউক, নিষ্ঠুর পশুবলি তান্ত্রিকদিগের উদরের এবং তৎসঙ্গে হিংসা, নিষ্ঠুর আমোদ প্রভৃতি পশুবৃত্তিরও পরিতৃপ্তি সাধন করিত। যে দেশের ঋষিগণ সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত

সংযুক্ত রাখিতে কহিয়াছেন; যে দেশের শাস্ত্রসমুদ্র নিবৃত্তি ও সংযমের শ্রেষ্ঠতা সহস্র সহস্র বৎসর ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, সেই দেশের সাধু ব্যক্তিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি তান্ত্রিকদিগের এরূপ অত্যাচার এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের এরূপ ভয়াবহ প্রশ্রয়দান কখনো কি সহ্য করিতে পারেন? তাই তদানীন্তন ধর্ম্মালোচনার প্রধানস্থান নবদ্বীপ হইতে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব উঠিয়া 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম' এবং 'ভগবদ্ভক্তিই জগতে সার' এই দুই মন্ত্রবলে, সঙ্কীর্ত্তনের উন্মাদিনী শক্তিতে, দয়াপ্রবণ ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত দয়াবৃত্তি ও ভগবৎপ্রেম জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। চৈতন্য তখনকার এই ধর্ম্মের অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্তর স্বার্থত্যাগের বলে তাহা মোচন করিলেন, তাই তিনি একজন মহাপুরুষ।

চৈতন্যদেব ধর্ম্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় ভারতবাসীর জন্য কেবল মাত্র ধর্ম্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। যাহাতে ভারতবাসীর কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তাহাই রামমোহন রায়ের প্রাণগত অভিলাষ ছিল। তিনি নব্যভারতের নানাপ্রকার অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই অভাব সমূহ নিরাস করিবার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইয়াছিলেন এবং আপনার সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেইগুলি দূর করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার ধর্ম্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বতোমুখী হইয়াছিল। ইহারই জন্য তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা পুরুষ এবং ইহারই জন্য তিনি নব্যভারতের সংস্কারকদিগের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু তিনি যে সকল নূতন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কারই সুদৃঢ় ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে স্বীয় ধর্ম্মপিপাসার বলে জ্ঞানের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, ঋষিদিগের সেই পুরাতন ধর্ম্ম আনয়ন করিলেন; পরে সেই ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিতে সামাজিক প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ই আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে, এই সকলেও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকারে রাজত্ব করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া সকলপ্রকার কুসংস্কারই উন্মূলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিলেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে নূতন সংস্কার ও পুরাতনপ্রিয়তার ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী জাতি সংগঠিত হইবার প্রথম সূত্রপাত হইল; এই সময়েই বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদিগের অজ্ঞাতভাবে এক জাতীয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চলিল।

ব্রহ্মবিদ্যা যে ভারতবাসীদিগের পৈতামহ সম্পত্তি, তাঁহাদিগের নিকট এবং বিশেষত তাঁহার স্বদেশীয় বঙ্গবাসীদিগের নিকট, সেই ব্রহ্মবিদ্যা আনয়ন করিতে গিয়া রামমোহন রায়কে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা আশ্চর্য্য নহে। সহস্র মূল্যবান পদার্থও অব্যবহারে ধূলিপরিপূর্ণ হইয়া মলিন হইয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণ বিস্তর সাধনার ফলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা ঘটনার স্রোতে পড়িয়া তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী অনেক বংশ মূর্ত্তিপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—এদিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপর নানাপ্রকার কুসংস্কার জঞ্জাল আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে আবরণ করিয়া ফেলিল। এই ব্রহ্মবিদ্যার দুএকটী

কিরণরেখা রাশীকৃত জঞ্জাল ভেদ করিয়া বাল্যকালেই রামমোহন রায়ের চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই বাল্যকালেই পিতৃপ্রদত্ত নির্ব্বাসন-দণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া তিনি কেবল এক মাত্র সত্যলাভের আশায় নির্ভয়ে অটলভাবে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক এক সুতীক্ষ্ণ কুঠারের দ্বারা অরণ্যভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি পিতামাতা কর্ত্তৃক বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং তিনি এই সময়ে একাকী পদব্রজে ভারতের বহিঃপ্রদেশে যাত্রা করিলেন ;—সে সময়ে আজিকার মত বাষ্পীয় যানের বেগপ্রভাবে শতশত ক্রোশ একটী দিনের মধ্যে যাওয়া যাইত না এবং সে সময়ে পথে পথে দস্যুদল পথিকদিগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত। "প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক সত্যের জন্য কতকষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে একাকী পরিব্রাজক হইয়া কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি কি অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।" যাহা হউক, তিনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া নানা বিঘ্নবিপত্তির পর চল্লিশ বৎসর বয়সে বাটী ক্রয় করিয়া কলিকাতায় সুস্থির হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় অবধি তাঁহার কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। এই সময় অবধিই তিনি একেশ্বরবাদ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই কোরাণ পড়িয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহা একেশ্বরবাদই প্রচার করিতেছে এবং তাহার পরে সংস্কৃতশাস্ত্র

সকল অধ্যয়ন করিতে গিয়াও দেখিলেন যে তাহাতেও ঐ একই কথা। তখন তিনি ভাবিলেন যে খৃষ্টানদিগের বাইবেল শাস্ত্রও নিশ্চয়ই একেশ্বরবাদ প্রচার করিবে; তাই তিনি বাইবেল পড়িয়া বাইবেলের মধ্য হইতে প্রমাণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে বাস্তবিক বাইবেলও একেশ্বরবাদই প্রচার করিতেছে। বাইবেল হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার আর একটী প্রধান কারণ এই যে, সেই সময় মিসনরিগণ দেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় যদিও মুসলমানদিগকে কোরাণ হইতে এবং খৃষ্টানদিগকে বাইবেল হইতে দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদই প্রচার করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ এই ছিল যে প্রথম স্বজাতি ও স্বদেশীয়দিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ ব্রহ্মবিদ্যা; তাঁহাদিগের প্রিয়তম হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু সেই একমাত্র শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরব্রহ্ম।

রামমোহন রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের এমনই দুরবস্থা ছিল যে, তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মকে, সেই আর্য্য ঋষিদিগের পবিত্র ধর্ম্মকে কুসংস্কারের ঘোর কণ্টকারণ্য হইতে মুক্ত করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন নামত হিন্দুদিগের নিকটে অহিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, ইহার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ বোধ হয় এমন কোন হিন্দু নাই যিনি রামমোহন রায়কে অহিন্দু বলিতে সাহসী হইবেন। রামমোহন রায় বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া তাঁহার হিন্দুনামের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি বৈদান্তিকের ন্যায় অথবা অন্য কোন প্রকারের একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি যে প্রকারের একেশ্বরবাদী হউন না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, তিনি পাপপুণ্যের একাকার ভাবপ্রবর্ত্তক নীরস শুষ্ক বেদান্তমতের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচলিত মতানুসারে কোন প্রকারেই তাঁহাকে একজন বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে না। তিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম, পরে যাহার নামান্তর হইয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাই তিনি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তসূত্রের যে টিপ্পনীর সহিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যে বিচার চলিয়াছিল, তাহারই কয়েক স্থান দেখিলেই এবিষয় বোধগম্য হইতে পারিবে। রামমোহন রায় জানিতেন যে প্রচলিত অপ্রকৃত বেদান্তমত বড়ই অনিষ্টকর, তাই তিনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত প্রভৃতি পড়ানো হইবে শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুকলেজ সম্বন্ধীয় প্রার্থনাপত্রে লিখিলেন যে 'বৈদান্তিক মত সমস্ত বস্তুর সত্তা লোপ করিয়া দিয়া একাকার ভাব প্রচার করে, তাহা শিক্ষা করিলে বালকেরা সামাজিক প্রভৃতি কোন কর্ম্মেরই উপযুক্ত হইবেক না।'* এই প্রার্থনাপত্র পড়িলেই মনে মনে এই প্রশ্ন

---

* Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection and therefore the sooner we escape from the world the better.

উঠে যে যদি তাঁহার বৈদান্তিকের বেদান্ত প্রচার করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী হইলেন কেন? আর এক কথা এই যে, যদি তিনি কেবল প্রচলিত বেদান্তই প্রচার করিতেন, তবে অন্যান্য আরও অনেক বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের কথা শুনা যায় না, কেবল তাঁহার প্রতি অত্যাচার হইত কেন? সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও বেদান্ত প্রচার করিতে গিয়া অন্যান্য নানা সুবিধা সত্ত্বে এক ব্রহ্মসভা স্থাপনের জন্য তাঁহার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহাতে সকলেই ব্রাহ্মের প্রকৃত অর্থে তাঁহাকে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম, যথার্থ ভক্ত ব্রাহ্ম বলিবে।

তাঁহাকে বৈদান্তিকগণ যে বৈদান্তিক বলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি, যখন তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমানেরা মুসলমান এবং খৃষ্টানেরা খৃষ্টান বলিতে পারিয়াছিল। সকল ধর্ম্মের একেশ্বরবাদটুকুর সহিত তাঁহার অতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল; এইজন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ভাবিতেন। তাঁহার উদারতা এত বিস্তৃত যে আধুনিক থিওসফিষ্টগণও তাঁহার জীবন ও কার্য্যের মধ্য হইতে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বদলে গ্রহণ করিয়াছেন।

হে স্বদেশীয়গণ, তোমরা মনশ্চক্ষে অনুধাবন পূর্ব্বক দেখ, তোমরা রামমোহন হইতে কত না পাইয়াছ। তিনি যদি সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ না লইতেন, তবে তাহা বিধিবদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা হইলে আজ কত

সুকুমার বালক বালিকাকে পিতৃহীন ও মাতৃহীন দেখিতে হইত। এই সতীদাহের বিষয় ভাবিয়া আমরা এখন কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হই বটে—কিন্তু তখনকার লোকদিগের ইহাতে লেশমাত্র ক্লেশ হইত না। রোমকেরাও মনুষ্যদিগকে সিংহমুখে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও অভ্যাসবশত কিছুমাত্র ক্লেশ বা দুঃখ অনুভব করিত না, প্রত্যুত আমোদ উপভোগ করিত। আজ পর্য্যন্ত আমি দুএকজন এমনও লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সতীদাহই স্ত্রীর সতীত্বরক্ষার এক অমোঘ উপায়। আমরা তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলি যে তাঁহারা যেন এপ্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যঞ্জক মত সকল প্রচার করিয়া না বেড়ান—তাঁহাদের মত তাঁহাদের মধ্যে থাকিলেই সংসারের কিছু উপকার হইতে পারে।

রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন মহাত্মা পুরুষ যে সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহার আত্মা উদার, তাঁহার নানা ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র কার্য্যে উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। রামমোহন রায়ের সহিত সতীদাহের পক্ষপাতীগণ তর্ক করিবার কালে সতীদাহের পক্ষে যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিতান্ত সঙ্কীর্ণ আত্মার সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু রমেমোহন রায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো দীপ্তিমান হইয়াছে। তিনি সতীদাহ-পক্ষপাতীদিগের নারীজাতির প্রতি অযথা অপবাদসমূহের সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ

করিয়া তবে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির কষ্ট দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিত। এই কারণেই তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে, হিন্দু বিধবা রমণীগণ মৃত স্বামীর বিষয়ের একাংশের অধিকারী হয়েন।

ইহজগতে অখিলমাতা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ, স্নেহ-মমতায় মাতৃস্থানীয় নারীজাতির প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, যিনি নারীজাতির মাতৃত্বকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করিতে পারেন, তিনি বোধ হয় যথার্থ বড়লোক কদাপি হইতে পারিবেন না। সম্প্রতি যিনি সমস্ত ভারতকে কাঁদাইয়া আনন্দধামে গমন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীজাতির প্রতি কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, তিনি একদা গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর হইয়া এক দোকানে গিয়া দোকানীর নিকট জলপ্রার্থনা করিলেন। দোকানী কেবল জলই দিতে প্রস্তুত হইল; তাহার স্ত্রী স্বামীকে কেবলমাত্র জল দিতে নিষেধ করিয়া প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিতে বলিল, তাহাতে দোকানী ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল যে তাহার জ্বালায় সংসারে কিছু সঞ্চিত থাকিবার উপায় নাই। স্ত্রী এরূপ তিরস্কার সহ্য করিয়াও ক্ষুধার্ত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু আহারীয় আনিয়া প্রদান করিল। এই এক ঘটনাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির সুকোমলভাব, মাতৃত্ব সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি যেমন আপনার মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতারূপে দেখিতেন, সেইরূপ সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখিয়া তাঁহাদিগের দুঃখনিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ও স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি যখন তিব্বত প্রদেশে একাকী অসহায় অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই তাঁহাকে পুরুষদিগের সহস্রপ্রকার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিল। রামমোহন রায়ও এই একটী ঘটনাতেই স্ত্রীজাতির হৃদয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার জীবনের শেষভাগেও যখন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু বহিতে থাকিত। সেই যে তিনি তিব্বত হইতে স্ত্রীজাতির স্নেহমমতা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছিলেন, জীবনের শতসহস্র বিঘ্নবিপত্তিও তাহা মুছিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। "স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি চমৎকার। স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দিতেন না; হয় স্ত্রীলোকটীকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।" * তিনি যে কেবল স্ত্রীজাতির সহিত উত্তম ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহাদিগের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। হিন্দু রমণীগণের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অপর কে ততটা করিতে পারিয়াছে? আজ কত অনাথা হিন্দুবিধবা হয়তো রামমোহন রায়ের নামও জানেন না, কিন্তু তাঁহারই রোপিত মহান বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতেছেন। কত হিন্দু বিধবা তাঁহারই কল্যাণে সহমরণ হইতে রক্ষা-

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।"

প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাদিগের জীবন সার্থক করিয়া সংসারের সুখশান্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন।

তাঁহার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লেখা পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা ও প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত না হইলে আমাদিগের দেশের শ্রেয় নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা অথবা মার্কিণ মুলুকের স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলিতেছি না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা এই বলি যে ধর্ম্মকার্য্য, গৃহকর্ম্ম, লেখাপড়া প্রভৃতি সকল প্রকার সৎবিষয়ে যেমন পুরুষের স্বাধীনতা আছে, তেমনি সকল প্রকার সৎবিষয়ে স্ত্রীলোকেরও স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। অসৎ বিষয় হইতে যেমন পুরুষদিগকেও রক্ষা করা কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুরুষদিগকে অসৎ বিষয় হইতে যদি রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে যে স্ত্রীলোকদিগকেও রক্ষা করিবে না, তাহা নহে। এবিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে না। অসৎ বিষয় হইতে পুরুষদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে; সৎবিষয়ে পুরুষদিগকেও স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। স্ত্রীজাতি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বিচ্যুত থাকিবেন; তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের এই অনন্ত সুন্দর বিশ্বরাজ্যের আলোচনা হইতে বঞ্চিত থাকিতেই হইবে? সকলেই জানেন যে বিগত কলিকাতার মহাপ্রদর্শনীতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য সপ্তাহে একদিন বিশেষরূপে নির্দ্ধা-

রিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদিগের অনেকে মানবের বুদ্ধির ভাণ্ডারস্বরূপ এই মহাপ্রদর্শনী একটীবারও চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। আমি আমার দুএকটী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা তাঁহাদিগের পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোককে এই মহাপ্রদর্শনীতে একটী দিনের জন্যও পাঠান নাই। স্ত্রীজাতিকে এইরূপ কঠোর পরাধীনতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহারা স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর ভাব হারাইয়া ফেলিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের সন্তানগণও যে স্বাধীনতার ভাব-বিবর্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ রুগ্ন থাকিলে অপর অর্দ্ধাঙ্গও রুগ্ন হইয়া পড়ে। এবিষয়ে যুক্তি যেমন আমাদিগকে পথ দেখাইতেছে, শাস্ত্রও সেইরূপ পথ দেখাইতেছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে "গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা" এবং "যেখানে নারীগর্ণ সম্মানিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন।"

নব্যভারতে ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনও রামমোহন রায় প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। রাজনীতির সহচর আইন বিষয়েও তিনি অতি উত্তম প্রস্তাব সকল লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোন সভায় সভাপতি অনরেবল শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন, ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলে যে কোন ব্যবহারাজীবের পক্ষে তাহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত। তাঁহার আইনের জ্ঞান যথেষ্ট থাকাতেই তিনি আমাদিগকে এক বিষয়ে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারক সার

চার্লস গ্রে কোন মকদ্দমায় প্রচলিত প্রথাবিরুদ্ধ একটী নিষ্পত্তি করেন যে, "পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দানবিক্রয় করিতে পারিবেন না।" ইহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় এদেশে বিস্তর শাস্ত্র প্রমাণাদি দর্শাইয়া আন্দোলন করিলেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি স্বজাতির মুখপাত্র হইয়া উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিলেন—প্রিভি কাউন্সিল হইতে সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইল।

আজকাল যে এত বেসরকারী বিদ্যালয় দেখিতে পাই, তাহারও প্রথম সূচনা দেখি রামমোহন রায় করিয়াছিলেন। তিনি কেবল আপনি এক বিদ্যালয় খুলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের পত্তন করাইয়া দেনও তিনি। ডফ সাহেব বীটন সভাতে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় বা ইউরোপীয় আর কোন ব্যক্তির নিকট সেরূপ সহায়তা পান নাই।

বর্ত্তমানকালের সাহিত্যসেবকগণও তাঁহার নিকটে বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার পূর্ব্বে গদ্যসাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। "প্রতাপাদিত্যচরিত" প্রভৃতি দুএকখানি গদ্য গ্রন্থ মাত্র ইংরাজদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের ভাষা বঙ্গভাষা নহে, অনুস্বর-বিসর্গ-রহিত সংস্কৃত মাত্র। সে ভাষার সহিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সমূহের ভাষার প্রভেদ বিস্তর। রামমোহন রায়ের বিভিন্ন ভাষা জানা ছিল এবং তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাবসমূহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন আসিল; সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা

গদ্য লিখিবার পথপ্রদর্শন সহজ হইল। প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বিষয় না থাকিলেও যদি অনুকরণ করিতে যাই, তবে তাহা যে কুৎসিৎ হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ভাবের প্রবলতা ছিল না, অগত্যা তাঁহাদের হাতে বঙ্গভাষা অনুস্বর বিসর্গরহিত সংস্কৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

এক কথায়, একাকী রাজা রামমোহন রায়ই কুসংস্কার প্রভৃতিরূপ নানা হিংস্র জন্তুসঙ্কুল পুরাতন বঙ্গের দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নব্যবঙ্গের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নানাবিধ সংস্কারসমূহের উল্লেখ করিয়াছি—ইহাই দেখাইবার জন্য যে আমরা তাঁহার নিকট হইতে কত গুরুতর উপকার লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে অসম্মান করিলে বা ভুলিয়া গেলে আমরা কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহি। সেই মোহাচ্ছন্ন সময়ে, যে সময়ে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ইঙ্গিতমাত্রও করিলে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হইত, সেই সময়ে অসাধারণ ধৈর্য্যশীল, অসাধারণ বীর্য্যবান সেই মহাপুরুষ ব্যতীত আর কে এই কঠিন সংস্কার-সংগ্রামের মধ্যে অবতরণ করিতে সাহস করিত? এই মহাত্মার প্রতি যে এতদিন উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় নাই, তজ্জন্য আমাদিগের অনুতাপ করা কর্ত্তব্য।

ভারতবাসীদিগের নামে অনেকেই এই অপবাদ দিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ। প্রথিতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন "এটি যদি একটী খ্যাতিপন্ন ইংরাজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ

ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্যশূন্য রাজ্যো-ধিকের রাজস্বভাগ কত কর্ম্মচারিত্বপদের বেতনমুদ্রা, কত বাণিজ্যব্যবসায়ের লাভাংশ ও কত কত অন্যমত স্বাধীন বৃত্তির আয়টঙ্ক মুহূর্ত্তমাত্রে দানপুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশী-কৃত হইয়া কার্য্যসাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ যদি একটী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদলাভ প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত।” অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত কথাগুলি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়ো-জন, তাহা কে বলিবে? যখন একবার ভাবিয়া দেখি যে যাঁহার চেষ্টাতে নব্যবঙ্গের কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক নানাপ্রকার উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহিতেছি না, তখন কি আমাদের আপনাদের প্রতি ধিক্কার আইসে না? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা নাই বলিয়া যদি বা তাহা না করিতাম, তবু কিছু কথা ছিল। কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন ইহাকে কৃতঘ্নতা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি?

যে মহাত্মা পুরুষ আমাদিগের জন্য সকল বিষয়ের উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদেশের বন্ধু, সমুদয় ভারতবর্ষের বন্ধু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ আজ এই সভা আহূত হইয়াছে। এই সভা দ্বারা বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞ নাম কতক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে হয় নাই। সময়ে সময়ে তাঁহার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে রাখিবার

কল্পনা হয়। তাঁহার এরূপ প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা অবশ্য অকর্ত্তব্য হইতে পারে না—কিন্তু উহাই তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন তাঁহার জীবনচরিত; তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার গ্রন্থসকল। এই সকল পুস্তক তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচয়স্বরূপে প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। পিতার পরলোকগমনের পর যদি পুত্রেরা সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম না করে, তবে পুত্রদিগের পিতৃ-ভক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইল কোথায়?

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানেই প্রকাশ পাইয়াছে। রামমোহন রায় তাঁহার বিলাতগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার মহত্তম কীর্ত্তিস্তম্ভ ব্রাহ্মসমাজ (যাহা বর্ত্তমানে আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া খ্যাত) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। যদি তিনি কাহা হইতেও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত না হয়েন, তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবে না। রামমোহন রায় সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন যাহার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলেন; যাহার জন্য তিনি সমস্ত জীবন একই ভাবে পরিশ্রম করিলেন। সেই আদিসমাজের কথা আর তাঁহার কথা পৃথক থাকিতে পারে না। রামমোহন রায় ও আদিসমাজ, এই দুই কথা একসঙ্গে না বলিলে প্রত্যেকটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

এই আদিব্রাহ্মসমাজের অধিকারপত্রে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার ইচ্ছা লিখিত আছে। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই

একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত, সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে একতা স্থাপনের নিমিত্ত। তিনি ইহার অধিকারপত্রে লিখিয়া দিলেন যে, সমাজগৃহে এমন সকল বক্তৃতা সঙ্গীতাদি হইতে পারিবেক "as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe............and strengthening the bonds of union between men of all religious persuations and creeds." তাঁহার প্রদত্ত অধিকারপত্রের মধ্যে এই দুইটীই প্রধান বিষয়—এক, সেই নিখিলপাতা পরব্রহ্মের উপাসনা; দ্বিতীয় সর্ব্বজনীন একতাস্থাপন। কি এক প্রগাঢ় উদারতা! এইরূপ বিশ্বজনীন উদারতাকে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতের মধ্যে ইহাই প্রথম।

মহাপুরুষেরা কেবল উপর উপর দেখিয়া চলেন না; তাঁহারা সকল বিষয়েরই মূলে যাইতে ইচ্ছা করেন। রামমোহন রায়ও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে কোন উন্নতিই চিরস্থায়ী হইবে না। তিনি বিজ্ঞানেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তথাপি কোন বৈজ্ঞানিক সভা স্থাপন না করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্যই সভা স্থাপন করিলেন।

ইতিহাসেও এই গুরুতর সত্য সমর্থিত হইতে দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে ফ্রান্সের বিষয় দেখা যাউক। ফ্রান্সে যখন ফরাসি-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তখন ফরাসি জাতি ধর্ম্মেরও বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ফরাসি জাতি যদি ধর্ম্মকে সহায় করিয়া রাজাদিগের অত্যাচার নিবারণ

করিতে যত্নবান হইত, তবে কখনই ফরাসিবিপ্লবে যেরূপ নরশোণিতের স্রোত চলিয়াছিল, সেরূপ হইত না। বর্ত্তমান কালে ফ্রান্সে সভ্যতার খরস্রোত চলিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু গত লোকসংখ্যাগণনাতে দেখা গিয়াছে যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ লোক কমিয়া গিয়াছে—ইংলণ্ডে সেই দশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ফ্রান্সে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইতেছে। ফ্রান্সে এই প্রকার অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হওয়া কি কিছু আশ্চর্য্য? যে দেশের, শুনিতে পাই, মিউনিসিপাল আইনের মধ্যে এইরূপ একটী ধারা সন্নিবিষ্ট আছে যে, যে সকল পুস্তকে ঈশ্বরের কোন প্রকার উল্লেখ থাকিবে,সেই সকল পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? সে দেশ যতই কেন বাহ্য শোভাসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হউক না, তাহার অধোগতি সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকিতে পারি।

আমাদের এই ভারতবর্ষেও এই সত্যের পরিপোষক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এখানেও অনেকবার অধর্ম্ম ও দুর্নীতির বিষময় পঙ্কিল ভাবসমূহ ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুরাতন ভারতবর্ষকে অধর্ম্ম হইতে অনেকবার উদ্ধার করিয়াছেন। ভারতের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তি কোন বিশেষ কুসংস্কারকে উন্মূলিত করিতে না গিয়া একেবারে কুসংস্কারের মূল উৎপত্তিস্থান অধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া

গিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রকৃত ধর্ম্মভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যখন উপধর্ম্ম ও তাহার নিত্য সহচর নানা কুসংস্কার সমুদয় ভারতবর্ষকে একবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির স্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিলেন; পশ্চিমাঞ্চলে নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেই "অলখনিরঞ্জনের" নাম কীর্ত্তন করিয়া মৃতপ্রায় শরীরে চেতনা আনয়ন করিলেন; দাক্ষিণাত্যে তুকারাম গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উজ্জ্বল আলোক আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সকল মঙ্গলের যিনি কারণ তাঁহার পথের পথিক হইলেই সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে।

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিয়া প্রয়োজন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রহ্মজ্ঞানের আদি আবাস-ভূমি এই ভারতভূমিকে উপধর্ম্ম আর একবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। উপধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বেষবিদ্বেষ দলাদলি প্রভৃতি নানা দুর্নীতি সমস্ত দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছিল। নাগা সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদিগের সংগ্রাম, শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, এ সকল এত জানা কথা যে তাহাদের বিস্তারিত উল্লেখ না করিলেও চলে। পবিত্র ভারতভূমি হইতে দুর্দ্দশার কারণ এই সকল ভয়াবহ দুর্নীতি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন;—আর্য্যাবর্ত্তে রাজা রামমোহন রায় এবং দাক্ষিণাত্যে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী। তাঁহারা ও বিশেষত রামমোহন রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার

না হইলে কেবল বঙ্গদেশে নহে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমুদয় জগতে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই তাঁহারা সমুদয় উন্নতির মূল কারণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার এক স্থায়ী উপায় করিয়া দিলেন এবং ভারতের মধ্যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মোপাসনার সাধারণ স্থান এই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইতেই রামমোহন রায়ের প্রথম ইচ্ছা দেখা যাইতেছে যে আমরা সকলে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সকলের সম্ভজনীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করি। কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছা যে বিশেষ সফল হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। ইহাই যদি না হইল, তবে তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদিগকে লোকভয় জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। রামমোহন রায়কেও ইহার জন্ম বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার নির্ভরের ভাব দেখিলে দুর্ব্বল প্রাণও সবল হইয়া উঠে। তিনি বলিয়াছেন—"At any rate, whatever men may say I cannot be deprived ot this consolation, my motives are acceptable to that Great Being who beholds in secret and compensates openly." তাঁহার সঙ্গীতেও আছে "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়, যাঁহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।" এইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ হইলে,তবে তাঁহার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সর্ব্বজনীন একতা। এই বিষয় চিন্তা করিলেই তো অবসন্ন হইয়া পড়ি, হতাশ হইয়া যাই। আমাদিগের দুর্ভাগ্যের কথা কি আর বলিব? কোথায় রাজা রামমোহন রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিলেন, পৃথিবীতে একতার বীজ রোপণ করিলেন, আর কোথায় এই ভারতবাসীদের মধ্যে, বিশেষত বঙ্গবাসীদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ বর্দ্ধিত হইতেই দেখিতেছি! অথচ এই বিবাদবিসম্বাদের প্রকৃত কারণ কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। এদেশে যাঁহারা প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিমা পূজাদি করেন, তাঁহারা প্রতিমাপূজাদিকেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া দাঁড় করাইতে চাহেন এবং অনেক সময়ে ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্যে গালি দিয়া, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপর বিদ্রূপ করিয়া মনে করেন যে প্রতিমাপূজা রক্ষা করিবার এক সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত হইল। যুক্তি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে গালাগালির উপর কোন ধর্ম্মভিত্তি গ্রথিত হইতে পারে না, আমার বিশ্বাস যে তাঁহারা তাহা বেশ জানেন, কিন্তু প্রতিমাপূজা উঠিয়া গেলে স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িবে বলিয়া সম্ভবত তাঁহাদের অনেকে তাহা সমর্থন করিয়া থাকেন। আমি কোন গণ্যমান্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই ভয়ের কথা বলিতে শুনিয়াছি এবং শুনিয়া বিস্মিত হই নাই—উদরান্নের কষ্ট নিতান্ত অসহ্য এবং উদরান্নের সংস্থান-চেষ্টা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

আমরা কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য হই, যখন দেখি যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই ঘোরতর বিবাদবিসম্বাদ। এই বিষয়ের পর্য্যালোচনায় হয়তো অনেকে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু রাম-

মোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সভা হইবে সেই সভাতে, যতদিন ব্রাহ্মসমাজে এই বিরোধের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই বিষয়ের উল্লেখ না করা অকর্ত্তব্য। রামমোহন রায় বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া সমস্ত জগতকে ভ্রাতৃভাবে অহ্বান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর আমরা আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব লইয়া আপনাদেরই মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়া আছি। তিনি "বিগত বিবাদং" পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া জীবনের একটী মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, একতাশৃঙ্খলের দ্রঢ়ীকরণ, আর আমরা মূলমন্ত্র করিয়াছি তাহা ভগ্ন করা। আমি এই সকল শ্রুতি-কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, কারণ আমার হৃদগত ইচ্ছা যে আমাদের এই বিবাদ মিটিয়া যাউক।

এই বিবাদের মূল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। আমি জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিব, তুমি তাহা করিবে না; কিন্তু তাহা লইয়া পরস্পারের মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন কি? আমি কতকগুলি জাতীয় সংস্কার আচার প্রভৃতি রক্ষা করিলেই যে অব্রাহ্ম হইব, সেইগুলি ত্যাগ করিলেই যে মুক্তিলাভ করিব, এরূপ কোন কথাই নাই। বরঞ্চ আমার বোধ হয় যে সেই সকল বিশুদ্ধ সংস্কার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়াতে সহজেই হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করে এবং অনেক সময়েই ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমরা ইহা বলিতে পারি যে আদিব্রাহ্মসমাজ জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধ আসিবার কোন কথাই আসিতে পারে না। রামমোহন

রায়ও জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে কি তাঁহার সহিত আমাদের বিরোধ করিতে হইবে? তবে কি তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা করিতে যাইব না? এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের অতি অল্পই সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য এক; তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা আর। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সমান থাকিবেক, কিন্তু তাহা প্রচার করিতে হইবে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া, দেশকালপাত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবলমাত্র জ্ঞানের কথা; কিন্তু তাহাও বুদ্ধিমান ছাত্রের নিকট একপ্রকারে বুঝাইতে হয়, অল্পবুদ্ধি ছাত্রের নিকট আর এক প্রকারে বুঝাইতে হয়। কিন্তু পারমার্থিক সত্য ধারণ করা কেবলমাত্র জ্ঞানের কার্য্য নহে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়েরও কার্য্য; এইজন্য হৃদয়ে গুরুতর আঘাত না লাগে, এরূপ ভাবে যতদূর সম্ভব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমরা ঋষিদিগের সঞ্চিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগের জীবনে পরিণত করিতে যাইতেছি বলিয়া আমাদের জাতীয়ভাব ত্যাগ করা কি নিতান্তই আবশ্যক? কখনই নহে।

রামমোহন রায় প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট তাঁহাদিগের আপনাপন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতির জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। এমন কি, তিনি একস্থানে বলিয়াও গিয়া-

ছেন যে "শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়।" তিনি আর একস্থানে বেদান্তসূত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; "বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ....তবে ......বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন।" 'জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার' এই মূলমন্ত্র তাঁহার জীবনে কেমন সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তিনি উপবীত আমরণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাঁহার গলে উপবীত দেখা গিয়াছিল এবং তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পরে খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান অনুসারে যেন তাঁহার সমাধি দেওয়া না হয়। কিন্তু আবার এদিকে যখন বর্ত্তমান লেখকের পূজ্যপাদ পিতামহ তাঁহার পিতার হইয়া রামমোহন রায়কে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় সে নিমন্ত্রণ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তখনকার কালের দুর্গোৎসবের কুৎসিত অকুৎসিত নানা প্রকার বৃথা আমোদের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া এবং ব্রহ্মপ্রীতিতেই আপনার সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়া সেই তিব্বত-পরিব্রাজক রামমোহন রায় নিজের উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"রামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি সমাজকে

বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এসকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। ট্রষ্টডীড পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব এবং ঐরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি হইতে পারে কি না, ইহাই বিবেচনার বিষয়।

"কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী করিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না। সত্যমাত্রই অসাম্প্রদায়িক ও উদার। সত্য ভারতবর্ষীয় কি ইউরোপীয়, হিন্দু কি যাবনিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে, তোমারও নহে। উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সত্যকে কার্য্যে পরিণত করা ও সত্য-প্রচার সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতি স্বীয় স্বীয় জাতীয় ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন, এবং কোন সম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয়ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস একথার যাথার্থ্যপক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে।...

"তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দু প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টডীড পত্রের কোন্

কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।" * রামমোহন রায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক জাতীয়তা রক্ষিত হওয়াতে তাঁহাদিগের উভয়েরই দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে।

কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করাইবার সূত্রেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু সেই কেশবচন্দ্র সেনই বলেন যে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম। † তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দেশীয় ভাবের দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে কোন মতেই বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করানো কর্ত্তব্য নহে। ‡ আদিসমাজের মত অতি স্পষ্ট-রূপে তাঁহার দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে, যখন তিনি বলেন যে আমা-

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন চরিত।

† Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas. (Lahore Lecture)

‡ It is extremely desirable to have a national church based upon the religious tastes, the religious instincts, and if possible, the religious traditions of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accesible to all,and adds to it the many-sidedness of human nature. Religion is either adulterated by foreign elements or dissipated and wasted out in abstraction if it is not dammed up by the peculiar boundaries of national thought and predilection. (quoted by Babu Rajnarain Bose in his হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা from the Indian Mirror.)

দিগকে অন্ত দেশের নিকটে অন্ত যে কোন বিষয়ের জন্যই যাইতে হউক কিন্তু (পারমার্থিক) সত্যের জন্ত আর বিদেশে যাইতে হইবে না—হিন্দুশাস্ত্র হইতেই সত্য বাছিয়া লইতে হইবে।*

স্বর্গীয় কেশব বাবুর এই সকল কথা ব্রাহ্মসাধারণকে মনে রাখিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে রামমোহন রায় যে ভাবে আদিসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যে ভাবে আদিসমাজ এখনও চলিতেছে, কেশব বাবু তদতিরিক্ত কি বলিলেন। তিনি যদি ইহা একটু আগে বুঝিতেন এবং এই মতানুসারে সমাজকে পরিচালিত করিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুরবস্থা হইত? ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু (বর্ত্তমানে পরলোকগত) তাঁহার কোন পুস্তকে আদিসমাজের প্রকৃত মত ব্যক্ত করিয়া তাহা ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত চার্ল্স বয়সী সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বয়সী বলিতেছেন যে, এই মত অতীব সত্য ও বিজ্ঞোচিত। এই মতের জন্ত গ্রন্থকারের সহিত কেশব বাবুর কোন মতভেদ থাকা উচিত নাহ। বয়সী নিজেও এই ভাবেই

---

* "We need go to other countries for dress, for civilization, but we need not necessarily do so for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindoo Shastra, then not only we ourselves will drink that nectar but bless our own sons and grandsons as well as all other families in the country with draughts of the same." (Lecture on Bhakti delivered at Santipore).

ইংলণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।* বিখ্যাত অধ্যাপক নিউম্যান সাহেবেরও এই মত।

এখন এই সকল দেখিয়াও যদি আমরা মিলনের দিকে অগ্রসর না হই, তবে আমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায় রহিল? প্রকৃতই যদি আমাদের মিলিত হইবার ইচ্ছা না থাকে, তবে রামমোহন রায়ের নামে সভাই বা করা কেন, আর সেই সভায় কতকগুলি বক্তৃতা করিবারই বা ফল কি, তাহা তো বুঝিতে পারি না।

হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ, যদি আমাদের হৃদয়ে হিন্দুদিগের চিরপ্রসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে আজ একবার আইস, সকলে একত্র মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি, যিনি বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদিগের নিকটে এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ব্রহ্মের জন্য, সর্ব্বস্ব, সকল প্রকারের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারা যায় এবং প্রয়োজন হইলে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক ভারতবাসী যখন মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া শত সহস্র বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও নির্ভীকভাবে

* "It is magnificently true and wise. I cannot bear to think of there being any rivalry or difference between the author and Chunder Sen. What he says at the end about the mode of presenting Brahmoism seems as if written for me. It is one long justification of my own course and of my most recent efforts to gather in the people who have belonged to my old church."

আপনার জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে ব্রহ্মের সম্মুখে সম্পন্ন করিবেন, তখনই জানিব যে রামমোহন রায়ের জয়। রামমোহন রায়কে যদি আমাদের রামমোহন রায় বলিয়া পরিচয় দিতে যথার্থই ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে আমরা যদি যথার্থই গৌরব অনুভব করি, তাহা হইলে আমাদের নিতান্তই কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অনুষ্ঠানই ব্রহ্মকে আহ্বান করিয়া সম্পন্ন করি। আজ একবার আইস, আমরা সকলে একপ্রাণ হইয়া সেই ভক্তবৎসল, পুরাতন ভারতের চিরন্তন দেবতা পরমেশ্বরের নিকট প্রাণ খুলিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিয়া হৃদয়কে শীতল করি—বিবাদ কলহ আর সহ্য হয় না। তাঁহার প্রসাদে আমরা মিলিত হইয়া তাঁহারই প্রিয় কার্য্য বলিয়া শুভকার্য্য সকল সম্পাদন করিতে থাকিলে আমাদের প্রতিজনের মঙ্গল হইবে, আমাদের জাতীয় মঙ্গল হইবে, আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে।

"পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণস্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা

রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারত-ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে, ঋষিদের জয়ে, সত্যের জয়ে, ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়"।*

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
রাজারামমোহন রায় বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

* রামমোহন রায়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সফলকাম।*

শোন সবে শোন যে আছ জগতে
চলেছে আমার গান।
কারো অশ্রু এতেযদি মুছে যায়।
পাপতাপ কারো যদি ধুয়ে যায়॥
সংসারের পারে যদি যায় নিয়ে।
মরমে আনন্দযদি যায় দিয়ে॥
তখনি বুঝিব ধরণীতে আমি
হয়েছি সফল কাম॥
আকুল পরাণ সঁপেছি তাঁহারে
লভেছি অমৃতধাম॥
হৃদয়ের ব্যথা যাবে দূর হয়ে
অনন্ত প্রেমের সুরে।
সে বাঁশীর ডাকে বিশ্ব এক হবে
বিরহ রহিবে দূরে॥

—ঃওঁঃ—

---

* ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত।

সপ্তত্রিংশ আলাপ—শ্মশান। *

উঃ এই শ্মশানপুরী কি ঘোর নিস্তব্ধ! এই পবিত্র প্রাতঃকালের পবিত্র সমীরণ হেথায় পদক্ষেপ করিবামাত্র কে জানে কেমন এক বিষাদের গান গাহিয়া যায়। হৃদয়ের লুকানো প্রদেশে ইহার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। এই প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে হৃদয়ে কত আশা কত নৈরাশ্যের তরঙ্গ বহিয়া যায়। সম্মুখে এই যে নরকপাল পতিত হইয়া আছে, ইহা হয়ত সচেতন অবস্থায় এক ইঙ্গিতে জগতের ঘটনাচক্র নিয়মিত করিত; কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কোন্ মানবসন্তান না দুই ফোঁটা অশ্রুজল বর্ষণ করিবে? এই মস্তক হয়ত আজই নিশীথকালে শৃগালের মুখে পতিত হইবে। আশ্চর্য্য! শ্মশানে জগতের সমস্ত প্রাণীই একই দশা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহা জানিয়াও আমরা আত্মাভিমান লইয়াই ব্যস্ত আছি। আমাদের ন্যায় মূর্খ আর কে থাকিতে পারে? ইচ্ছাপূর্ব্বক মূর্খতাকে আহ্বান করিতেছি।

এই মূর্খতার ঔষধ কেবলমাত্র আমাদের পিতা—সেই পরমপুরুষ, তিনিই এ রোগের মহৌষধ। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে শ্মশানের ন্যায় কোন ঘোর নীরব স্থানে—যেথায় ঈশ্বরের কার্য্যের অনন্ত মহিমা আলোচনা করিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাই—এইরূপ কোন স্থানে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া একবার সেই পবিত্রস্বরূপের "প্রথম নাম ওঁকার" গ্রহণ করিয়া পবিত্র হই। সেই স্থানে যাইয়া আমরা যেন বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া হৃদয়ের দ্বার একে-

* ১৭ বৎসরের রচনা।

বারে খুলিয়া দিই এবং পরম কারুণিক জগদীশ্বর ক্ষতস্থানগুলি দেখিয়া তাহাতে অমৃতবর্ষণ করুন; হৃদয় তাহাতে চিরকালের তরে শান্তি লাভ করুক। দয়াময় অমৃতময় সেই "মহান্ বৈ পুরুষঃ"—তাঁকে ভুলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র রুদ্ধগৃহের ধূলিরাশিকে আপনার বলিয়া মহা আনন্দিত হইতেছি! ভাবিয়া দেখ যে আমরা এই অনন্ত চরাচরের সহিত তুলনায় কি ক্ষুদ্র কীট! কত শত সূর্য্য অপেক্ষা মহান্ মহান্ গ্রহনক্ষত্র আমাদের অগোচরে অনন্তদূরে রহিয়াছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় ৩৯০,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; এই সূর্য্য হইতে আলোক আমাদের এখানে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডে আইসে। আচ্ছা এখন একটী-বার ভাবিয়া দেখ যে, যে গ্রহের অথবা নক্ষত্রের আলোক এখনো আসিতে দুই তিন বৎসর বাকী, তাহার দূরত্বের কূল কোথায়? এই সমুদয় ভাবিতে গেলে আমাদেব কি অভিমান থাকিতে পারে? তখন কি আর নিজেকে বড় বলিয়া মনে হইতে পারে?

যদিও আমরা পরিমাণে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, তথাপি আমাদের এরূপ একটী অমূল্য রত্ন আছে যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়েও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং তাহার গুরুত্ব এত অধিক যে সমুদয় জগৎ তাহার ভারে কম্পমান হইয়া যায়। এই রত্ন আত্মা। সময়ে ইহার গুরুত্ব কমিয়া যায় এবং সময়ে বর্দ্ধিত হয়। যখন পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ হয়, তখনই গুরুত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং যখন পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া আত্মা ধূলিখেলা করিতে থাকে, তখনই অজ্ঞাতসারে তাহার বল কমিয়া যায়। যে আত্মা প্রেমস্বরূপের প্রেমমধু পান করিয়া অনন্ত

বলশালী হইতে পারে, তাহাকে ধূলিপঙ্কে নিমগ্ন রাখা কি মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? অতএব আইস এই শ্মশানস্থানে সকলে মিলিয়া একবার বিষয়চিন্তা—বিষয়ের অবিরাম কোলাহল আত্মা হইতে দূর করিয়া দিই এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন দ্বারা হৃদয়ে অপূর্ব্ব বল ধারণ করিয়া পাপের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হই। হে পরমাত্মন! তোমারি স্নেহে, তোমারি করুণায় আত্মা প্রতিপালিত হইয়া পাপের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে। তোমার এই করুণা চিরকাল আমার উপরে বর্ষণ করিয়া তাপিত আত্মা শীতল কর।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
শ্মশান বিষয়ক সপ্তত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

অষ্টাত্রিংশ আলাপ—সন্ধ্যা।*

গাও, গাও সন্ধ্যা, তুমি বিদায়ের গান গাও। গাও, তুমি হৃদয় খুলিয়া বিরহের গান গাও। এ গান আমার বড়ই মধুর লাগে। কেন?—এই বিরহে মিলনের আভাস পাই। জানি যে তুমি যাইতেছ পুনরায় আসিবার জন্য। যদি বুঝিতাম যে তুমি আজ চলিয়া গেলে, আর ফিরিয়া আসিবে না; আজ যে গান গাহিলে, সে গান আর শুনিতে পাইব না; যদি বুঝিতাম যে আজ তুমি যে অশ্রুছলছলমুখে বিদায় গ্রহণ করিলে, আজ যে মৃদুমন্দ বাতাসে হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে, সে অশ্রুমুখ আর দেখিতে পাইব না, সে দীর্ঘশ্বাস আর শুনিতে পাইব না; ইহা যদি বুঝিতাম, তবে অন্তরে বিষাদের কি ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিত, হৃদয় কি বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইত! তাই বলি, তুমি বিরহের গান গাও; জানি যে তোমাকে কাল আবার প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে পাইব, তোমার অশ্রুমুখে চুম্বন করিতে পাইব, তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রেমের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পাইব। তাই বলি, তুমি বিদায়ের গান গাও; তোমার বিদায়কালীন বিলাপগীত আমার বড়ই মিষ্ট লাগে।

সন্ধ্যে—

আজ তুমি যে গান গাহিলে, প্রকৃতির হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহা গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। ফুলেদের কাছে কাণ পাতিয়া

---

* ১৭ বৎসর বয়সে লিখিত।

শুনিতে পাই যে তাহারা অতি মৃদুস্বরে সুকোমল কণ্ঠে অবিরাম সেই গান গাহিতেছে; গ্রহনক্ষত্রদিগের পানে চাহিয়া দেখি যে তাহারাও সেই গান গাহিতেছে। আবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে সেখানেও একটী গান অনুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে গান—সন্ধ্যার গান, বিরহের গান—মিলনের প্রথম গান।

তবে সত্য সত্যই কি তুমি বিদায় গ্রহণ করিতেছ? এই অবসরে একটীবার এস—আমার বুকের 'পরে তোমার সুকোমল কপোল রাখিয়া কাঁদিয়া যাও, আর আমিও তোমার সহিত কাঁদিতে থাকি। তুমি যে অশ্রুজল ফেলিবে, তাহা প্রেমের বলে দৃঢ়তর বন্ধন হইয়া আমাদের উভয়ের হৃদয় একসূত্রে বাঁধিয়া দিবে এবং অবশেষে উভয়ের হৃদয় এক হৃদয়ে পরিণত করিবে। সে দিন কবে আসিবে? সন্ধ্যে—সে আশা করিতে সাহস হয় না। প্রেমের পথ অতি দুর্গম পথ; সে পথ হইতে কখন্ যে চরণ স্খলিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
সন্ধ্যা বিষয়ক অষ্টাত্রিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

ঊনচত্বারিংশ আলাপ—"সাধনা" পত্তন।

আমাদের বাল্যকালে যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে এক আশ্চর্য্য :ন্দধারা প্রবাহিত ছিল। বাটীতে সহোদর, জাঠতুত, তুত প্রভৃতি সমবয়স্ক ভাইবোন আমরা প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন লকবালিকা ছিলাম। সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে লাধূলায় গুরুজনদিগের নিকটে রীতিমত উৎসাহ পাইতাম। ধ্যে মধ্যে বিদ্বজ্জনসমাগম প্রভৃতি উপলক্ষে অভিনয়াদি হইত, াহাতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই যথেষ্ট হইত, বাহির হইতে ছেলে-য়ে আনিবার প্রয়োজন হইত না। গুরুজনদিগের ন্যায় মরাও ১২ই মাঘ, সভাসমিতি প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদের নুষ্ঠান করিতাম।

মধ্যে এক সময়ে বাড়ীর ছেলেরা একটী সুহৃৎসমিতি স্থাপন রেন। এই সমিতির অধিবেশন দিনে কিঞ্চিৎ জলযোগের গোছ ভোজন হইত এবং তৎসঙ্গে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি ত। সমিতি হইতে একটী মাসিক পত্র বাহির করা স্থির য়। এতৎসম্বন্ধীয় যে নিয়মাবলী তৎকালে লিখিত হইয়াছিল, জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে এবং অন্য কোন পরিবারের বালকদিগের অভিলষিত কোন শুভ কর্ম্মের ন কিভাবে হাতে ধরা যাইতে পারে, তাহার অন্তত স পাওয়া যাইবে, এই আশায় সেই নিয়মাবলী নিম্নে অবি-প্রকাশ করিলাম।

"সাধনা"—নিয়মাবলী।

১। এই পত্রিকার নাম স্থির হইল "সাধনা।" ইহার নান্দীবচন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পত্রিকা অগ্রহায়ণ মাস হইতে বাহির করিবেন—

(১) শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৩) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৪) শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৫) শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৬) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। পূর্ব্বোক্ত ছয়জনের মধ্যে এক এক পরিবারের লোক-দিগকে এক এক ঘর বলিয়া ধরা হইবে।

[টীকা। পূর্ব্বোক্ত ছয় জনের নাম বয়সের অনুক্রমে দেওয়া হইয়াছিল। (১), (৩) ও (৫) স্থানীয় ব্যক্তিত্রয় দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র; (২) স্থানীয় ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র; (৪) স্থানীয় ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র এবং (৬) স্থানীয় ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র।]

৪। পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে প্রতি ঘরকে অনধিক ২০০৲ দুইশত টাকা অর্পণ করিতে হইবে।

৫। পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত ১২টী করিয়া লেখা দিতে হইবে।

৬। এই পত্রিকা পরিচালন জন্য উক্ত ছয় জনকে লইয়া অন্তত মাসিক একটী সভা হইবে।

(ক) সময়—প্রতি মাসের প্রথম রবিবার সকালে।

(খ) স্থান—যোড়াসাঁকো।

৭। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যেক সভ্যকে এই সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৮। উক্ত ছয় জনের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া অনুমতি (vote) আছে।

(ক) অংশ অনুসারে অনুমতি নহে।

৯। পত্রিকার বৈষয়িক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সভা কর্ত্তৃক এক কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবে।

১০। এই কার্য্যাধ্যক্ষকে ছয় মাস অন্তর পরিবর্ত্তন করিলে উত্তম।

১১। পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অন্যতর এক কার্য্যাধ্যক্ষ আবশ্যক।

১২। প্রতি সভ্যের দুই মাস করিয়া সম্পাদকীয় কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার অধিকার রহিল।

১৩। সভার পূর্ব্বোক্ত ছয় জন সভ্য ব্যতীত অপরাপর হিতৈষী ব্যক্তির মতামত শোনা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুমতি (vote) নাই।

১৪। পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও আরও কতিপয় প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইবে, তাহা উক্ত ছয়জনের মধ্যে অধিকাংশের মতের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।"

এইভাবে "সাধনা" পরিচালিত হইলে তাহা কিরূপ দাঁড়াইত, দেখিবার বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, এই নিয়মানুসারে "সাধনা" পরিচালিত হয় নাই।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
সাধনাপত্তন বিষয়ক উনচত্বারিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

কাঠুরিয়া।

হোথায় দাঁড়ায়ে দুটী নারিকেল গাছ—
কাঠুরিয়া তুমি ছুঁয়োনা তাদের।
তাদের অঙ্গের পরে কোরোনা আঘাত
সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর তব কুঠারের॥
শৈশবে তাদের তলে করেছিনু কত
ছুটাছুটী খেলা বাগান রচিয়ে।
দীর্ঘ কত বর্ষ গেল— আজি কিনা বল
কাঠুরিয়া-হাতে দিবারে সঁপিয়ে॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজে গাছেদের মাঝে
সারা ভারতের হিন্দুজাতি যাহে।
আজি তুমি কাঠুরিয়া কোন্ প্রাণ ধরে
দিবে গো আঘাত কুঠারের তাহে॥
দাঁড়াও, কেটো না তুমি— করি হে মিনতি-
ধরায় গভীর প্রেমের বাঁধন।
রাখগো পুরাণো গাছে— পাতা গুলি দেখ
উন্মুক্ত গগনে খেলিছে কেমন॥
কাতর আমায় দেখে হাস, ক্ষতি নাই
রাখিলে তাদের দয়া করে তুমি।
পিতৃপুরুষ-রোপিত বৃদ্ধ বন্ধু তারা—
বাঁধা রব ঋণে চিরকাল আমি॥

জড়িত বাল্যের স্মৃতি মর্ম্মগ্রন্থি সম
তাদের দেহের প্রতি স্তরে স্তরে।
তাই আজো প্রাণ চাহে শিয়রে তাদের
পাখীরা বসিবে বিশ্রামের তরে॥
আজো আশা পাখী যত তাদেরি আশ্রয়ে
কুলায় রচিবে লতাপাতা দিয়া।
দয়েল গাহিবে শিরে প্রভাত আলোকে।—

* * * *

হেথা হতে যাও তুমি— যাও কাঠুরিয়া॥

—:ওঁ:—

একচত্বারিংশ আলাপ—সুইজার্লণ্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। *

পৃথিবীতে স্বাধীনতার চিরসংগ্রাম চলিতেছে। চেতন প্রাণী মাত্রেই যেন স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত। মনুষ্য স্বাধীনতা হারাইয়া নীরব থাকিতে পারে না। মনুষ্যকে পরাধীনতার কঠোর নিগড়ে বদ্ধ করিলে হয় সে বিনষ্ট হইবে, নয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া পুনরায় নবজীবন লাভ করিবে।

এই স্বাধীনতা লইয়াই প্রাচীন আর্য্যদিগের সহিত ভারতীয় অসভ্যদিগের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; এই স্বাধীনতা লইয়াই আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশের সহিত আমেরিকার আদিম নিবাসী অসভ্য বর্ব্বরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই যুদ্ধে পরাজিত দল দুর্ব্বল ছিল, তাই তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিয়া পরাধীনতার লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে। কিন্তু স্বাধীনতার আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়া যে নবজীবন লাভ করা যাইতে পারে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যই তাহার নিদর্শন। যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার উপনিবেশসমূহকে পরাধীনতার লৌহনিগড়ে বদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন সমুদয় উপনিবেশগুলি একপ্রাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহারা সেই চেষ্টায় সফলকাম হইয়া আজকাল উন্নতির পথে কত-না অগ্রসর হইয়াছে। আর একটী নবজীবন লাভের নিদ-

* ১২৯৮ শ্রাবণ মাসে লিখিত।

র্ম্মন ইউরোপের অন্তঃপাতী সুইজার্লণ্ড প্রদেশ। অনেকদিন অবধি সুইজার্লণ্ড জর্ম্মনির অধীন ছিল; কিন্তু পরিশেষে পরাধীনতার অতিমাত্র অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিল। এই সুইজার্লণ্ড প্রথম যখন স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য উত্থান করিয়াছিল, সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের উত্তরভাগে যেরূপ নগাধিরাজ হিমালয় স্বীয় জটাজূট বিস্তার করিয়া তিব্বত প্রদেশ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, ইউরোপের মধ্যে ইতালীর উত্তরে আল্পস পর্ব্বতও সেইরূপ আপনার শাখাপ্রশাখার দ্বারা সুইজার্লণ্ড প্রদেশ গঠিত করিয়াছে। কিন্তু সুইজার্লণ্ড তিব্বতের ন্যায় অধিত্যকা নহে, উপত্যকা। বোধ হয় এই জন্য সুইজার্লণ্ডে অনেক সুন্দর হ্রদ আছে, অথবা হ্রদ আছে বলিয়াই ইহা উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। যাহা হৌক এই উপত্যকাকে আল্পস পর্ব্বতের শাখাপ্রশাখা এমন ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে যে সুইজার্লণ্ডকে একপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুইজার্লণ্ডের অধিবাসীগণ অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় নানাপ্রকার নৈসর্গিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। সুইসগণ দৃঢ়, সুস্থকায়, সুশ্রী ও সত্যবাদী। ইহারা অধিকাংশই কৃষক বটে, কিন্তু কেহই স্বাধীনতা হারাইতে শিক্ষা করে নাই। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহারা সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের একটী দোষ আছে—ইহারা অপর জাতির স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করে না। পূর্ব্বে প্রায় সকল রাজাই কতকগুলি সুইস সৈন্য আপনাদিগের শরীররক্ষক রূপে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহাদের স্থির

বিশ্বাস ছিল যে রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ যদি কখনও বিদ্রোহী হয়, তথাপি সুইস শরীররক্ষীগণ কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রজাদের পক্ষ গ্রহণ করিবে না। যাহারা এত স্বাধীনতাপ্রিয় তাহাদের পক্ষে অন্যজাতির স্বাধীনতা লাভের বিরোধী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সুইসগণ অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ ইহারা অতি দরিদ্র এবং তাই এরূপ লোভপরবশ।

সুইজার্লণ্ড কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত—এক একটী বিভাগকে এক একটী 'ক্যাণ্টন' বলে। পূর্ব্বে এক একটী পরিবার লইয়াই এক একটী ক্যাণ্টন গঠিত হইত; কিন্তু ক্রমে এক একটী ক্যাণ্টন অনেক পরিবার হইয়া পড়িল। সার্লেমানের রাজত্ব কালে সুইজার্লণ্ড জর্ম্মনির শাসনভুক্ত হয়। ইহার শাসনের জন্য এই জর্ম্মানি হইতে দুই তিন জন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইত। এই শাসকসম্প্রদায় সম্রাটের নামে সমস্ত দেশটাকে অত্যাচারে বিধ্বস্ত করিতেছিল। ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে সুইজ-প্রমুখ তিনটী ক্যাণ্টন একত্র মিলিত হইয়া কতক পরিমাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহারা নামেমাত্র জর্ম্মন সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেও প্রতিনিধি শাসকদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিত না। এই তিনটী ক্যাণ্টন প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে শাসক সম্প্রদায়ও ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শাসন করিতে পারিত না।

অবশেষে যখন ডিউক অফ্ অষ্ট্রিয়া এলবার্ট স্বীয় পিতা ও জর্ম্মানির সম্রাট কাউণ্ট রডল্ফের হস্ত হইতে সুইজার্লণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শিত হইয়াছিল। এলবার্ট কঠোর জবরদস্তির আদেশ দিয়া সমস্ত সুইজার্লণ্ডকে, বিশেষত পূর্ব্বোক্ত তিনটী ক্যাণ্টনকে শাসন করিবার জন্য জেসলার ও বেরিঞ্জার নামক দুইজন নিতান্ত নিষ্ঠুর প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেক। ইহাদের অত্যাচারে প্রজাদিগের ধনসম্পত্তি মানমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুরই সম্মান রক্ষিত হইত না। যদি কাহারও গৃহের একটুখানি শ্রী ফিরিত, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। যতদিন সেই শ্রীর চিহ্নমাত্র থাকিত ততদিন তাহার প্রতি পীড়নের বিরাম হইত না।

একবার জেসলার সুইজ ক্যাণ্টনে বেড়াইতে গিয়া ষ্টফেকার নামক তথাকার এক বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তির গৃহ পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীদিগের গৃহ অপেক্ষা রম্যতররূপে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সহচরদিগকে বলিল "এই সকল ক্রীতদাসদিগকে কি এরূপ সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া উচিত? উহাদিগের পক্ষে যৎসামান্য কুটীরই যথেষ্ট।" উপযুক্ত সহচরেরা পরামর্শ দিল যে "অগ্রে গৃহ সম্পন্ন হউক, তাহার পরে সম্রাটের নামে উহা অধিকার করা যাইবে।" স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জেসলার সে প্রস্তাব কিরূপ আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপ অত্যাচারের এই ফল হইল যে সুইজার্লণ্ড পূর্ব্বে জর্ম্মন সম্রাটের যে নামেমাত্র অধীনতা স্বীকার করিত, এবারে তাহাও আর রহিল না; শীঘ্রই সুইস জাতি স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জর্ম্মনির সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

জেসলার যখন তাহার সঙ্গীদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল সেই সময়ে ষ্টফেকারের স্ত্রী নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া

আসিয়াই গৃহনির্ম্মাণে নিযুক্ত লোকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। ষ্টফেকার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই লোকদিগকে দেখিতে না পাইয়া স্ত্রীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে স্ত্রী জেসলারের ভাষায় উত্তর দিয়া কহিলেন "আমাদিগের ন্যায় ক্রীতদাসদিগের পক্ষে কুটীরই যথেষ্ট।" ষ্টফেকার আহার চাহিলে তাঁহার স্ত্রী অন্য দিবসের ন্যায় মদ্যমাংস প্রভৃতি না দিয়া কেবলমাত্র রুটী ও জল দিয়া বলিলেন "আমাদিগের পক্ষে এই রুটী ও জলই যথেষ্ট"। ষ্টফেকার কোনরূপে নিঃশব্দে এই সকল কথা গলাধঃকরণ করিয়া শয়ন করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আজি একত্র শয়ন করিতে অনিচ্ছাভাব প্রকাশ করিলেন। ষ্টফেকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার স্ত্রী পুনরায় উত্তর দিলেন "ক্রীতদাস আছি, আমরাই আছি, কিন্তু আবার আর এক দুর্ভাগ্য জাতি সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি?" এইবারে ষ্টফেকারপত্নী জেসলার ও তাহার সঙ্গীগণের কথোপকথনের বিষয় স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিলেন। তখন ষ্টফেকার সমস্ত অত্যাচার স্মরণ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। সেই রাত্রেই তিনি তাঁহার শ্বশুর ওয়াল্টার ফার্ষ্টের নিকট চলিয়া গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। পরামর্শ করিতে করিতে জেসলারের নিদারুণ পীড়নে উৎপীড়িত মর্ম্মাহত মেলথল নামক এক কৃষকের কথা তাঁহাদিগের স্মরণ হইল।

মেলথল একদিন আপনার দুইটী গরু লইয়া ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। গরু দুটী হৃষ্টপুষ্ট ছিল। আপনার এই হৃষ্টপুষ্ট গরু দুটীর বিষয় আহ্লাদিতচিত্তে ভাবিতেছে, এমন সময়ে জেসলারের এক কর্ম্মচারী যমদূতের ন্যায় সহসা তথায় উপস্থিত

হইয়া বলিল, "তোর মত এক ক্রীতদাসের এত ভাল গরু থাকা নিষ্প্রয়োজন।" এই বলিয়া সে গরুর বল্গা প্রভৃতি খুলিয়া স্বীয় প্রভুর কাছে লইয়া যাইতে চাহিল। মেলথল তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া সম্মুখস্থ এক দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া তাহার আঘাতে সেই কর্ম্মচারীর হাত ভাঙ্গিয়া দিল। এই অপরাধে পলায়ন ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই দেখিয়া মেলথল অবশেষে অরণ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

অতঃপর ফার্ষ্ট ও ষ্টফেকার সেই নিপীড়িত মেলথলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে তাহাদিগের প্রত্যেককে জেস-লারের অত্যাচারে নিতান্ত দগ্ধপ্রাণ ও স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরু-দ্ধারে কৃতসঙ্কল্প দশজন করিয়া বীরপুরুষ আনিতে হইবে এবং সর্ব্বশুদ্ধ এই তেত্রিশ জনকে রুটলি নামক এক ক্ষুদ্রগ্রামে মিলিত হইয়া স্বাধীনতা বা মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে একটীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে।

রুটলি গ্রাম মন্ত্রণা করিবার এক উপযুক্ত স্থান। ইহা একটী উপদ্বীপ; চারিধার একটী হ্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কেবল একটী দিক অতি ন্যূনপরিসর ভূখণ্ডের দ্বারা সুইজার্ল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত। এই ভূমিখণ্ড এত অল্পপরিসর যে একজনমাত্র লোক অনায়াসেই সেই পথ রক্ষা করিতে পারিত। আর যদি বা বিপক্ষদল প্রহরীর হাত অতিক্রম করিয়া গ্রামে উপস্থিত হইত, তথাপি মন্ত্রণাকারী-দিগের বিশেষ কোন ভয়ের কারণ ছিল না; কারণ তাহারা স্বচ্ছন্দে কয়েকখানি নৌকার সাহায্যে একেবারে হ্রদের অপর পারে পলায়ন করিতে পারিত।

যাহা হউক, ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে ফার্ষ্ট

প্রভৃতি বাছা বাছা তেত্রিশ জন বীরপুরুষ একে একে রুটলি গ্রামে মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে কে ভাবিয়াছিল যে ত্রিশজন এরূপ উৎসাহী স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ পাওয়া যাইবে? এতদিন কি তাঁহারা ছিলেন না? ছিলেন অবশ্য, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। আজই বা তাঁহাদের এত যত্ন এত চেষ্টা আসিল কোথা হইতে? প্রকৃতি আজ তাঁহাদিগের হৃদয়ে এই স্বাধীনতাস্পৃহা দিয়াছে। প্রকৃতি হাসে না, কাঁদে না; কেবল অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। আপনার অভাব পড়িলে বিশ্বপাতার অখণ্ড নিয়মে প্রকৃতি আপনিই তাহা পূরণ করিয়া লয়। প্রকৃতি জেসলারের অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহার হৃদয়ে স্বাধীনতার এক ঘোরতর অভাব পড়িয়া গেল, তাই প্রকৃতি আজ সুইসদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে স্বাধীনতার ভাব, চেষ্টার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছে; তাই আজ স্বদেশহিতৈষী সুইসগণ স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিবার জন্য একত্র মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

ফার্ষ্ট, ষ্টফেকার এবং মেলথল এই তিন জন একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "যে ঈশ্বরের সম্মুখে রাজা প্রজা সকলেই সমান, আমরা তাঁহারই সম্মুখে শফথ করিতেছি—আমরা স্বদেশীয়দিগের জন্যই প্রাণ রাখিব এবং স্বদেশীয়দিগেরই জন্য প্রাণত্যাগ করিব; অভিন্নহৃদয়ে সকল কর্ম্ম করিব এবং সকল যন্ত্রণা সহ্য করিব; নিজেরাও অন্যায় কর্ম্ম করিব না এবং অপরের অনুষ্ঠিত অন্যায় আচরণও সহ্য করিব না; সম্রাটের সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা করিব; প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি অত্যাচার করিব না,

কিন্তু তাহাদিগের অত্যাচার দমন করিব।" বৎসরের প্রথম (১৩০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) বিদ্রোহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। সুইজার্লণ্ডে একটি গান প্রচলিত আছে যে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিতে বলিতে বক্তাদিগের পদতল হইতে তিনটি নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। নদী বাস্তবিক প্রবাহিত হোক বা না হোক, এরূপ সুবার্ত্তা বহন করিয়া সমস্ত দেশকে শ্যামল করিবার জন্য নদী-প্রবাহ আবশ্যক বটে।

এত অত্যাচারেও সমস্ত সুইস জাতি এখনও জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। এই সময়ে আরও দুইটী এমন ঘটনা ঘটিল যে তাহাতে সমস্ত সুইজার্লণ্ড কম্পিত হইয়া উঠিল ; তাহাতে প্রত্যেক সুইস একেবারে আত্মহারা হইয়া স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামে কৃতসংকল্প হইল।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রণার পর দিবসেই জর্ম্মানদেশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি শাসকদিগের সহায়বলে বলী হইয়া এক কৃষকের বাটীতে পীড়ন করিবার জন্য গমন করিল। সেখানে কৃষকপত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া কৃষকের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে কৃষকপত্নীকে স্নানের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিল এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ ঘৃণিত প্রস্তাব করিল। সে যেমন স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি কৃষকপত্নীও পলায়ন করিয়া স্বামীর নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। কৃষক কথাটী না কহিয়া কুঠার হস্তে একেবারে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে ফিরিয়া শুনিল যে অত্যাচারী তখনও স্নানাগারে আছে। সে তখনই স্নানাগারে গিয়া কুঠারের আঘাতে তাহার মস্তক বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং পলায়ন ব্যতীত রক্ষা নাই দেখিয়া সস্ত্রীক অরণ্যে পলায়ন করিল। এই সকল সংবাদ শুনিয়া কোন্ স্বামী নীরব থাকিতে পারে?

এখন অবধি কি স্বামী, কি ভ্রাতা সকলেই স্ব স্ব স্ত্রী ও ভগিনী-গণের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। সশঙ্ক অব-স্থায় কতদিন থাকা যায়? তাহার পর আর একটী ঘটনায় এইরূপ অবস্থা চলিয়া গিয়া সুইসগণ স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় আমরা সুবিখ্যাত উইলিয়ম টেলকে প্রথমে অবতীর্ণ দেখি।

জেসলার দেখিল যে প্রজাগণ তাহার অত্যাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে গুমরাইতেছে। ইহাতে সে স্থির করিল যে আরও কঠোর শাসনে এই অসন্তোষভাব বিনষ্ট করিবে। ভ্রান্ত বিশ্বাস! সাধারণের সমাগমভূমি আলডর্ফ নামক স্থানে একটী উচ্চ দণ্ডের উপর আপনার টুপি স্থাপন করিয়া জেসলার আদেশ প্রদান করিল যে, যে কেহ সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, সকলকেই সেই টুপির নিকট মস্তক অবনত করিয়া রাজসম্মান দেখাইতে হইবে। এই আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না দেখিবার জন্য কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে যদি কেহ এই টুপির নিকট মস্তক অবনত না করে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া বন্দী করা হয়। শান্ত, নির্ব্বিবাদী সুইসগণের তখনও এতদূর সাহস হয় নাই যে তাহারা এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাদ করিবে। কিন্তু এইবারে, ধর্ম্ম আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। সাধারণ লোকে যে আদেশ কঠোর দণ্ডের ভয়ে অমান্য করিতে পারিল না,ধর্ম্মভীরু উইলিয়ম টেল পার্থিব শাস্তির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া ধর্ম্মের অনুরোধে অনায়াসে সে আদেশ তুচ্ছ করিলেন।

উইলিয়ম টেল ধনুর্ব্বাণ হস্তে সপুত্রক আলডর্ফের মাঠে

বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রহরীগণ কর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও একটা জড়পদার্থ টুপির নিকট অবনতমস্তক হইয়া জেসলারের প্রতি ঐশ্বরিক সম্মান প্রদর্শন করা প্রকৃত খ্রীষ্টানদিগের কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া কিছুতেই তিনি প্রহরীদিগের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তখন অগত্যা প্রহরীগণ টেলকে বাঁধিয়া রাখিয়া জেসলারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। জেসলারের মহা আনন্দ উপস্থিত হইল; ভাবিল যে এইবারে টেলকে কোনরূপ গুরুতর শাস্তি প্রদান করিয়া সমুদয় অসন্তোষের বীজ বলের দ্বারা বিনষ্ট করিবে। জেসলার আদেশ দিল যে, যেহেতু টেল একজন বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর, এমন কি তাহার কোন লক্ষ্যই বৃথা যায় না, অতএব তাহাকে স্বীয় পুত্রের মস্তকে একটী ফল রাখিয়া একশত হাত দূর হইতে তাহা দ্বিখণ্ড করিতে হইবে। এই ঘোর নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া উপস্থিত সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপায় টেল অনায়াসে ফলটী দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন আবার আর এক দৃশ্য—সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। এই সকল গোলমালের অবসরে টেল অতিরিক্ত একটী তীর উঠাইয়া লইয়াছিলেন। জেসলার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন "যদি ফল বিদ্ধ করিতে গিয়া আমার সন্তানকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিতাম, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় তীরটী তোমার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতাম।" এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় বন্দী করিবার আদেশ হইল। পাছে অপরাপর প্রজাগণ তাঁহাকে প্রহরীদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করে, এই ভয়ে জেসলার স্বয়ং তাঁহাকে এক দুর্গম দুর্গে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

এই দুর্গে যাইতে হইলে নৌকাযোগে একটী হ্রদ পার হইতে হয়। একটী নৌকা ঠিক হইল ; তাহার খোলের ভিতর টেলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জেসলার ও কতিপয় প্রহরী নৌকায় উঠিলে পর রাত্রে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অর্দ্ধপথ অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন সময় সহসা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল—ক্রমে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে লাগিল ; যখন নৌকা বাঁচানো দুষ্কর হইল, তখন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে টেল ব্যতীত আর কেহই এ ঝড়ের মধ্যে নৌকা চালাইতে সমর্থ নহে। জেসলার অগত্যা টেলকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে বাধ্য হইল। টেল এই গোলমালের মধ্যে আলডর্ক মাঠের দিকে নৌকার গতি ফিরাইয়া লইলেন। অবশেষে যখন উপকূল পাওয়া গেল, তখন টেল স্বজ্ঞাত এক দুর্গম স্থানে নৌকা লইয়া গিয়া স্বয়ং উপকূলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নৌকাখানি কিছুদূরে ঠেলিয়া দিলেন। জেসলার ও তাহার সঙ্গীগণ এইরূপে রক্ষা পাইয়া প্রভাত হইলে নৌকা হইতে তীরে উঠিল। নিকটেই টেল আছে সন্দেহ করিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে চলিল যে যদি পলাতক টেল শীঘ্র ফিরিয়া না আসে, তবে প্রতিদিন একটী করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে নিহত করা হইবে। জেসলার এই কথা শেষ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করিতে না করিতে এক তীর আসিয়া তাহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল এবং সেই আঘাতেই তাহার জীবন পর্য্যবসিত হইল।

উইলিয়ম টেল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া এত কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা নহে। টেলের সংসারে বিচরণ-কালের মধ্যে ধর্ম্ম যখন টেলকে বলিল যে, টুপির

নিকট মস্তক অবনত করা উচিত নহে, তখন সেই ধর্ম্মের আদেশ মান্য করিতে গিয়া তাঁহাকে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত ও সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। এই ধর্ম্মযুদ্ধের ফলেই যেন সুইজার্লণ্ডের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

১৩০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ দিবসে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ফার্ষ্ট প্রভৃতি প্রধান মন্ত্রণাকারী তিনজন বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সুইস-দিগের মধ্যে এমন কে আছে যে এত অত্যাচারের পর সে এই হৃদয়ভেদী বিদ্রোহের ভেরীনিনাদ শুনিয়া উত্তেজিত না হইবে? চারিদিক হইতে সুইস প্রজামণ্ডলী আসিতে লাগিল।

ষ্টফেকার কুড়িজনমাত্র সঙ্গী লইয়া রসবার্গ নামক এক সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এই দুর্গ অধিকার করিবার একটী সুবিধা ঘটিয়া গিয়াছিল। তাহাও অত্যাচারের ফল। এই দুর্গের অধ্যক্ষ একটী সুইসকুমারীকে বলপূর্ব্বক পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল। সেই কুমারী মন্ত্রণাকারীদিগের মধ্যে একজনের সহিত বাগদত্তা ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রান্ত হইবার দিন ক্ষণ সকলই জানিতেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি উপর হইতে রজ্জু ঝুলাইয়া দেওয়াতে আক্রমণকারীগণ তদবলম্বনে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরদিবস একদল সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ জর্ম্মনবংশীয় সামন্তসর্দ্দার বিদ্রোহীদিগের ভয়ে এই দুর্গে আশ্রয় লইতে আসিয়া বিপক্ষদলের হস্তেই প্রতিভূস্বরূপে পড়িয়া গেল। ফার্ষ্ট ও উইলিয়ম টেল ইউরি দুর্গ অধিকার করিলেন; মেলথল ও অন্যান্য মন্ত্রণাকারীগণ অন্যান্য দুর্গ জয় করিতে লাগিলেন। সারনেম নামক এক দুর্গে প্রজাগণ প্রভাতে

দুর্গাধ্যক্ষকে উপহার দিবার ছলে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন আর তাহাদিগকে বাধা দেয় কে? অনায়াসেই দুর্গ তাহাদের আয়ত্ত হইল। এইরূপে ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে সুইজার্লণ্ডের স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
সুইজার্লণ্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক
একচত্বারিংশ আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

দ্বিচত্বারিংশ আলাপ—হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা। *

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আলবার্টহলে পঠিত। উপযুক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক অপক্ষপাতে সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি প্রথমে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস সংক্ষেপে দিয়াছেন। তাহার পরে তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের এক একটী আপত্তি ধরিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। খণ্ডনগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সুন্দর হইয়াছে। তিনি প্রথমেই ধরিয়াছেন যে বাণিজ্যাদির জন্য সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ নহে। তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে "ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমুদ্রজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, তাহাই কলিযুগে নিষিদ্ধ।" এইরূপে একে একে তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কেবল একটীমাত্র গুরুতর প্রশ্ন আছে। লেখক বলিয়াছেন যে জাতীয়তা রক্ষা পূর্ব্বক বিলাত গমন করা উচিত। আমরা স্বীকার করি যে জাতীয়তা রক্ষা পূর্ব্বক, কেবল বিলাতগমন কেন, সকল কার্য্যই করা উচিত। লেখক দুএকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা যেন আহার পরিচ্ছ-

---

* ১৮১৪ শক আশ্বিন মাসে লিখিত।

দাদির উপর এই জাতীয়তা নির্ভর করে বলিয়া আভাস দিয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন এই যে প্রকৃত জাতীয়তা কি কেবল আহার পরিচ্ছদাদির উপরেই নির্ভর করে? ইংরাজেরা যে নানা দেশে নানা দেশীয় লোকের হস্তে আহারাদি করিতেছে, তাহাতে কি তাহাদের জাতীয়তা চলিয়া গিয়াছে, অথবা এখানে মুক্তিফৌজগণ যে এদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে, তাহাতেই কি তাহাদের জাতীয়তা নষ্ট হইতেছে? ফরাসি, জর্ম্মন, ইংরাজ প্রভৃতি অধিকাংশ ইউরোপীয় একই প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং একই প্রকার আহারাদি করে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের জাতীয়তা নাই? আমাদিগের বোধ হয় যে জাতীয়তা কেবল আহারাদিতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না। জাতীয়তার মূল আরও গভীর—তাহার মূল আমাদের হৃদয়ে। আমরা যদি পরস্পরকে একই দেশের সন্তান বলিয়া ভাবিতে পারি, তাহা হইলেই দেখিব যে, যেখানেই গমন করি না কেন, জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অন্যের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না। তবে ইহা স্বীকার করি যে আহার ও পরিচ্ছদ জাতীয়তার অন্যতর পরিচায়ক চিহ্ন বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বপ্রধান নহে। তাহাই যদি হইত, তবে এখানে কত লোকে বিলাতে না গিয়াও যখন আহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করে, তখন তো তেমন গোলযোগ হয় না? আমরা যে আজকাল চোগাচাপকান পরিয়া আফিসে গমন করি, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আমাদের জাতীয়তা চলিয়া গিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম যে ব্যক্তিগত আহার পরিচ্ছদের উপর জাতীয়তাকে দাঁড় না করাইয়া, জাতীয়তার উপর আহার পরিচ্ছদকে দাঁড় করাইতে হইবে; অর্থাৎ আমাদের জাতীয়

ভাব প্রস্ফুটিত হইলে আহার পরিচ্ছদ স্বভাবতই জাতীয় আকার ধারণ করিবে। এই পুস্তকখানি নব্যবঙ্গের প্রত্যেক নব্য যুবকের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মূল্য এক আনা মাত্র।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

সাথে থাক ।*

(রাগিণী বেলাওল ।)

হৃদয়াসনে এস হে—
মরম দলিত পাপে ।
জাগে শুধু শোক তাপে ॥
প্রেমময় পিতা তুমি ।
দীন হীন শিশু আমি ॥
শীতল অমৃত ধারে ।
বরিষ হে হৃদি পরে ॥
রাখো হে জীবন ধারে ।
ডাকো বা মরণ পারে ॥
তোমারি চরণে দিব ।
প্রীতি প্রিয়কার্য্য সব ॥
সদা দেব সাথে থাকো ।
পাপতাপ যাবে রাখো ॥
নূতন অমৃত আশে ।
আনন্দে হৃদয় ভাসে ॥

—ঃওঁঃ—

---

* ১৮১৩ শক অগ্রহায়ণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত ।

চতুশ্চত্বারিংশ আলাপ—স্ব-তন্ত্র শিক্ষা।*

গতপূর্ব্ব সপ্তাহের বসুমতী পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ব-তন্ত্র শিক্ষার কল্পনা শীর্ষক একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রবীণ সমাজতত্ত্বজ্ঞের প্রবন্ধের উপর মতামত প্রকাশরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনে আমি অক্ষম। তবে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আমাকে দুএকটী কথা বলিবার অবসর ও অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ইন্দ্রনাথ বাবু যে উপসংহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার তো মতভেদ নাই-ই। আমি প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আজ পনেরো ষোল বৎসর এই মত প্রচার করিয়া আসিতেছি। আমার বিশ্বাস, কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ স্বদেশহিতৈষীরও সেবিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্গবাসী সংবাদপত্র, শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহারথীগণ ধন্য যে, তাঁহাদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে আমোদপ্রিয়, সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের অনুরাগী নব্যসম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিতগণের হৃদয়ে স্ব-সমাজের প্রতি অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগও আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। একটী প্রবাদ আছে যে ভাল লোককেও ক্রমাগত চোর চোর বলিলে সে চোর হইয়া পড়ে এবং, চোরকেও সাধু সাধু বলিলে সেও সাধু হয়। সেইরূপ আমাদের আশা হয় যে, এই সকল ব্যক্তি অন্তত ক্ষণিক ও মৌখিক অনুরাগ দেখাইতে দেখাইতে পরিণামে সত্যই নিজ সমা-

* ১৯০৬—১৭ই মার্চ্চ বসুমতীতে প্রকাশিত।

জের গুণগ্রাহী হইবেন। এই বিষয়ে ইন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি মহাশয়গণের অনুসরণ করিয়া যতটুকু সহায়তা করিয়াছি, ততটুকুই নিজেকে ধন্য মনে করি।

ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের উপসংহারটুকু এই—"যে স্ব-তন্ত্র শিক্ষার গুণে আমাদের সমাজে শান্তির সুধাধারা প্রবাহিত হইত, সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলেই আবার আমরা সুখী হইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর সেই স্ব-তন্ত্র শিক্ষা ভিন্ন যে সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, ইহাই নিশ্চয়। আবার বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থায় ব্রতী হইতে হইবে, আবার ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে, আবার এ সমাজে সন্তোষধর্ম্মা সদ্‌ব্রাহ্মণের পূজা যাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সমাদর যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, এবং মর্য্যাদা যাহাতে মুদ্রাঙ্কিতবৎ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি যে ফলে অনেকের একমত হয়, কিন্তু সেই মত দাঁড় করাইতে গেলে যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়েই যত কিছু মতভেদ ও গণ্ডগোল। কথা এই বটে যে "ব্রাহ্মণাদির বর্ণক্রমে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে," কিন্তু কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হইবে তাহাই বিচার্য্য। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে সাধারণত মনুসংহিতাকে অবলম্বন করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, এবং করিলেও টিঁকিতে পারিবে। তবে তাহাতে যে দুই চারিটী সাময়িক প্রথা উল্লিখিত আছে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিত্যাগ করিলেই চলিবে। মনুসংহিতার অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র অনুসরণ করিতে হইবে।

বর্ণাশ্রমসমাজ যে কি অর্থে ইন্দ্রনাথ বাবু ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। সমগ্র প্রবন্ধটী পড়িয়া আমাদের অনুমান হয় যে জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপর সংগঠিত সমাজ অর্থেই বর্ণাশ্রমসমাজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিভেদ ভাল কি মন্দ তাহা এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিচার করা অসম্ভব এবং আমি তাহা করিতেও ইচ্ছা করি না। এই মাত্র বলিতে পারি যে জাতিভেদ কোন না কোন আকারে থাকিবেই। যখন ইহা থাকিবেই, তখন ইহার সুগঠন প্রদান করিলেই কি ভাল হয় না? আলোচনার ফলে আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, জাতিভেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতার মত এই যে গুণকর্ম্মভেদের উপরেই জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত; এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়াও কর্ত্তব্য। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অস্বীকার করিলে সমাজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া একব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ম্ম করে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের পদবীতে রক্ষা কর এবং উপযুক্ত মর্য্যাদা দাও। কিন্তু যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ব্রাহ্মণের অনুপযুক্ত মদ্যপান ব্যভিচার প্রতারণা প্রভৃতি কর্ম্মে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাকে যদি ব্রাহ্মণত্ব হইতে নামাইয়া দেওয়া না হয়, তবে পাপের দণ্ড কোথায়? সমাজের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর পাপের দণ্ড সমাজের হস্তে থাকা কর্ত্তব্য। যে সমাজ এরূপ দণ্ড দিতে ভয় পায় বা অক্ষম, সেই ভীরু কাপুরুষ ও দুর্ব্বল সমাজের মৃত্যুই শ্রেয়। কেবল পরলোকের শাস্তির কথা বলিলে চলিবে না, ইহলোকেও শাস্তি চাই। সেইরূপ যদি কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশ পুরুষানুক্রমে সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে,তবে সেই বংশ ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর

শ্রেণীর অধিকার পাইবে না কেন, তাহার তো কোন যুক্তি দেখিতে পাই না। যখন ভারতে এইরূপ গুণকর্ম্মভেদে জাতি-ভেদ সংগঠিত হইত, তখন আত্মবিচ্ছেদ বিবাদকলহ প্রভৃতির কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যখন অবধি দোষগুণ-নির্ব্বিচারে জাতিভেদ জন্মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল, তখন অবধিই মধ্যে মধ্যে গুরুতর আত্মবিচ্ছেদ, বিবাদবিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত হইতে লাগিল। সমাজকে সজীব করিতে ইচ্ছা করিলে ন্যায়ের পুরস্কার এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানের উপায় রাখিতেই হইবে। জন্মানুসারে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইবার একটী প্রধান কারণ আলস্য। এইরূপ জাতিভেদের উপর দণ্ডায়মান সমাজে সজীবতার প্রয়োজন নাই।

উপসংহারে ইন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমি একমত হইলেও তাঁহার মূল প্রবন্ধের সহিত আমি মিলিতে পারি নাই। তিনি প্রবীণ ধর্ম্মভীরু হইয়াও সংস্কারবশত নিজ সমাজের গুণকীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য জাতির সমাজকে কটূক্তি করিয়াছেন—"ম্লেচ্ছাদিরা সর্ব্বাচারবিহীন, গোখাদক এবং বেদের বিরুদ্ধভাষী ও বহুভাষী।" এই কথাগুলি বর্ত্তমানে হিন্দুদিগের শ্রুতিপ্রিয় হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এগুলি অন্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমাদের বর্ণাশ্রমপ্রথা আমাদের সমাজের উপযোগী বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অথবা সমাজ হইতে ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্তমত জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রথাকে ইংরাজসমাজে রোপণ করিলেই যে সুফল হইবে একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। ইংরাজ প্রভৃতি জাতি যদি সর্ব্বাচারবিহীন হইত, তাহা হইলে কি আজ

তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত? আমরা আপনাদিগকে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতে পারি যে আমাদের জড়তা ও আলস্য শ্রেষ্ঠতম উন্নতির নামান্তর মাত্র এবং অন্যান্য জাতির সজীবতা রূপান্তরিত অবনতি। আমরা দিবানিশি আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া কল্পনা করিতে পারি যে আমরাই একমাত্র শুদ্ধাচারী ও ধর্ম্মের পারগামী এবং অন্যান্য সকল জাতিই আচার-বিহীন ও অধর্ম্মপরায়ণ। এইরূপ ভাবিয়া পরনিন্দা করিলেই কি আমরা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইব এবং অন্যান্য জাতি নিরয়গামী হইবে? আমার তো সে ধারণা নাই। আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেক জাতিই আপনাপন গুণকর্ম্মের অভিব্যক্তি সাধন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই সমাজে নিজ নিজ উপযোগী আচার ব্যবহার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা এখানে যেমন প্রকৃত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মানদানে অগ্রসর হই, বিলাতেও সেইরূপ গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় মহাত্মাদিগের প্রতি ততোধিক সম্মান প্রদর্শিত হয়। গ্ল্যাডষ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিগণ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিবার কিসে অনুপযুক্ত তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গোমাংস ভক্ষণের কারণে ম্লেচ্ছদিগের প্রতি যে গোখাদক নাম অর্পিত হইয়াছে, সেই একই কারণে আমাদের পূর্ব্বতন অনেক ঋষিও ম্লেচ্ছের শ্রেণীতে পড়িয়া যান। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সাধারণত গোখাদক না হইয়াও যে অবনতি লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য জাতি গোখাদক হইয়া যে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে, তাহাতে পূর্ব্বতন গোখাদক পবিত্র ঋষিদিগকেও ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত করা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না, আর বর্ত্তমান

উন্নত জাতিসমূহকেও গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করাও আমাদের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচায়ক নহে। গো অথবা কোন প্রকার জীবহিংসার সমর্থন করি না বটে, কিন্তু অযথা অপর জাতির নিন্দাও আমাদের প্রিয় নহে। ম্লেচ্ছগণ বহুভাষী, একথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। ইন্দ্রনাথ বাবু স্বজাতিপ্রেমের স্রোতে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়াছেন বোধ হয়। আমাদের ন্যায় বঙ্গবীরগণের এত বক্তৃতাও যে ইন্দ্রনাথ বাবুর কাছে পৌঁছায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। বহুভাষিত্বই যদি ম্লেচ্ছত্বের কারণ হয় তবে আমার বোধহয়, সাধারণত বাঙ্গালীই ম্লেচ্ছদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভের অধিকারী। ম্লেচ্ছদিগকে বেদের বিরুদ্ধভাষী বলা কোন কাজেরই কথা নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে কয়টা লোকে বেদের নাম শুনিয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে? বরঞ্চ আমরা জানিয়া শুনিয়া বেদবিরুদ্ধ আচরণ করি বলিয়া আমাদিগের নিজেকেই ম্লেচ্ছ বলা কর্ত্তব্য। অপ্রয়োজনে অপরের প্রতি কটূক্তি আমাদের নিতান্তই অপ্রিয়, তাই এসম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম।

ইন্দ্রনাথ বাবু জাপানের উন্নতিকে উন্নতিই বলেন না। উন্নতি, শ্রেষ্ঠতা এ সকলই আপেক্ষিক শব্দ। আমার পক্ষে যাহা উন্নতি, অপরের পক্ষে তাহা উন্নতি না হইতে পারে। আমার কিছু অন্নসংস্থান আছে, তাই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেছি। কিন্তু একজন ব্যবসায়ী, যাহাকে নানাদিক দেখিয়া শুনিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে, তাহাকে এইরূপ প্রবন্ধাদি লিখিতে বলিলে প্রকৃতপক্ষে কি তাহার অবনতির পথ উন্মুক্ত করা হইল না? জড়তা উন্নতি নহে, সজীবতাই উন্নতি। জাতি

সজীব থাকিলে নিজ নিজ উন্নতির যথার্থ পথ নিজেই আবিষ্কার করিতে পারে। বৈদিক কাল কেন উন্নতির কাল ছিল? তখন সমাজ সজীব ছিল বলিয়াই উন্নতি হইত, কেবল বৈদিক কাল বলিয়াই নহে। বেদেও এখনকার কালের উপযুক্ত নানা অনাচার দুরাচারের কথা যথেষ্ট উল্লিখিত আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উন্নতি হইয়াছিল—সজীবতা ছিল। পার্থিব উন্নতির প্রতি পরাঙ্মুখতা প্রদর্শিত হইত না, প্রত্যুত তাহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান করা হইত। যখন অবধি মোহান্ধতা প্রযুক্ত ঋষিদের কালাগত অভিপ্রায় অবগত না হইয়া সাধারণ ব্যক্তি পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে বিভাগের একটা প্রাচীর সংস্থাপন করিল, তখন অবধিই আমাদের অবনতির সূত্রপাত।

আর একটী বিষয় বলিয়া আমি আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। ইন্দ্রনাথ বাবু যে যুক্তিবলে বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না তিনি বলেন "অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই বর্ণাশ্রম-সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; অনন্ত কাল এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। * * * কোথাও বর্ণাশ্রমসমাজের অঙ্গহীন হইয়াছে সত্য, কোথাও বা বর্ণাশ্রমসমাজের বন্ধনের শৈথিল্য ঘটিয়াছে, তাহাও সত্য; দিনদিন যেন বর্ণাশ্রমসমাজের শক্তিক্ষয় হইতেছে, ইহাও অস্বীকার করি না।" কিন্তু এই যে শত শক্তিক্ষয় ও অঙ্গহীনতা ও বন্ধনশৈথিল্যের মধ্যেও "বর্ণাশ্রমসমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে * * * বর্ণাশ্রমসমাজের এই স্থায়িত্বই বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠতার এক প্রধান নিদর্শন।" অনাদি কাল আমরা

বর্ত্তমান শরীরে ছিলামও না এবং অনন্তকালও থাকিব না, সুতরাং ইন্দ্রনাথ বাবুর বর্ণাশ্রমসমাজের চিরঅস্তিত্ববিষয়ক যুক্তির যাথার্থ্য পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে দুর্ঘট। তবে ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে ভারতের আর্য্যদের সমাজে বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের বহুল তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বাবুরও উক্তি আলোচনা করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনিও এই বর্ণাশ্রমসমাজের চিরস্থায়িত্ব স্বীকার করেন না। যে সমাজের অঙ্গহীনতা ঘটিতে পারিল, বন্ধনশৈথিল্য আসিতে পারিল, এবং শক্তিক্ষয় সম্ভব হইল, সে সমাজের চিরপ্রতিষ্ঠা ও অটুটত্ব কোথায়? এই সকল সত্ত্বেও যদি বর্ণাশ্রমসমাজের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রমসমাজের নিজের গুণে নহে, কিন্তু প্রয়োজনের বলে এবং দেশের মাটীর গুণে। যে দেশে পরিবর্ত্তনমাত্রই সসঙ্কোচে দৃষ্ট হয়, যে দেশের অধিবাসীগণ বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে চাহে না, সে দেশে যে কোন প্রথা, অনিষ্টকর হউক বা ইষ্টকর হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অনাবশ্যক হউক, একবার কোন সূত্রে প্রচলিত হইয়া গেলেই তাহার চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। যে যুক্তি-বলে ইন্দ্রনাথ বাবু আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই যুক্তিবলে বোধ হয় প্রত্যেক সমাজ, অন্ততঃ প্রত্যেক সভ্য সমাজ, নিজ নিজ সুপ্রতিষ্ঠতা ও অটুটত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ।

আমি যথেষ্ট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্য আশা করি ইন্দ্রনাথ বাবু এবং আপনি এবং পাঠকবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সত্যই বর্ণাশ্রমসমাজের প্রতি আমার অনুরাগ

আছে বলিয়াই আমি এত কথা বলিলাম। কেবল মুখে বলিলে কি হইবে যে আমাদের সমাজে ধর্ম্মের প্রাধান্য? কোথায় তাহার পরিচয়? একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার ফলে আমরা সুবিধা পাইলেই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর গলে ছুরিকা বসাইতে কুণ্ঠিত হই না। ধর্ম্মের নাম করিয়া মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিই—আমাদের সমাজের মঙ্গল কোথায়? আমাদের সমাজ যে এখনও আছে, ইহাই আশ্চর্য্য! যেমন স্বদেশী সম্বন্ধে একটা আনন্দজনক ভাব সকলের মনে জাগ্রত হইয়াছে, সেইরূপ সমাজ সম্বন্ধেও একটা দৃঢ় ভাব জাগ্রত হইলেই আমাদের মঙ্গল। স্বদেশী হাঙ্গামার ন্যায় এই বিষয়ে হল্লা করিলে চলিবে না। কয়েকটী নেতৃপদস্থ ব্যক্তি একত্র হইয়া অগ্রসর হইলেই প্রচুর কার্য্য হইবে। বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে যে সামাজিক গ্রহণরূপ আত্মীয়পীড়ন অন্যায়, ইহা ক্রমশই সমাজের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, কিন্তু ইহার জন্য টাউনহলে কয়টা সভা হইয়াছিল? সামাজিক শিক্ষা, স্ব-তন্ত্র শিক্ষা সমাজের মুখপাত্রদিগের হস্তে এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের হস্তে। এখানে কাপুরুষ ভীরুদের স্থান নাই। এই সকল বিষয়ে কথা কহিতে গেলেই ঐ সেই মুখ্য কথায় আসিয়া পড়িতে হয়—ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফলেই শরীর, মন ও আত্মায় তেজ আসে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করে। বিদেশীয়ের হস্তে অপরা বিদ্যা শিক্ষাদানের সহস্র বন্দোবস্ত থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে পরা বিদ্যা স্বতই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দাও, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার একটা অবসর দাও। এইরূপ উপায় সকল :অবলম্বন করিতে করিতে তবে আমাদের হারানিধি শান্তিসুখ যথাসময়ে খুঁজিয়া পাইব, সে

বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভগবানকে প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, পারি না কেন? ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। শরীর ও মন দুর্ব্বল, একথা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য এতদিন অবলম্বন করি নাই। বেশ, আজ হইতেই তাহা করিব এবং দৌর্ব্বল্যকে আমার নিকটে পদার্পণ করিতে দিব না। ভগবান—আমার প্রাণের ভগবান—তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব? পারিব না—তাহা পারিব না। লোকে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, পাগল বলুক, বা জ্ঞানী বলুক. আমি ব্রহ্মচর্য্যের বল বুঝিয়াছি এবং কেহই আর আমাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। এই প্রকার ভাবে নিজেকে নিমগ্ন কর, দেখিবে ভারতের মুখশ্রী অন্যভাব ধারণ করিবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে

স্ব-তন্ত্রশিক্ষা বিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ

আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

পঞ্চচত্বারিংশ আলাপ—হিমাচল। *

তুষারমণ্ডিত হিমাচল নিস্তব্ধ—গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সংসারের কোলাহলের প্রতি—এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্রতার প্রতি—ঐ মহান্ স্তব্ধ হিমগিরি কত না উপেক্ষার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে! যেন ধরণীর পার্থিব সুখের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ব্রহ্মলোকের শাশ্বত সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। "প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমঃ।" সেই অন্তরতম সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষ বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয় এবং অন্যান্য সমুদয় অপেক্ষা প্রিয়তম। এই পরমাত্মাকে মহান্ প্রেমযোগ সাধনের দ্বারা লাভ করিয়া আর যেন সংসারের কোলাহল সে ভালবাসে না; তাই এই সমাহিত মহান্ পর্ব্বত প্রেমসাগর হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া আপনাতে আপনি স্থির হইয়া আছে। সময়ে সময়ে যখন ইহার প্রেম উছলিত হইয়া উঠে, যখন এই উছলিত প্রেম ইহার হৃদয়ের ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, তখন ভগ্নবাঁধ জলাশয়ের ন্যায় প্রেমধারা নদী হইয়া প্রেমের অনন্ত সাগরে ধাবিত হয় এবং গমনকালে প্রেমকণায় চারিদিক সিক্ত করিয়া যায়। প্রেমের বলে পাষাণ-অন্তর মরুভূমি পর্য্যন্ত শস্যশ্যামলা হইয়া যায়।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
হিমাচল বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—ঃওঁঃ—

---

* ১৭ বৎসরের রচনা।

ষট্‌ চত্বারিংশ আলাপ—নির্ঝরিণী। *

অত্যুচ্চ হিমাচল হইতে নির্ঝরিণী নির্গত হইয়া কুলু কুলু গান গাহিতে গাহিতে অনন্তসাগরের পানে ধাবিত হইয়াছে। প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য নির্ঝরিণী ত্বরিতগতিতে চলিয়াছে—মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইতে পারিতেছে না। নির্ঝরিণী স্বইচ্ছায় সাগরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে এক মহান্‌ প্রেমের আলিঙ্গনে ধরা দিতে চাহিতেছে। সেই মহান্‌ প্রেমযোগের শেষ আছে কিনা তাহা কে বলিতে পারে? হয়তো এ প্রেমের অনন্ত-কালেও ধ্বংস হইবে না—মহাপ্রলয়েও এই প্রেমযোগের ধ্বংস নাই। যখন সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে, যখন কেবল আকাশমাত্র থাকিবে, তখনও এই প্রেমানন্দ ধ্রুবতারাস্বরূপে জাগ্রত হইয়া থাকিবে। সেই একদিন নির্ঝরিণীকে জগতের প্রেমশিক্ষাদানে নূতন ব্রতী হইতে দেখিয়াছিলাম; আজও তাহাকে সেই ব্রত পালন করিতে দেখিতেছি। সে জগতের বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন উপায়ে প্রেমের সেই এক মহান আনন্দ জাগ্রত করিয়া তুলি-তেছে। ইহাই নির্ঝরিণীর চিরজীবনের ব্রত এবং চিরজীবন সে ইহা আনন্দে পালন করিবে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
নির্ঝরিণী বিষয়ক ষট্‌ চত্বারিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—:ওঁ:—

---

* ১৭ বৎসরে লিখিত।

সপ্তচত্বারিংশ আলাপ—তুমি।

তুমি কে ?—

তুমি আমি নও, আমি তুমি নই। তুমিই আমি, আমিই তুমি। তুমি আমার ক্ষুধার আহার, তুমি আমার পিপাসার জল। তুমি আমার একমাত্র আরামস্থান। প্রভাতে যখন মেঘের আড়াল থেকে সোনার সূর্য্য ধকধক জ্বলিতে জ্বলিতে ব্রহ্মচক্র পরিভ্রমণে বহির্গত হয়েন, তখন তাহাতে তোমাকেই দেখি। ত্রিবাস্তরের মাঠের সীমায় যখন বৃক্ষরাজির নিবিড় শ্যামলতা উষ্মকম্পিত বাতাসের মধ্যে কম্পিতভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া একটা আলস-আবেশ আনয়ন করে, আর তাহারই উপরে সূর্য্যরশ্মিবিভাসিত আকাশের উজ্জ্বল সাদা মেঘ সকল দাঁড়াইয়া যখন স্থিরনেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর হাসিকান্না উপেক্ষার সহিত দেখিতে থাকে, তখন সেই মধুর আলস-আবেশের মধ্যে তুমিই জাগিয়া থাক, আর সেই মেঘেদের স্থির ভাবেরও মধ্যে তোমারই সুন্দর মুখ দেখিতে পাই। মাঠের মধ্যে সুদূর ক্ষেত্রে যখন ধেনুগণ বিচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাতেও তুমি। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না যখন সংসারের ধূলিধূসরিত প্রাণে বিশ্রাম আনয়ন করে, তাহাতে তুমিই। গভীর নিশীথে যখন সমস্ত প্রাণী নিদ্রায় অভিভূত, তখন একমাত্র জাগ্রত আমার প্রাণে বেহাগ রাগিণী বাঁশীর সুরে দূর দূরান্তর হইতে ভাসিয়া আসিয়া যে সকল ভাবের লহরী জাগাইয়া তুলে, তাহাতে তোমারই ছায়া প্রতিচ্ছায়া।

বৈশাখের কঠোর গ্রীষ্মের মাঝে যখন কালবৈশাখী ঝড় নামিয়া ধরাতল শীতল করিয়া দেয়; যখন বজ্র কড়কড় রব করিয়া পৃথিবীর দূষিত ভাবসকল দূর করিয়া দেয়, তখন তোমারই স্নেহহস্ত তাহাতে অনুভব করি। বর্ষার ভরা বাদল যখন ক্ষিতি-তল সিক্ত করিয়া ভবিষ্যতের লোকসমূহের অন্ন সংস্থান করিতে থাকে, তখন অন্নপূর্ণা তোমারই করুণাকথা হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। শরতের প্রারম্ভে ধানক্ষেতের শ্যামলতা তোমারই শ্যামল ছবি প্রাণেতে অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আকাশে যখন সারস হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে উড়িয়া যাইতে থাকে, তখন সেখানে তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে দেখিব? গ্রহনক্ষত্রের আলোক-মাত্রে আলোকিত নিশীথের গভীরে যখন দেশান্তরগামী পক্ষীগণ দলছাড়া হইবার ভয়ে পরস্পরকে অস্ফুট ভাষায় সাবধান করিতে থাকে, তাহাদের সেই অস্ফুট ধ্বনিতে তোমারই প্রাণের গীত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আইসে।

পল্লীগ্রামে নিবিড় বৃক্ষরাজির শ্যামলতা ভেদ করিয়া দুএকটী কুটীর যখন জাগিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ হয় তাহাতেও তুমি। কুলবালাগণ পুষ্করিণীর জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে করিতে পল্লীগ্রামের যে শান্ত সুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশিত করে, তাহাতে তোমারই শান্তমূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিতে পাই। ঘোমটার আড়ালে তাহাদের সলজ্জভাবের মধ্যেও তুমিই। সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণের সরলতা নিশ্চয়ই তোমারই সরলতার ছায়া।

হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের উচ্চতায় এবং তাহার উপত্যকার

নিম্নতম গভীরে কেবল তোমারই গাথা, তোমারই ছায়া, তোমারই প্রাণ। জাহ্নবীতে অবগাহন কালে 'জলের ভিতরে দেখি সেখানেও তুমি।'

পুরুষের কর্ম্মকুশলতায়, রমণীর সতীত্বে, বিবাহের মঙ্গল ধ্বনিতে, সুখী পরিবারের সুখে, ছেলেদের হাসিধ্বনিতে, পরোপকারের আনন্দে, এক কথায় সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে তুমি—তুমি—তুমি।

তোমার যে আরাধনা করি, তাহাতেও তুমি—তুমি—তুমি। আমার শরীরের প্রতি পরমাণুতে তুমি—ইহাতেও তুমি আমি নও; আমার মনের প্রত্যেক চিন্তাতে তুমি—ইহাতেও আমি তুমি নই; আমার আত্মাতে অনন্তকালের জন্য তুমি—তুমিই আমি, আমিই তুমি—আর কোন কথা নাই—আমি নির্ব্বাক! সংসার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিলে আবার সেই প্রশ্ন আসে—তুমি কে?

বোলপুর, শান্তিনিকেতন
৫ই আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত আলাপ গ্রন্থে
তুমি বিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ
আলাপ সমাপ্ত।

—:ও:—

হৃদয়।

(লংফেলো)

সাগরের তলে মুকুতা রাশি,
গ্রহতারা খচিত আকাশে ;
আমার হৃদয়ে—আমার কিন্তু
হৃদে শুধু প্রেম সদা পরকাশে
সাগর আকাশ মহান জানি,
তা' হ'তে মহান হৃদয় আমার ;
মুকুতা তারকা সকল হ'তে
উজ্জ্বল প্রকাশে মম প্রেমহার।
যউবনে ভরা রমণী তুমি
মোর সে হৃদয়ে থাকগো বসিয়া ;
সাগর, আকাশ, হৃদয় মম
প্রেমধারে ঝরে সকলি গলিয়া।

মজঃফরনগর
৩রা বৈশাখ, ১৩১৭।

তুমি।*

নিঝুম নীরব রাতে
জগত ঘুমায়ে আছে।
পাখী এক ডেকে ওঠে
সুদূর বনের গাছে॥
লুকায়ে লুকায়ে চাঁদ
গাছের আড়ালে এসে।
চুমে যায় ফুলে—তারা
চাহে মধুর আবেশে॥
স্বপনের রাজ্য থেকে
তারাগুলি থাকে চেয়ে।
দখিনে বাতাস বহে
উদাস সঙ্গীত গেয়ে॥
দূর হতে ভেসে আসে
মধুর বাঁশীর গান।
মরমে প্রেমের জাগে
সুখের ব্যথার প্রাণ॥
তখন তোমারি কথা
ভরিয়া উঠেগো প্রাণে।
জগত ছাইয়া যায়
কি-এক আনন্দ গানে॥

---

* রাখি পূর্ণিমা, ১৩১৭ সাল।

আবার দিবস কালে
জাগ্রত সকলে যবে।
একমনে ছুটে চলে
আপনার কর্ম্মে সবে॥
বালক যুবক যত
যেথা হাস্যরোল তুলে।
তোমারে সর্ব্বত্র সদা
দেখি পূর্ণ হৃদিমূলে॥
তোমারি নীরব ভাষা
মরমে শুনিতে পাই।
তোমারি মধুর হাসি
পরাণে দেখিতে পাই॥
তব ভাবে পূর্ণ হিয়া
যে মুহূর্ত্তে নাহি রাখি।
আনন্দ রাশির মাঝে
মরণে ডুবিয়া থাকি॥

—ঃওঁঃ—

একপঞ্চাশ আলাপ—সংক্ষিপ্ত সমালোচনী। *

(ক) আৰ্য্যপ্রতিভা।+

আৰ্য্যপ্রতিভা—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত এবং শ্রীহীরালাল ঢোল সম্পাদিত (প্রথম বিকাশ)। গ্রন্থের নামই কতক পরিমাণে ইহার আভ্যন্তরীণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতীয় আর্য্যগণ বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর ছিলেন, তাহাই প্রমাণাদির দ্বারা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিষয় যেমন গুরুতর, ইহার ভার তেমনি উপযুক্ত লোকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানে অধ্যবসায় ও পারদর্শিতা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তদ্বিষয়ে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই গ্রন্থেও তিনি শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন—পাঠকগণ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিতে পারিবেন না। তবে এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুএকটী সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর সংশয় আসিয়াছে—তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা দুইটী মাত্র উল্লেখ করিব। একটী এই যে পৃথিবী অচল। গ্রন্থকার স্বয়ং আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে তিনি এই বিষয়ে একটী পৃথক প্রস্তাব লিখিবেন ; আমরাও এখন এই বিষয় আলোচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

দ্বিতীয় সংশয় এই যে আকাশ একটী বাস্তব পদার্থ কি না। গ্রন্থকার আকাশকে একটী পৃথক পদার্থ বলিয়া ধরিয়াছেন।

---

* ১৮১৩ শক অবধি ১৮১৭ শক পর্য্যন্ত কালমধ্যে লিখিত।

+ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৫ শক, বৈশাখ।

তিনি ছায়াকেও একটী পদার্থ বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে ইহাদের কোনটীই বাস্তব পদার্থ নহে। ছায়াকে আমরা আলোকের অভাবই বলিতে পারি। ফোটোগ্রাফিতে যে ছায়ার কার্য্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে আলোকের কার্য্যের অভাব মাত্র। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানমতে বাস্তব পদার্থের দুই জিনিস থাকা নিতান্ত আবশ্যক—বিস্তৃতি ও বাধকতা (extension and resistance)। এই কারণে আমরা আকাশকেও পদার্থ বলিতে পারি না—কারণ আকাশের উক্ত দুই গুণ নাই।

বাহুল্যভয়ে অপর সংশয়গুলি কিম্বা দ্বিতীয় সংশয় সম্বন্ধে আরো কতকগুলি বক্তব্য বলিতে পারিলাম না। যাই হোক পাঠকগণ এই গ্রন্থপাঠে প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত ও পরম পরিতৃপ্ত হইবেন।

—o—

(খ) খৃষ্টমাস ও বিজয়া।

শ্রীপতি বাবু অনেক দিবসাবধি বিলাতে থাকিয়া বিলাতীয় সমাজের ভিতরকার খবর পাইয়া তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, সেগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক। বর্ত্তমান সংখ্যায় (নব্যভারত ১৩০৪, চৈত্র) খৃষ্টমাসের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের বিজয়ার অভিবাদন ও প্রেমালিঙ্গন অপেক্ষা বিলাতে খৃষ্টমাসের দিনে অভিবাদন ও প্রেমালিঙ্গন প্রাণ খুলিয়া করা হয়। আমাদের বোধ হয় যে শ্রীপতি বাবু সহরের দুএকটী ঘরের বিজয়া ব্যাপার অথবা পল্লীগ্রামেও দুএকটী দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা

বাস্তবিক পল্লীগ্রামের মুক্তপ্রাণ ব্যক্তিদিগের বিজয়াসম্ভাষণ প্রভৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা শ্রীপতি বাবুর উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন না। তবে বিলাতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে—আমরা দরিদ্র; বিজয়ার উৎসবের দিনেও ঘরে ভাত আছে কি না এচিন্তা সহজে আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। বরঞ্চ সেই চিন্তা দিন দিন বাড়িতেছে, কাজেই আমরা উৎসবেও নিরাময় আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। তাহা হৃদয়ের সম্প্রীতির অভাবে নহে।

—০—

(গ) নববিধান কি? *

নববিধান কি?—৺কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত। কৃষ্ণবিহারী বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পরে তাঁহার সুশীল ও ভক্তিমান পুত্র শ্রীমান কুমুদবিহারী সেন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব। তাঁহার এই গ্রন্থ আমাদিগের শোক জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। মোটের উপর ইহা বলিতে পারি যে "নববিধান" শব্দ খৃষ্টীয় new dispensation শব্দের অনুবাদ; তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে খাটে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সনাতন বিধান। প্রতি আচার্য্যকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যানে যদি ঈশ্বরের নূতন বিধান ব্যক্ত হইত, আজিকার বিধান যদি কাল এবং কালিকার বিধান যদি পরশ্ব পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মনিয়মের প্রতি মনুষ্যের আস্থা অবিচলিত থাকিত না। আজিকার ব্যাখ্যাত সত্যধর্ম্ম যদি নববিধান হইল, তবে পরদিনের প্রকাশিত সত্যধর্ম্মের

* তঃ বোঃ পত্রিকা ১৮১৮ শক, আষাঢ়।

কোন নূতন ব্যাখ্যান নবতর বিধান; তৎপরবর্ত্তী কোন নূতনতর ব্যাখ্যান আরো নবতর বিধান, এইরূপ ক্রমাগতই হইতে থাকিবে। কাজেই এখনকার এই নববিধান তখন পুরাতন বিধান হইবে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে "নববিধান" নামের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। খৃষ্টভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে খৃষ্টের পরে কোন ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হইতে পারে না, এইজন্য তাঁহাদের ধর্ম্মকে তাঁহারা নববিধান নামে সংজ্ঞিত করিতে পারেন। এখনকার সম্প্রদায়বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সেরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রেরিত নববিধানের প্রবর্ত্তক বলিয়া দাঁড় করাইলে কৃতবিদ্য ভক্তসমাজ কখনই সে কথায় সায় দিতে পারিবেন না। গ্রন্থের মধ্যে যিশুখৃষ্টের সম্বন্ধে অনেকস্থলে যে ভাবের কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। রচনা ও ভাষা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না—বোধ হয় গ্রন্থকার শেষাংশ পুনর্লিখিত করিতে অবসর পান নাই। কতকগুলি ঐতিহাসিক অংশ আমাদিগের সুন্দর লাগিয়াছে।

—o—

(ঘ) The Non-Sectarian Church. *

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টলুই নগরে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমাজ (The Non-sectarian Church) নামক এক ধর্ম্মসমাজ কয়েক বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজ হইতে মুখপত্র স্বরূপে "The Non-sectarian" নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্র হইতে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত

* তঃ বোঃ পত্রিকা ১৮১৫ শক, শ্রাবণ।

এই সমাজের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই সমাজের সভ্যেরা যিশুখৃষ্টকে পুত্র ঈশ্বর কিম্বা পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে খৃষ্ট একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক বটে কিন্তু তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারেন না। আবার তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন না যে, ঈশ্বর স্বর্গের কোন বিশেষ স্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর আমাদের আত্মার আত্মা এবং তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই আমাদের মুক্তিসাধনের একমাত্র উপায়। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও তাঁহারা স্বীকার করেন না।

তত্ত্ববোধিনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইল ডাক্তার স্পিনার এদেশে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, জর্ম্মনি প্রদেশে (নামে উদারখৃষ্টীয় মতাবলম্বী) কুড়ি হাজার একেশ্বরবাদী আছেন। এখন একেশ্বরবাদই একমাত্র শান্তির উপায়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত আমেরিকাস্থ অসাম্প্রদায়িক সমাজের সভ্যসংখ্যা প্রায় তিনশত এবং এই সভ্যগণ সকলেই তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহা ব্যতীত উক্ত রাজ্যের বোষ্টন নগরে পার্কার কর্ত্তৃক স্থাপিত একেশ্বরবাদীদিগের এক সমাজ আছে। এইরূপে চতুর্দ্দিকেই দেখিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধূমিত হইতেছে। একদিন দেখিব যে এই স্বর্গীয় অগ্নি সকল দেশে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। তখন সেই অগ্নি সমুদয় সাগরের জলেও নির্ব্বাপিত হইবে না।

(ঙ) নারীজাতির উচ্চ শিক্ষা।

(১৩০৭ সালের পৌষ ও মাঘ,নব্যভারত)। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে "পুণ্যে"ও অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। নারীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানোন্নত ব্যক্তির অসম্মতি থাকিতে পারে না। তবে অবশ্য কথা এই যে কি প্রণালীতে সে শিক্ষা হইতে পারে; সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন বি-এ, এম-এ পাস দিলে ভাল; কেহ বলেন বেদ পুরাণ পড়ানো ভাল ইত্যাদি। আমাদিগের মতে কাল, অবস্থা ও পাত্র বুঝিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রণালীর বিভিন্নতা হওয়া আবশ্যক এবং তাহা হইবেই। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা দিতে গিয়া কঠোর যন্ত্রপেষণে বালিকাদিগের সরস হৃদয়কে যেন নীরস করিয়া না ফেলা হয়। বালিকাদিগের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের হৃদয়ের আনন্দ ও সুখসন্তোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষার ভারে কোমলহৃদয়া বালিকাদিগের আনন্দ ও সন্তোষ দূরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সে শিক্ষা ফলদায়ক হয় না। অতএব প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, বালিকাদিগের জন্য আনন্দ ও সন্তোষ ও সরসতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা দেন। তাহা না হইলে শিক্ষার ফলে বালিকাহৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে গৃহে নানা অমঙ্গলের সঞ্চার হইবে। শিক্ষার সঙ্গে সরসতা থাকিলে আনন্দময় মহিলাহৃদয় শক্তিপূর্ণ হইয়া সংসারকে সরস ও শক্তিমান করিয়া তুলিবে।

—০—

(চ) বঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চা।*

(১৩০৪, চৈত্রের নব্যভারতে) "বঙ্গদেশে সঙ্গীত চর্চ্চা" প্রবন্ধের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে বিশেষ নূতন কোন কথা নাই, তবে লেখক বিভিন্ন স্বরলিপি প্রকাশ করণে যে অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বরলিপিকারদিগের দৃষ্টি-যোগ্য। তবে আমাদের বোধ হয় যে ইহাতে উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই। যদি বঙ্গসাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত পথ হইতে নূতন পথ অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার এরূপ সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইত কি না সন্দেহ। সেইরূপ আমাদের বিশ্বাস যে বিভিন্ন স্বরলিপি প্রচলিত হইতে থাকিলে স্বরলিপিকারগণ আপনার আপনার স্বরলিপির সৌষ্ঠব-সাধনে যত্নবান হইবেন এবং ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইবে। লেখক যদি বিভিন্ন স্বরলিপির উপযোগিতার পরিমাণ বারান্তরে প্রদর্শন করেন,তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। যে স্বরলিপি যতটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইবে, তাহার স্থায়িত্ব ততটুকু আশা করা যাইতে পারে। আশা করি, লেখক আলোচনা কালে এদিকটা ভুলিবেন না।

—০—

* ১৩০৪, ফাল্গুন সংখ্যার "পুণ্য"

(ছ) সত্য ও বীরত্ব।

"বীর কি বঙ্গে অসম্ভব" প্রবন্ধে (নব্যভারত ১৩০৭, পৌষ ও মাঘ) লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় শান্তিপুরে কোন্ দুই দলের মধ্যে এককালে লড়াই হইত এবং তাহাতে অনেক মাথা ফাটাফাটি হইত ইত্যাদিরূপ উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, বঙ্গে বীর পুত্র প্রসূত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। আমরা কথায় কথায় সুরেশ বিশ্বাস বা ফলনা ডাকাতের উদাহরণ হাজির করিয়া আপনাদিগকে মস্ত জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিবার সুযোগ খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু এরূপে দুদিনে আমরা বীর হইয়া উঠিতে পারিব না। আমাদিগের মতে আমরা যেরূপ সত্যকে দূরে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, বাঙ্গালী জাতির বীর জাতিরূপে পরিণত হওয়া বহুদূরের কথা। বীরত্বের ভিত্তি সত্যে নিহিত। বাঙ্গালীহৃদয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার পক্ষে বীরত্বের সিংহাসনে আরোহণ করা এক মুহূর্ত্তের কার্য্য। এত নগণ্য জাতি সাঁওতালেরাও যে, বীর তাহাও কেবল তাহারা সত্যপ্রিয় বলিয়া। শিখেরা যে জগতে শ্রেষ্ঠ বীর জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহা কেবল তাহাদিগের সত্যনিষ্ঠার জন্য। তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যতদিন না বাঙ্গালী জাতি সত্যপ্রিয় হইবে, ততদিন তাহাদের বীর বলিয়া জগতে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব।

—•—

(জ) সমালোচনা।

"সাবিত্রীতত্ত্বের" সমালোচনায় (১৩০৭, পৌষ ও মাঘ, নব্য-ভারত) ক্ষীরোদ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, আজকাল সমালোচনার কোন মূল্য নাই। সমালোচকগণ আজকাল সচরাচর প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার না করিয়া লেখকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমালোচনা করেন। অনেক সময়ে সমালোচক যদি দেখেন যে,লেখক ধনীর পুত্র বা লেখক কোন মাতব্বর ব্যক্তি,তবে তাঁহার রচনা নিকৃষ্ট হইলেও সমালোচক তাঁহাকে একেবারে উচ্চ সিংহাসনে চড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সমালোচকগণ ভুলিয়া যান যে বিচারকেরও যে আসন, সমালোচকেরও সেই আসন। অতএব ন্যায় ও সত্য বিচারের প্রতি সমালোচকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

—০—

(ঝ) সুর বাঁধা।

(১৩০৪ চৈত্র, পূর্ণিমাতে) "বার্ষিক সমালোচনায়" সমালোচক মাসিক পত্রসম্পাদকদিগকে গুরুগম্ভীর উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রত্যেক মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যা যেন এক একটী বিশেষ সুরে বাঁধা হয়। অধিকাংশ পত্রেরই পক্ষে এই উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। প্রায় সকল মাসিক পত্রই নিজের আদর্শ স্থির রাখিয়া তাহারই পরিধি স্বরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে যত্নবান। সুতরাং সে গুলির সুর সহজেই শোনা যায়। তিনি সকল গুলির সুর যে ধরিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি বর্ত্তমান কালের সুরের মধ্যে ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

আমাদের melody শোনা অভ্যাস আছে; সহসা বিদেশীয় harmony শুনিলে কেমন কর্কশ বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিন শুনিতে শুনিতে তাহা এমনি চমৎকার,লাগে যে তখন আর তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই harmonyর লক্ষণ এই যে, পাঁচ রকম সুর মিলিয়া স্বরচ্ছবি প্রস্তুত করে। সেইরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে গেলে একটু পুরাতন গণ্ডী ছাড়িয়া আসিয়া নূতন পথে পদার্পণ করিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগের নূতন বিক্ষুব্ধ ভাবের মধ্যে অন্তরের সহিত প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

—০—

(ঞ) স্মৃতিবিদ্যা।*

স্মৃতিবিদ্যা বা স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায়। মূল্য একটাকা চারি আনা। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ৭৯ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মূল্য পাঁচসিকার অপেক্ষা অল্প হইলে ইহার বহুল প্রচারের সম্ভাবনা ছিল। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তিনি স্মৃতিবিদ্যা বিষয়ক নানা পুস্তক আলোড়িত করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এরূপ পুস্তকের উপযোগিতা বিশেষ দেখিতে পাই না। আমরাও কিছুকাল পূর্ব্বে লয়সেটের (Loisette) প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত যথাবিধি পরিশ্রম করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ফলে যে আমাদের স্মৃতিশক্তি কিছু অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কতকগুলি কথা উল্টাপাল্টা করিয়া

* পুণ্য, ১৩০৫ সাল, ভাদ্র।

অভ্যাস করিলেই যে সাধারণত স্মৃতিশক্তি উন্নতি লাভ করিবে, সে কথায় আমাদের বিশ্বাস নাই। স্মৃতিশক্তির মূল একাগ্রতা। সকল বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও পাশ্চাত্যেরা পরিধি অবলম্বনে মূলকেন্দ্রে পৌঁছিতে চাহেন। প্রাচ্যেরা মূলকেন্দ্র অবলম্বনে পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত করিতে চাহেন। একাগ্রতার কারণ অপেক্ষা তাহার ফলের প্রতিই পাশ্চাত্যেরা অধিকতর দৃষ্টি রাখেন ও তদনু-যায়ী ব্যবস্থাও করেন, কিন্তু প্রাচ্যেরা একেবারে একাগ্রতার মূল আধ্যাত্মিক যোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ী যমনিয়মাদির ব্যবস্থা করেন। যমনিয়মাদির যিনি যতটুকু অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ততটুকু একাগ্রতা লাভ করিবেন। সংসারী গৃহস্থেরও পক্ষে ইহা অবলম্বনের অবিষয় নহে। এবিষয় বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে পৃথক একটী প্রবন্ধের প্রয়োজন।

যোগীরা ধ্যান ধারণা ও জপাদি দ্বারা যে প্রকারে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত করেন, গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে গ্রন্থ-খানি বালকদিগের অধিক উপকারে আসিত বোধ হয়। আমরা গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় (স্মৃতিনাশের উপায়) সকলকে পড়িয়া তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

—০—

(ট) হিন্দুর জাতীয় পতন। *

হিন্দুর জাতীয় পতন—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা। হিন্দুজাতি এখন আর পূর্ব্বেকার সে হিন্দুজাতি নাই; পূর্ব্বগৌরব একে একে সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছে। আমরা

* ১৮১৪ শক বৈশাখ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কোন্ কোন্ বিষয় হারাইয়াছি, দেবেন্দ্র বাবু তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, যে জাতি জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল—এই মন্দিরের একখানি প্রস্তর খসিয়া গেলে বর্ত্তমানের প্রধান স্থপতিগণ বহু চেষ্টার পর তাহার স্থানে একখানি প্রস্তর বসাইলেও তাহা পূর্ব্ববৎ সম্মিলিত ও সুন্দর হয় নাই—এখন কি না সেই জাতিকে অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিদেশীয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে, লজ্জা নিবারণ করিতেও তাহাদিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে? আহার বিষয়ক কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথা আমাদের ভাল লাগিল না—দেবেন্দ্র বাবু শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি অতিরিক্ত কটূক্তি করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে, সেগুলি প্রকৃত সত্যের অনেক দূরে। পুরুষেরা যদি বিজ্ঞানাদি আলোচনা করিতে পারে, তবে স্ত্রীলোকেরাই বা কেন বিজ্ঞানাদি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি পূর্ব্বক জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত না হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।



(৯) Hinduism and Buddhism.*

The kinship between Hinduism and Buddhism by Col. H. S. Olcott P. T. S.—A lecture delivered in the Town Hall, Calcutta, Oct. 24th 1892.

বর্ত্তমান কালে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ

* ত: বো: পত্রিকা, ১৮১৫ শক, বৈশাখ।

ভাব রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য বক্তা শ্রীযুক্ত কর্ণেল অলকট মহোদয় চেষ্টা পাইয়াছেন। বক্তা বলেন যে, যখন হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে; এমন কি, হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের জননী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তখন পরস্পরের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করা নিতান্তই অন্যায়। তিনি এই সূত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে অথবা শঙ্করবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের বিপক্ষে যে সকল উক্তি আছে, তাহা গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় নাই; জৈন সন্ন্যাসীদিগের প্রতি সেই সকল কটূক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যাই হৌক, শ্রীযুক্ত অলকট মহোদয়ের হিন্দু-বৌদ্ধদিগের মধ্য হইতে বিদ্বেষভাব দূরীকরণরূপ মহান উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যেদিন মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি কপটতা প্রভৃতি অসাধু ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক সাধু ব্যবহার অবলম্বন করিবে; সহস্র মতবিরোধ সত্ত্বেও যেদিন মনুষ্য মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, সেই দিন এই মর্ত্ত্যলোক দেবলোক হইবে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

—:ওঁ:—

ধ্রুবতারা।*

আনন্দ-হৃদয়ে প্রভুগুণ গান।
কররে সকলে ঢালি দিয়া প্রাণ॥

ধুয়া) দয়াল আমার তিনি।
বন্ধু ধ্রুবতারা তিনি॥

তাঁরি এক নাম করগো প্রচার।
দেবদেব তিনি প্রভুগো সবার॥
দয়াল আমার······

অত্যাচারী যত কাঁপে তাঁর ভয়ে।
করিব আনন্দ মোরা তাঁরি জয়ে॥
দয়াল আমার······

তাঁহারি কৃপায় দাসত্ব শৃঙ্খল।
ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল হইবে সবল॥
দয়াল আমার······

সৃজিলেন তিনি সুনীল গগন।
নক্ষত্র তারকা গ্রহ অগণন॥
দয়াল আমার······

---

* ২৯শে আগষ্ট—১৯১০ খৃষ্টাব্দ।

জাগালেন তিনি সাগর ভেদিয়া।
কঠিন মেদিনী জগত মোহিয়া॥
দয়াল আমার……

তাঁহারি আদেশে দিতেছে আলোক।
কনকতপন নাশি ভয় শোক॥
দয়াল আমার……

তাঁহারি আদেশে পূরণিমা শশী।
সুগন্ধ বাহিয়া হৃদে আনে হাসি॥
দয়াল আমার……

প্রয়োজন জানি করেন বিধান।
নিত্য আহারের পুরাইয়া প্রাণ॥
দয়াল আমার……

একতানে সবে মিলি একপ্রাণ।
তাঁরি গুণগাথা গাহি এস গান॥
দয়াল আমার তিনি।
বন্ধু ধ্রুবতারা তিনি॥

—:ওঁ:—

পরিশিষ্ট ।

Devotion. *

There is a Hindu proverb that God is revealed to faith only, but never to reasoning. This proverb is one of the most popular proverbs among the Hindus ; and it is quoted then most, when some one goes to prove that the worship of many Gods is inconsistent with true devotion. They do not want to take into account that faith ought not to be blind but regulated by reasoning.

True devotion pre-supposes healthy moral and intellectual culture. The truly devoted man must first of all know the distinction between right and wrong ; he must know whether, what he worships is a devil or a god ; he must think whether a clay-made thing, which he can make and unmake at any time he likes, or the Supreme Being, "in Whom, by Whom and for Whom, we have our being," is capable of giving our salvation. Then the man of devotion should reject the wrong, the

* The Epiphany, October 9, 1890.

devil and the clay-made thing ; he should accept the right, the God or the Suprme Being and follow closely the path of goodness.

If a man follows the satanic path of wrong, will he not ere long be drawn from misery to misery till he is ruined both in body and soul ? He is gradually compelled to love his misery.

Pure devotion cannot come, when we are compelled to worship a thing which we know to be our master or which we really hate or fear. But alas ! nearly the whole world is immersed in darkness, and in ignorance of the true God !

Where then are we to find true devotion ? Where are we to find pure worship of the Most Pure coming out of a pure heart ? Are we to die in ignorance of our Father ? No. The Father, our merciful Father, is not a father to let us alone and die without knowing him. He sends, from immemorial time, persons who are to show the way to truth and righteonsuess. In them we are to find pure hearts and pure devotion.

When the whole world had not even the rudimentary knowledge of God, the "Vaidic Rishis," full of piety and devotion, sang the most beautiful

hymns in the praise of their Heavenly Father and His creation. And again, when we see men immersed in the vast abyss of sin, Jesus comes forth in heavenly lustre of purity among them. Could any man but Jesus preach then to the sinners of Jerusalem, the idea of heartfelt prayer which he uttered spontaneously from his heart during his sermon on the mount? Who but Jesus could then pray "Forgive our debts as we forgive our debtors; and lead us not into temptation, but deliver us from evil; for Thine is the kingdom and the power and the glory for ever"?

We see then that there are persons from whom we can learn the purest sort of devotion. But either on account of idleness or of false reasoning the modern Hindus do not see them. They, through idleness, wish to tread in the path of their forefathers. They do not think of the ancient sages as their forefathers, for that would stimulate them to mental courage, heroic fortitude, and fighting against sins. They follow the footsteps of their more modern ancestors, who invented the most easy way, as it were, to virtue, through many degrading acts, not requiring the least of the heroic virtues.

On the other hand, those, who cannot see anything without the spectacles of syllogism, generally discard the idea of devotion to the All-merciful Father as an idea fit for old women only.

O brethren ! arise ye and be grateful to Him, who is the common father of all, for the blessings which He showers on your head by day and by night. Pray to Him fervently that ye may find that peace of mind, which is the root of piety, devotion and of all the other virtues. Devotion ennobles the mind and keeps the soul always in communion with Him Who watches over it even in the darkest midnight when we are fast asleep.

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

—:ঔঁ:—

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি।* তত্ত্বনিধি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ৸৹ আনা। ৩০১ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। ভাল কাগজের ভাল ছাপার এত বড় পুস্তকের মূল্য ৸৹ আনা অতি সুলভ। আখ্যাপত্র, গ্রন্থকারের বংশপরিচয়, উৎসর্গ, ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, অভয় প্রার্থনা, উদ্বোধন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, আমাদের আদর্শ দ্যাবাপৃথিবী, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ, অজ্ঞেয়বাদ, ঈশাবাস্যং ভূলোকে ঈশ্বর, তপস্যা, হিরণ্ময় কোষ, অধ্যাত্মযোগ, অমৃতসেতু, ব্রহ্মতীর্থ, তত্রনাত্যেতি কশ্চন, প্রিয়তম পরমেশ্বর, ব্রহ্মচক্র, ব্রহ্মলোক, ধর্ম্মপথ, শান্তিনিকেতন, প্রার্থনা, ব্যাকুলতা, অধ্যাত্মধর্ম্ম, অসতোসমাদ্গময়, বিবেক ও বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, গৃহবিবাদ, অধ্যাত্মধর্ম্মের ভিত্তি, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার, উপধর্ম্ম, সংশয়াত্মা, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায়, ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, আনন্দাহ্বান ও জীবন সমর্পণ প্রভৃতি বিষয় আছে। পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায় চিন্তাশীলতা, স্বাধীনচিত্ততা এবং উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। গণ্ডীর প্রবাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির নিকট এরূপ স্বাধীনভাবাপন্ন বিবৃতি কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপ ধর্ম্মভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। এই গ্রন্থ চিন্তাশীল সুধীসমাজে বিশেষ রূপ আদৃত হইবে, আমরা আশা করি। নব্যভারত, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৬।

---

* এই গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে (৫৫, অপার চিতপুর রোড), হিতৈষণা ভাণ্ডার (৫১, মিডল রোড, ইণ্টালী), হিতবাদী গ্রন্থালয়ে এবং ৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

অভিব্যক্তিবাদ। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২।৷০ টাকা। হিতবাদী গ্রন্থালয়ে এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে একটা বড় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাতে নাস্তিকতা নাই, ইহাই একটা সুখবর। * * * ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের সুসম্বদ্ধ প্রণালীগুণে এত বড় জটিল বিষয় বেশ সহজবোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গবাসী ১৩১৩ সাল, ১৩ই মাঘ।

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থকার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণের সিদ্ধান্তসমূহ ভারতীয় ভাবে আলোচনা করিয়া উহার উপা-দেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। হিতবাদী ১৩০৪ সাল, ৩ রা আশ্বিন।

এমন মূল্যবান পুস্তকের বিশেষ আদর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। সন্ধ্যা ১৩১৪ সাল, ১৪ জ্যৈষ্ঠ।

এরূপ পুস্তক বাঙ্গালাতে এই প্রথম বলিতে হইবে। * * * এই গ্রন্থে কিছু কিছু অতিসাহসিক মত ব্যক্ত করিয়াছেন। নববিধান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ, জুন।

এবিষয়ে বাঙ্গালায় একখানি গ্রন্থের একান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল। সামাজিক বৈজ্ঞানিক সকল কথার সহিত এই অভিব্যক্তিবাদের বা ক্রমবিকাশের সংস্রব। এখনকার দিনে সকল বিষয়েই এই নিয়ম খাটাইয়া দেখা হয়। * * * পুস্তক-খানি ইংরাজীর তরজমা নহে। ইংরাজী মত বুঝিয়া লইয়া শাস্ত্রীয় মতের সহিত সামঞ্জস্য চেষ্টা করিয়া লিখিত। সুতরাং প্রকৃত-প্রস্তাবেই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনা করিল। * * * পুস্তকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও আস্তিক্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মে। এডুকেশন গেজেট ১৩১০ সাল, ১৯ শ্রাবণ।

এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণয়ন জন্য বঙ্গভাষা গ্রন্থকারের নিকট ঋণী থাকিবে। নব্যভারত ১৩১১ আষাঢ়।